বার্ট্রাণ্ড রাসেল

অপেক্ষবাদের অ আ ক খ



[illegible]

[illegible]

অপেক্ষবাদের অ আ ক খ

(ABC OF RELATIVITY)

বার্ট্রাণ্ড রাসেল

অনুবাদ ঃ শত্রুজিৎ দাশগুপ্ত

পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমির গ্রন্থ প্রকাশ অনুদান প্রকল্প অনুযায়ী
রাজ্য সরকারের অর্থানুকূল্যে প্রকাশিত।

বাউলমন প্রকাশন

২৮, বালিগঞ্জ গার্ডেন্স
কলিকাতা—৭০০০১৯

ABC OF RELATIVITY
BY BERTRAND RUSSEL
TRANSLATED BY
SATRUJIT DASGUPTA

প্রকাশক ঃ

দেবব্রত ভট্টাচার্য
বাউলমন প্রকাশন
২৮, বালিগঞ্জ গার্ডেন্স
কলিকাতা-৭০০০১৯

প্রচ্ছদ ঃ দেবব্রত ভট্টাচার্য

প্রথম প্রকাশ ঃ ১লা জানুয়ারী, ১৯৮৮

মুদ্রক ঃ

শ্রীঅসিত গাঙ্গুলী
মডার্ন প্রিন্টার্স
৫১ সি, পটারী রোড,
কলিকাতা-৭০০০১৫

মূল্য ঃ ১৮ টাকা

চতুর্থ সংস্করণের ভূমিকা

বইটির প্রথম প্রকাশ ১৯২৫ সালে। অপেক্ষবাদের মৌল নীতির কোনো পরিবর্তন তারপর হয়নি। কিন্তু তত্ত্ব এবং প্রয়োগের বিস্তার বেড়েছে অনেক। সেইজন্য দ্বিতীয় এবং তার পরের সংস্করণগুলিতে কিছু পরিমার্জনা করতে হয়েছে। দ্বিতীয় এবং তৃতীয় সংস্করণে বার্ট্রাণ্ড রাসেলের অনুমোদন নিয়ে এই পরিমার্জনা আমি করেছি। এই চতুর্থ সংস্করণের পরিমার্জনার দায়িত্ব সম্পূর্ণ আমার। বর্তমান জ্ঞান এবং মতবাদের সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষার জন্য আমি এবারও কয়েকটি বাক্যের পরিবর্তন করেছি। এবং যেখানে আমার মনে হয়েছে এগুলি আর সঠিক নয়, সেখানে সম্বন্ধ পদ পরিত্যাগ করতে চেষ্টা করেছি।

পুংলিঙ্গের ভিতরে স্ত্রীলিঙ্গও অন্তর্ভুক্ত এই চিরাচরিত রীতি পরিত্যাগ করতে আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি। ষাট বছর আগে হয়তো এ রীতি গ্রহনীয় ছিল, অন্ততপক্ষে এ রীতি বরদাস্ত করা হোত। এখন আর অবস্থাটা সেরকম নয়। তাছাড়া স্ত্রী স্বতন্ত্র বিষয়ে বার্ট্রাণ্ড রাসেল তাঁর সমসাময়িকদের তুলনায় প্রগতিশীল ছিলেন। সেজন্য মনে হয় এই পরিত্যাগ করা বার্ট্রাণ্ড রাসেল অনুমোদন করতেন। শেষের দুই অধ্যায়ের বক্তব্যের ভিতরে আমি বিশেষ নাক গলাতে চেষ্টা করিনি। সেগুলির চরিত্র ততটা ভৌত নয়, যতটা দার্শনিক। অবশ্য তার ভিতরে অনেক কিছুই আছে যার সঙ্গে আমি একমত নই।

ফেলিক্স পিরানী

অনুবাদকের বক্তব্য

আধুনিক পদার্থবিদ্যার দুটি স্তম্ভ। অপেক্ষবাদ এবং কোয়াণ্টাম তত্ত্ব। দুটি তত্ত্বই অত্যন্ত জটিল এবং গণিতের সাহায্য ছাড়া হৃদয়ঙ্গম করা শক্ত।

কিন্তু পদার্থবিদ্যা এবং দর্শনশাস্ত্র সমগ্র মানবজ্ঞানের জননী। তাছাড়া আধুনিক দার্শনিকরা প্রায় সবাই পদার্থবিদ্যার সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করে চলেন। সেইজন্য পদার্থবিদ্যা না বুঝলে আধুনিক জ্ঞানবিজ্ঞানের সঙ্গে সুপরিচয় সম্ভব নয়। অথচ, আধুনিক পদার্থবিদ্যা যে গাণিতিক বর্মে আবৃত, যাঁরা বিশেষজ্ঞ নন, তাঁদের পক্ষে সে বর্ম ভেদ করা বেশ কঠিন।

এ কথা ভেবে আমরা অপেক্ষবাদ বিষয়ে দুটি বই প্রকাশ করলাম। আইনস্টাইনের "অপেক্ষবাদ" ও বার্ট্রাণ্ড রাসেলের "অপেক্ষবাদের অ-আ-ক-খ"। তাছাড়া আইনস্টাইন ও ইনফেল্ডের "পদার্থবিদ্যার বিবর্তন" বইটিতে এ দুটি বিষয় সম্পর্কেই ভূমিকা রয়েছে। আমাদের মনে হয় বাংলাভাষায় বহুল প্রচারের জন্য, কোয়াণ্টাম তত্ত্ব সম্পর্কেও এই ধরণের পুস্তকের প্রয়োজন রয়েছে। বাউলমন প্রকাশনের সঙ্গতি সামান্য, অনুবাদকও পলিত কেশ। সেজন্য আমাদের আকাঙ্খা অন্যান্য প্রকাশক এবং পণ্ডিতরা এদিকে দৃষ্টি দেবেন।

বাংলাভাষায় বিজ্ঞান-সাহিত্যের সমৃদ্ধি হবে বাউলমন প্রকাশন ও অনুবাদকের সবচাইতে আকাঙ্খিত পুরস্কার।

শত্রুজিৎ দাশগুপ্ত

সূচীপত্র

প্রথম অধ্যায়

দৃষ্টি ও স্পর্শ ঃ পৃথিবী এবং নভোমণ্ডল

সবাই জানেন আইনস্টাইন বিস্ময়কর একটা কিছু করেছিলেন। কিন্তু ব্যাপারটা আসলে কি সে সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান অল্প লোকেরই আছে। ভৌত জগৎ সম্পর্কে আমাদের ধারণায় তিনি বিপ্লব এনেছিলেন—এ তথ্য সাধারণভাবে স্বীকৃত। কিন্তু নূতন ধারণাগুলি গাণিতিক প্রয়োগ কৌশলে আবৃত। অপেক্ষবাদ সম্পর্কে সাধারণের জন্য অসংখ্য লেখা রয়েছে। কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা যেখানে শুরু হয়, ঠিক সেখানেই সেগুলি দুর্বোধ্য। এর জন্য লেখকদের দোষ সামান্য। নূতন ধারনাগুলির অনেকটাই গণিতের ভাষা ছাড়া প্রকাশ করা যায়। কিন্তু তা হলেও তারা কম দুর্বোধ্য নয়। প্রয়োজন আসলে আমাদের বিশ্বসম্পর্কীয় কল্পনের পরিবর্তন। এ কল্পন আমরা পেয়েছি আমাদের অতি প্রাচীন পূর্ব-পুরুষদের কাছ থেকে—যে পূর্ব-পুরুষেরা হয়ত প্রাক-মানবিক—আর শিখেছি আমরা প্রথম শৈশবে। আমাদের চিন্তাজগতের পরিবর্তন সব চাইতে কঠিন—বিশেষ করে আমরা যখন আর তরুণ নই তখন। একই ধরনের পরিবর্তনের দাবী ছিল কোপার্নিকাশের। তিনি শিখিয়েছিলেন পৃথিবী নিশ্চল নয়, নভোমণ্ডল পৃথিবীর চার পাশে দৈনিক একবার ঘুরছে এ কথাও সত্য নয়। আমাদের মনের অভ্যাস সুস্থির হবার আগেই এ তথ্য আমরা শিখেছি। সেইজন্য এই কল্পনে আমাদের কোনো অসুবিধা নেই। যে প্রজন্মের মানুষ আইনণ্টাইনের চিন্তাধারার সঙ্গেই বেড়ে উঠবে একই কারণে তাদের কাছে সহজতর হবে এই কল্পন। কিন্তু কল্পনার পুনর্গঠনের চেষ্টায় খানিকটা পরিশ্রম এড়ানো আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়।

আবিষ্কারের জন্য ধরাপৃষ্ঠে পর্যবেক্ষণ করতে হলে আমরা সমস্ত জ্ঞানেন্দ্রিয় ব্যবহার করি। বিশেষ করে ব্যবহার করি দর্শন এবং স্পর্শনেন্দ্রিয়। প্রাক-বৈজ্ঞানিক যুগে দৈর্ঘ্য মাপতে হলে ব্যবহার করা হয় দেহের কোনো একটা অংশ: হাত, বিঘত, পা (ফুট) এই ভাবেই সংজ্ঞিত (defined) হয়। দূরত্ব বেশী হলে আমরা বিচার করি এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় হেঁটে যেতে কত সময় লাগে। আস্তে আস্তে আমরা চোখের দৃষ্টি দিয়ে দূরত্ব আন্দাজ করতে শিখি কিন্তু নির্ভুল হতে হলে আমরা নির্ভর করি স্পর্শের উপর। তাছাড়া স্পর্শ থেকেই আমাদের বাস্তবতা বোধ আসে। কিছু কিছু

জিনিষ ছোঁয়া যায় না : রামধনু, আয়নার ছায়া ইত্যাদি। এগুলি দেখে শিশুরা ধাঁধাঁয় পড়ে। আয়নায় দেখা জিনিষ বাস্তব নয় এ সংবাদে তাদের 'অধিবিদ্যক কল্পন' (metaphysical speculations) বাধা পায়। ম্যাকবেথের ছোরাটা ছিল অবাস্তব, কারণ, "দৃষ্টিগোচর হলেও সেটা অনুভূতিগোচর ছিল না।" শুধুমাত্র জ্যামিতি এবং পদার্থবিদ্যাই নয় আত্মবহির্ভূত অস্তিত্বের সমগ্র কল্পনের ভিত্তিই স্পর্শবোধ। রূপকেও আমরা এ ধারণা ব্যবহার করি। ভাল বক্তৃতা জমে (Solid), মন্দ বক্তৃতা শুধুই গ্যাস (Gas), এর কারণ : আমাদের বোধে বায়বীয় পদার্থ (গ্যাস) ঠিক বাস্তব নয়।

নভোমণ্ডল পর্যবেক্ষণে আমরা দৃষ্টি ছাড়া কোনো জ্ঞানেন্দ্রিয় ব্যবহার করতে পারি না। সূর্য আমরা স্পর্শ করতে পারি না, পারি না ফুটরুল দিয়ে কৃত্তিকা নক্ষত্র (Pleiades) মাপতে। তা সত্ত্বেও জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা বিনা দিধায় জ্যামিতি এবং পদার্থবিদ্যা প্রয়োগ করেছেন। তাঁরা দেখেছেন ভূ-পৃষ্ঠে এ বিদ্যাগুলি কাজে লাগে। তাছাড়া এগুলির ভিত্তি ছিল বিচরণ ও স্পর্শ। এ রকম কাজ করতে গিয়ে তাঁরা বিপদ ডেকে এনেছেন। অপেক্ষবাদ আবিষ্কার না হওয়া পর্যন্ত সে বিপদ কাটেনি। দেখা গেল, স্পর্শ বোধের মাধ্যমে লব্ধ জ্ঞানের অনেকটাই অবৈজ্ঞানিক সংস্কার। সত্যকারের বিশ্বচিত্র লাভ করতে হলে এ সংস্কার অবশ্যই ত্যাগ করতে হবে।

ধরা পৃষ্ঠে অবস্থিত বস্তুগুলি নিয়ে যার কাজ তাঁর তুলনায় একজন জ্যোতির্বেত্তার (Astronomer) পক্ষে অসম্ভাব্যের পরিমাণ কত বেশী, একটা উদাহরণে সে তথ্য বোঝা যাবে। মনে করা যাক একটা ওষুধ দিয়ে আপনাকে কিছুক্ষণের জন্য অজ্ঞান করা হয়েছে। আপনি জেগে উঠবার পর আপনার স্মৃতি নষ্ট হয়েছে কিন্তু যুক্তি প্রয়োগের ক্ষমতা যায়নি। আর মনে করা যাক অজ্ঞান অবস্থায় আপনাকে একটা বেলুনে তুলে দেওয়া হয়েছিল। আপনার জ্ঞান হবার সময় বেলুনটা অন্ধকারে হাওয়ায় ভাসছে। আপনি ইংল্যাণ্ডে থাকলে রাতটা হোক নভেম্বর মাসের পাঁচ তারিখ আর আমেরিকায় থাকলে হোক জুলাইয়ের চার তারিখ*। আপনি দেখতে পাবেন ট্রেন থেকে,

* নভেম্বরের পাঁচ তারিখের রাত্রে ইংল্যাণ্ডে আর জুলাইয়ের চার তারিখের রাত্রে আমেরিকায় খুব বাজি পোড়ানো হয়। অনেকটা আমাদের দেওয়ালীর মত। —অনুবাদক

এরোপ্লেন থেকে এবং মাটি থেকে বাজি ছাড়া হচ্ছে। বাজিগুলি সবদিকে ছুটছে। বাজি আপনি দেখতে পাবেন, কিন্তু অন্ধকারের জন্য মাটি, এরোপ্লেন কিংবা ট্রেন দেখতে পাবেন না। পৃথিবী সম্পর্কে কি রকম মানসচিত্র তাহলে আপনি গঠন করবেন? আপনি ভাববেন কিছুই স্থায়ী নয়। অস্তিত্ব রয়েছে শুধু ক্ষণস্থায়ী আলোর ঝলকের। ঝলকগুলি তাদের স্বল্পস্থায়ী অস্তিত্বকালে শূন্যস্থানে নানারকম উদ্ভট বক্ররেখা আঁকছে। এই আলোর ঝলক আপনি ছুঁতে পারবেন না, শুধুমাত্র দেখতে পারেন। আপনার জ্যামিতি, পদার্থবিদ্যা এবং সাধারণ নশ্বর জীবদের জ্যামিতি, পদার্থবিদ্যা এবং অধিবিদ্যায় অনেক পার্থক্য হবে; এ তথ্য স্বতঃপ্রতীয়মান। সাধারণ কোনো নশ্বর জীব আপনার সঙ্গে বেলুনে থাকলে তার ভাষা আপনি বুঝতে পারবেন না। কিন্তু আইনস্টাইন যদি আপনার সঙ্গে থাকতেন তাহলে আপনার পক্ষে তাঁকে বোঝা যে কোনো নশ্বর জীবের আইনস্টাইনকে বোঝার চাইতে অনেক বেশী সহজ হতো। তার কারণ বহুপূর্বকল্পন থেকে আপনি মুক্ত থাকতেন। অধিকাংশ লোকের ক্ষেত্রে এই পূর্ব কল্পনগুলিই (preconceptions) আইনস্টাইনকে বোঝার বাধা।

যে ধারণাগুলি ওষুধ খাওয়া বেলুন-আরোহীর কাছে প্রয়োজন নয় অথচ সাধারণ জীবনে প্রয়োজন, অপেক্ষবাদ অনেকটাই নির্ভর করে সেই ধারণাগুলি থেকে মুক্ত হবার উপর। কম বেশী আকস্মিক কিছু কারণে ধরাপৃষ্ঠের পরিবেশ একাধিক কল্পন নির্দেশ করে। সে কল্পন চিন্তাক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় হলেও দেখা যায় সেগুলি নির্ভুল নয়। জাগতিক দৃষ্টিভঙ্গিতে ধরাপৃষ্ঠের অধিকাংশ বস্তুই বেশ অটল এবং প্রায় স্থিতিশীল। ধরাপৃষ্ঠের পরিবেশের ভিতরে সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ এটাই। ব্যাপারটা এরকম না হলে ভ্রমণ সম্পর্কীয় ধারণা যতটা নিশ্চিত মনে হয়, ততখানি নিশ্চিত মনে হোত না। আপনি যদি কিংস ক্রস (Kings cross) থেকে এডিনবরা যেতে চান তাহলে আপনার জানা থাকবে চিরকাল যেখানে ছিল, কিংস ক্রস থাকবে সেখানেই। রেল লাইনের গতিপথ শেষ বারে যাবার সময় যেমন ছিল তেমনি থাকবে আর এডিনবরার ওয়েভার্লি ষ্টেশান ও কেল্লা অবধি হেঁটে যাবে না। আপনি ভাবেন আপনি এডিনবরা গিয়েছেন। বলেন ও সেকথা। এডিনবরা আপনার কাছে এসেছে একথা বলেন না! কিন্তু একথাও একই রকম নির্ভুল। সাধারণ বুদ্ধি ভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গির এইসাফল্য এমন কতগুলি জিনিষের উপর নির্ভর করে যেগুলি আসলে অনেকটাই ভাগ্য নির্ভর।

অনুমান করা যাক লণ্ডনের বাড়ীগুলি এক ঝাঁক মৌমাছির মত অবিরাম চলমান, রেলপথগুলি চলে আর আকার বদলায় হিমবাহের মত এবং সবশেষে অনুমান করা যাক বাস্তব পদার্থগুলি মোমের মত অবিরাম গঠিত ও বিগঠিত (dissolution) হয়ে চলেছে। এই সমস্ত অনুমানে অসম্ভব কিছু নেই। কিন্তু যাকে আমি এডিনবরা যাত্রা বলি তার কোনো অর্থ এ জগতে থাকবে না এ তথ্য স্বতঃ প্রতীয়মান। সন্দেহ নেই—সকালে আপনি শুরু করবেন ট্যাক্সি ড্রাইভারকে জিজ্ঞাসা করে, "কিংস ক্রসটা আজ সকালে কোথায়?" ষ্টেশানে আপনার এডিনবরা সম্পর্কে একই ধরনের প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে হবে কিন্তু টিকিট ঘরের কেরানী আপনাকে উত্তর দেবেন, "এডিনবরার কোন অংশ সম্পর্কে বলছেন আপনি? প্রিন্সেস ষ্ট্রীট গিয়েছে গ্ল্যাসগোতে, কেল্লাটা উঠেছে পাহাড়ে। ওয়েভার্লি ষ্টেশান রয়েছে ফোর্থ খাঁড়ির জালের নিচে।" তাছাড়া পথে ষ্টেশানগুলি স্থিরাবস্থায় থাকবে না। কোনোটা চলবে উত্তরে, কোনোটা দক্ষিণে, কোনোটা পূর্বে আবার কোনোটা পশ্চিমে। তাদের বেগ হয়ত ট্রেনের চাইতে বেশী। এ অবস্থায় কোন মুহূর্তে কোথায় আপনার অবস্থান সেটাও আপনি বলতে পারবেন না। আসলে ব্যক্তির অবস্থান কোনো একটি নিশ্চিত 'স্থানে' এই ধারণার কারণ ভাগ্যক্রমে ধরাপৃষ্ঠে অধিকাংশ বৃহৎ বস্তুর অচলাবস্থা। স্থান সম্পর্কীয় ধারণা শুধু একটি মোটামুটি কার্যকর আসন্নতা (rough practical approximation)। এর পিছনে যৌক্তিক প্রয়োজন কিছু নেই এবং এ ধারণাকে সর্বাংশে সঠিক করা সম্ভব নয়।

আমরা যদি ইলেকট্রনের চাইতে বেশী বড় না হতাম তাহলে স্থিরত্ব সম্পর্কীয় এ ধারণা আমাদের থাকত না। এ ধারণার কারণ শুধুমাত্র আমাদের জ্ঞানেন্দ্রিয়ের স্থূলত্ব (grossness)। কিংসক্রসকে আমাদের মনে হয় ঘনবস্তু (solid)। আমাদের আকার ইলেকট্রনের মত ছোট হলে কিংসক্রসকে ধারণাতীত বড় মনে হোত। দু'একজন উৎকেন্দ্রিক গণিতবিদ (eccentric mathematicions) ছাড়া আর কারো পক্ষে এ সম্পর্কে ধারণা করা সম্ভব হোত না। আমাদের দৃষ্টিপথে যেগুলি আসত সেগুলি অতি ক্ষুদ্র বস্তুবিন্দু। পরস্পরের সংস্পর্শে তারা কখনোই আসে না। অকল্পনীয় দ্রুত ব্যালে নাচের মত তারা পরস্পরের সবদিকে অবিরাম ঘুরছে। এডিনবরার বিভিন্ন অংশ যদি ভিন্ন ভিন্ন দিকে হাঁটা দিত, আমরা ইলেকট্রনের মত ক্ষুদ্র হলে আমাদের অভিজ্ঞতা লব্ধ জগৎও হোত সেইরকম উন্মত্ত। আমরা যদি বিপরীত প্রান্ত বিচার করি, অর্থাৎ

আপনার আকার যদি সূর্যের মত বড় হোত, আপনার জীবনকাল যদি হোত ঐরকম দীর্ঘ এবং অনুভূতি যদি হোত অনুরূপ মন্থর তাহলে আপনি দেখতেন বিশৃঙ্খল, স্থিরত্বহীন এক মহাবিশ্ব। গ্রহতারকা আসত এবং যেত ভোরের কুয়াশার মত। কোনো বস্তু সাপেক্ষ কোনো বস্তুর স্থির অবস্থান থাকত না। তুলনামূলক স্থিরত্বসম্পর্কীয় ধারণা আমাদের সাধারণ দৃষ্টি-ভঙ্গির অংশ। সে দৃষ্টিভঙ্গির কারণ আমাদের আকার এবং এমন একটি গ্রহে বাস যার পৃষ্ঠতল (surface) খুব উত্তপ্ত নয়। তা না হলে প্রাক-অপেক্ষবাদ পদার্থবিদ্যা থেকে আমরা বৌদ্ধিক পরিতৃপ্তি পেতাম না। আসলে আমরা এই ধরণের তত্ত্ব আবিস্কারই করতাম না। হয় আমরা এক লাফে অপেক্ষবাদী পদার্থবিদ্যায় পৌঁছে যেতাম নয়ত আমরা বৈজ্ঞানিক বিধি সম্পর্কে অজ্ঞ থেকে যেতাম। আমাদের কপাল ভালো। এই বিকল্পের মুখোমুখি আমাদের হতে হয়নি। তার কারণ একটি মানুষ, ইউক্লিড, গ্যালিলিও, নিউটন এবং আইনস্টাইনের কাজ করতে পারত: এ এক অসম্ভব কল্পন। অথচ যে বিশ্বে বিজ্ঞাননিরপেক্ষ পর্যবেক্ষণ ছাড়াই সদা পরিবর্তনশীল ব্রহ্মাণ্ড স্বতঃপ্রতীয়মান সে বিশ্বে এই রকম অবিশ্বাস্য প্রতিভা ছাড়া পদার্থবিদ্যা আবিস্কার প্রায় অসম্ভব হোত।

চন্দ্র, সূর্য, তারকার অস্তিত্ব রয়েছে বছরের পর বছর। তবুও জ্যোতিষীয় জগতের সঙ্গে আমাদের দৈনন্দিন জীবনের পার্থক্য অনেক। আগেই বলেছি এ ক্ষেত্রে আমরা শুধু দৃষ্টির উপরেই নির্ভর করি। মহাকাশের বস্তুপিণ্ড স্পর্শ করা, শ্রবণ করা, আঘ্রান করা কিংবা আস্বাদন করা সম্ভব নয়। মহা-কাশের সব জিনিষই অন্য সব জিনিষ সাপেক্ষ চলমান। সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে পৃথিবী ঘুরছে। সূর্য হারকিউলিস নক্ষত্রপুঞ্জের (Consteillation) একটি বিন্দু অভিমুখে এক্সপ্রেস ট্রেনের চাইতেও অনেক বেশী বেগে ধাবমান। স্থির তারকাগুলি নানা অভিমুখে দ্রুত চলমান। কিংসক্রস্ কিংবা এডিনবরার মত কোনো সুচিহ্নিত স্থান মহাকাশে নেই। পৃথিবীতে ভ্রমণের সময় আপনি বলেন, ট্রেন চলছে কিন্তু ষ্টেশানগুলি চলছে না; তার কারণ ষ্টেশানগুলি পরস্পরের সঙ্গে এবং পারিপার্শ্বিক স্থানের সঙ্গে সাং-স্থানিক (opographical) সম্পর্ক রক্ষা করে। কিন্তু জ্যোতির্বিজ্ঞানে কাকে আপনি ট্রেন বলবেন আর কাকে আপনি ষ্টেশান বলবেন সেটা যাদৃচ্ছিক (arbitrary)। এ প্রশ্নের উত্তর নির্ভর করে শুধুমাত্র সুবিধা আর রীতির উপর।

এই প্রসঙ্গে আইনস্টাইন এবং কোপার্নিকাসের বৈপরীত্য বিচার আকর্ষণীয়। কোপার্নিকাসের আগে লোকে ভাবত পৃথিবী স্থিরভাবে দণ্ডায়মান এবং নভোমণ্ডল তাকে বেষ্টন করে দিনে একবার ঘুরছে। কোপার্নিকাস শেখালেন, আসলে পৃথিবীটাই দৈনিক একবার ঘুরছে এবং সূর্য-তারকার দৈনন্দিন ঘূর্ণন শুধু ব্যাহ্যত প্রতীয়মান (apparent)। গ্যালিলিও এবং নিউটন এই দৃষ্টিভঙ্গি সমর্থন করেছেন। এ মত প্রমাণ করার জন্য অনেক কিছু চিন্তা করা হয়েছে। উদাহরণ: পৃথিবীর মেরুদুটির চ্যাপটা হওয়া, মেরু প্রদেশের তুলনায় বিষুবরেখায় বস্তুপিণ্ডগুলির ওজন বেশী হওয়া। কিন্তু আধুনিক তত্ত্ব অনুসারে কোপার্নিকাস এবং তাঁর পূর্বতন জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের ভিতরে উপস্থাপিত প্রশ্ন শুধুমাত্র অসুবিধা সুবিধার ব্যাপার! সমস্ত গতিই আপেক্ষিক। "পৃথিবী দৈনিক একবার চক্রাকারে আবর্তিত হয় এবং নভোমণ্ডল দৈনিক একবার পৃথিবীকে চক্রাকারে প্রদক্ষিণ করে" এই দুটি বিবৃতির ভিতর কোনো পার্থক্য নেই। বিবৃতি দুটি নির্ভুলভাবে একই তথ্য প্রকাশ করে। একটি দৈর্ঘ্যকে ছয় ফুট কিংবা দুগজ বলার মতই আগের বিবৃতি দুটিতে প্রকাশিত হয়েছে ঠিক একই তথ্য। দশমিক মুদ্রায় হিসাব রাখা যেরকম সহজ ঠিক তেমনি পৃথিবীর বদলে সূর্যকে স্থিররূপে গ্রহণ করলে জ্যোতির্বিজ্ঞান সহজতর হয়। কিন্তু কোপার্নিকাস সম্পর্কে এর বেশী কিছু বললে পরমগতি (absolute motion) অনুমান করতে হয়। সে অনুমান অলীক। সমস্ত গতি আপেক্ষিক, একটি বস্তুপিণ্ডকে স্থিররূপে গ্রহণ করা চলিত প্রথা মাত্র। এই রকম সমস্ত প্রথা একই রকম বিধিসম্মত। অবশ্য সমস্ত প্রথা এক রকম সুবিধাজনক নয়।

জ্যোতির্বিজ্ঞান শুধুমাত্র দৃষ্টিশক্তির উপর নির্ভর করে। এই জন্য জ্যোতির্বিজ্ঞানের সঙ্গে জাগতিক পদার্থবিদ্যার (terrestial Physics) বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ আর একটি পার্থক্য রয়েছে। সাধারণ চিন্তাধারা এবং প্রাচীনপন্থী পদার্থবিদ্যা উভয়েই বল (force) সম্পর্কিত ধারণা ব্যবহার করেছে। পরিচিত অনুভূতির সঙ্গে সম্পর্কিত হবার দরুণ মনে হয়েছে এ ধারণা বোধগম্য। হাঁটবার সময় আমাদের মাংসপেশী সম্পর্কিত অনুভূতি হয় কিন্তু বসে থাকলে সে বোধ হয় না। যান্ত্রিক চালিকাশক্তি যখন ছিল না তখনও মানুষ গাড়ীতে চড়ে যাতায়াত করতে পারত। কিন্তু তখনও মানুষ দৃশ্যত যেরকম 'বল' (force) প্রয়োগ করে, ঘোড়াকেও সেরকম 'বল' (force) প্রয়োগ করতে

দেখত। নিজের অভিজ্ঞতা থেকে সকলেই জানত কাকে টানা কিংবা ঠেলা বলে, কাকে বলে আকর্ষিত হওয়া কিংবা ধাক্কা খাওয়া। 'বল (force)' গতিবিদ্যার স্বাভাবিক ভিত্তি হয়েছিল অত্যন্ত পরিচিত এই তথ্যগুলি থেকে। নিউটনীয় মহাকর্ষ বিধি (Newtonian Law of Gravitation) কিন্তু একটি সংকট উপস্থিত করেছিল। দুটি বিলিয়ার্ড বলের অন্তর্বর্তী 'বল (force)' বোঝা যায়—কারণ আর একজনের সঙ্গে ধাক্কা লাগলে কিরকম লাগে সেটা আমাদের জানা, কিন্তু পৃথিবী এবং সূর্যের দূরত্ব 93 মিলিয়ন মাইল। তাদের অন্তর্বর্তী বল ছিল রহস্যজনক। এই 'দূরবর্তী ক্রিয়া' (action at a distance) নিউটনও অসম্ভব ভাবতেন। তাঁর বিশ্বাস ছিল : এযাবৎ অনাবিস্কৃত এমন কোনো সাধনী (mechanism) আছে যার সাহায্যে সূর্যের প্রভাব গ্রহগুলিতে প্রেরিত হয়। এরকম কোনো সাধনী (mechanism) কিন্তু আবিস্কার হয় নি। সুতরাং মহাকর্ষ (gravitation) ছিল একটি ধাঁধাঁ। আসলে 'মহাকর্ষীয় বল' (gravitational force) সম্পর্কিত সম্পূর্ণ কল্পনই ভুল। অপেক্ষবাদের মহাকর্ষীয় বিধি (Gravitational Law) অনুসারে সূর্য গ্রহগুলির প্রতি কোনো বলই প্রয়োগ করে না। গ্রহদের মনোযোগ শুধুমাত্র তাদের নিজস্ব সান্নিধ্যের প্রতি! এর কর্মপদ্ধতি ব্যাখ্যা করা হবে পরের একটি অধ্যায়ে। আপাতত "মহাকর্ষীয় বল" সম্পর্কিত ধারণা পরিত্যাগের প্রয়োজনীয়তাই আমাদের বিবেচ্য। এ ধারণা আহরণ করা হয়েছিল স্পর্শবোধ থেকে উদ্ভূত ভুল কল্পন থেকে।

পদার্থবিদ্যার অগ্রগতির সঙ্গে ক্রমশই বেশী করে দেখা গিয়েছে : পদার্থ সম্পর্কে মূলগত ধারণার উৎস হিসাবে স্পর্শের চাইতে দৃষ্টি, ভুল পথের নিশানা দেয় অনেক কম। বিলিয়ার্ড বলের সংঘর্ষের আপাতদৃষ্ট সারল্য শুধুই মায়া। আসলে দুটি বিলিয়ার্ড বল কখনোই স্পর্শ করে না। যা ঘটে সেটা অকল্পনীয় জটিল, এর সঙ্গে সাধারণ বুদ্ধিকৃত অনুমানের চাইতে ধূমকেতুর সৌরমণ্ডলে প্রবেশ ও নিস্ক্রমণের সময় যা ঘটে তার সাদৃশ্য বেশী।

এতক্ষণ পর্যন্ত আমরা যা বলেছি অপেক্ষবাদ আবিষ্কারের আগেই পদার্থবিদ্যাবিদরা সে সমস্ত উপলব্ধি করেছিলেন। গতি যে শুধুমাত্র একটি আপেক্ষিক পরিঘটনা এ তথ্য সাধারণত মেনে নেওয়া হোত। অর্থাৎ দুটি বস্তুপিণ্ড যখন তাদের আপেক্ষিক অবস্থান (relative position) পরিবর্তন করে তখন একটি স্থিতিশীল, অপরটি চলমান একথা আমরা বলতে পারি না। কারণ

ঘটনাটি শুধুমাত্র তাদের আপেক্ষিক অবস্থানের পরিবর্ত্তন। কিন্তু পদার্থবিদ্যার বাস্তব কর্মকাণ্ডের সঙ্গে এই নূতন বিশ্বাসের সামঞ্জস্য বিধান করতে অনেক পরিশ্রম প্রয়োজন হয়েছিল। মহাকর্ষীয় বল এবং পরম স্থান এবং কাল সম্পর্কীয় ধারণা (absolute space & time) ছিল প্রাচীন পদার্থবিদ্যার প্রয়োগপদ্ধতির অঙ্গীভূত। প্রয়োজন হয়েছিল প্রাচীন অনুমান থেকে মুক্ত একটি নূতন প্রয়োগবিদ্যার। এ কার্য করতে হলে স্থান (space) এবং কাল (time) সম্পর্কীয় প্রাচীণ ধারণার মূলগত পরিবর্তন করতে হোত। কিন্তু ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করার আগে কিছু প্রাথমিক আলোচনা আবশ্যিক। সেই বিষয় নিয়েই এর পরের দুটি অধ্যায়।

—O—

দ্বিতীয় অধ্যায়

কি ঘটে এবং কি পর্যবেক্ষণ করা হয়

এক ধরণের উঁচুদরের মানুষ জোরের সঙ্গে "সবই আপেক্ষিক" বলতে ভালবাসেন। কথাটা একেবারেই অর্থহীন। কারণ, সবই যদি আপেক্ষিক হোত তাহলে আপেক্ষিক সম্পর্ক স্থাপন করার মত কিছু থাকত না। অধিবিদ্যক অসম্ভাব্যের (metaphysical absurdities) ভিতর না গিয়েও কিন্তু বলা যায় ভৌত জগতের সবকিছুই একজন পর্যবেক্ষক সাপেক্ষ আপেক্ষিক (relative to an observer)। এ দৃষ্টিভঙ্গি সত্য কিংবা মিথ্যা যাই হোক না কেন 'অপেক্ষবাদ (theory of relativity)' কিন্তু এ দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেনি। নামটার হয়ত ভাগ্য খারাপ। এ নাম দার্শনিকদের এবং অশিক্ষিত লোকদের গোলমালে ফেলেছে। তাঁরা কল্পনা করেন নূতন তত্ত্ব প্রমাণ করেছে ভৌতজগতের সবকিছুই আপেক্ষিক। অথচ এ তত্ত্বের একমাত্র প্রচেষ্টা—যা আপেক্ষিক সেটা বাদ দিয়ে ভৌতবিধি সম্পর্কে এমন জ্ঞাপনীতে (statement) পৌঁছানো যে জ্ঞাপনী কোনোক্রমেই পর্যবেক্ষকের পারিপার্শ্বিক অবস্থার উপর নির্ভর করবে না। দেখা গিয়েছে পর্যবেক্ষক যা দেখতে পান তার উপরে এই সমস্ত পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রভাব আগে যা ভাবা গিয়েছিল তার চাইতে বেশী। একথা সত্য হলেও পারিপার্শ্বিকের এই ক্রিয়া কি করে সম্পূর্ণ দূর করা যায় অপেক্ষবাদ সেটাই দেখায়। এ তত্ত্বে বিস্ময়কর যা কিছু আছে এটাই তার উৎস।

এককরূপে কল্পিত একটি ঘটনা যখন দুজন পর্যবেক্ষক অনুভব করেন তখন তাঁদের অনুভূতির ভিতর কিছু মিল থাকে আবার কিছু অমিলও থাকে। দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজনে এ পার্থক্য ঢাকা পড়ে। কারণ বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গিতে সর্বক্ষেত্রেই এ পার্থক্য গুরুত্বহীন। কিন্তু পদার্থবিদ্যা এবং মনস্তত্ত্ব তাদের নিজ নিজ দৃষ্টিভঙ্গি থেকে একটি ঘটনা সম্পর্কে একের অনুভূতির সঙ্গে অপরের অনুভূতির পার্থক্যের উপর জোর দিতে বাধ্য হয়। এই পার্থক্যগুলির খানিকটার কারণ পর্যবেক্ষকদের মস্তিষ্কের পার্থক্য, খানিকটার কারণ তাদের বোধেন্দ্রিয়ের পার্থক্য এবং খানিকটার কারণ ভৌত পরিস্থিতির পার্থক্য: এই তিন প্রকার পার্থক্যের নাম দেওয়া যেতে পারে—মনস্তাত্ত্বিক প্যার্থক্য, শারীরবিদ্যাভিত্তিক পার্থক্য এবং ভৌত পার্থক্য। আমাদের জানিত কোনো ভাষায় যদি কোনো মন্তব্য করা হয় তাহলে সেটা শোনা যাবে কিন্তু একইরকম

উচ্চগ্রামের মন্তব্য অজানা ভাষায় করা হলে হয়ত একেবারেই গ্রাহ্য করা হবেনা। আল্‌পস্‌ পর্বতে দুজন ভ্রমণকারীর একজন দৃশ্যের সৌন্দর্য উপভোগ করেন, অন্যজন বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদনের জন্য জলপ্রপাত লক্ষ্য করেন। এ পার্থক্য মনস্তাত্ত্বিক। হ্রস্বদৃষ্টি সম্পন্ন (short sighted) এবং দীর্ঘদৃষ্টি সম্পন্ন (long sighted) লোকদের ভিতরের পার্থক্য কিংবা বধির ব্যক্তি এবং শ্রুতিশক্তি সম্পন্ন ব্যক্তিদের ভিতরের পার্থক্য শারীরবিদ্যা ভিত্তিক, এই দুরকম পার্থক্যের কোনোটি নিয়েই আমার মাথা ব্যথা নেই। এগুলির প্রসঙ্গ বাদ দেওয়ার জন্যই শুধু আমি এগুলি উল্লেখ করেছি। শুদ্ধ ভৌতিক পার্থক্য নিয়েই আমাদের বিচার। পর্যবেক্ষকদের স্থানে যদি ক্যামেরা কিংবা রেকর্ড করার যন্ত্র (recording machine) প্রতিস্থাপন করা যায় এবং ফিল্মে কিংবা গ্রামোফোনে সেগুলি পুনরুৎপাদন করা যায় তাহলে দুজন পর্যবেক্ষকের ভিতরকার ভৌত পার্থক্য রক্ষিত হবে। দু ব্যক্তি যদি তৃতীয় এক ব্যক্তির কথা বলা শোনে এবং তাদের ভিতরে একজন যদি অন্যজনের তুলনায় বক্তার নিকটতর হয় তাহলে নিকটতর ব্যক্তি অপরের তুলনায় উচ্চগ্রামে শুনবে এবং সামান্য আগে শুনবে। দু ব্যক্তি যদি একটি গাছ পড়তে দেখে তাহলে দেখবে তারা ভিন্ন ভিন্ন কোণ থেকে। এই দুরকম পার্থক্য নথিভুক্ত করার যন্ত্রে সমভাবে দেখা যাবে। পর্যবেক্ষকদের বৈশিষ্ট্য কোনোক্রমেই এ পার্থক্যের কারণ হতে পারে না। এ পার্থক্য আমাদের অভিজ্ঞতালব্ধ ভৌত প্রকৃতি প্রবাহের অংশ।

সাধারণ মানুষের মত পদার্থবিদ্যাবিদরাও বিশ্বাস করেন : তাঁদের অনুভূতি শুধু তাঁদের নিজস্ব একান্ত অভিজ্ঞতা সম্পর্কে জ্ঞান দান করে তাই নয়, ভৌত জগতে বাস্তবে যা ঘটছে অনুভূতি (perceptions) সে সম্পর্কেও তাঁদের জ্ঞান দান করে। পেশাগত ভাবে তাঁরা ভৌত জগৎকে বাস্তব (real) মনে করেন শুধুমাত্র মানুষের স্বপ্নভিত্তিক কিছু ভাবেন না। উদাহরণ : উপযুক্ত অবস্থান থেকে যে কোনো ব্যক্তি সূর্যগ্রহণ পর্যবেক্ষণ করতে পারে এবং এই উদ্দেশ্যে উন্মুক্ত ফটোগ্রাফের প্লেটও এ পর্যবেক্ষণ করতে পারে। যাঁরা সূর্য কিংবা তার ফটো দেখেছে তাদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ছাড়াও বাস্তবে আরও কিছু ঘটেছে, পদার্থবিদ্যাবিদরা একথা বিশ্বাস করেন। স্বতঃপ্রতীয়মান মনে হলেও এ বিষয়ে আমি জোর দিয়েছি। তার কারণ অনেকে মনে করেন অপেক্ষবাদ এ বিষয়ে পার্থক্য সৃষ্টি করেছে। আসলে কোনো পার্থক্য সৃষ্টি করেনি।

কিন্তু একই ভৌত ঘটনা কিছু সংখ্যক লোক পর্যবেক্ষণ করতে পারে, পদার্থবিদ্যাবিদদের এ বিশ্বাসের যদি কোনো যৌক্তিকতা থাকে তাহলে ঘটনার যে অবয়বগুলি সমস্ত পর্যবেক্ষক সাপেক্ষ 'সমরূপ', পদার্থবিদ্যাবিদ সেগুলি নিয়েই কাজ করবেন: এ তথ্য স্পষ্ট। কারণ, অন্য অবয়বগুলি ঘটনার সঙ্গে স্বতঃত সংযুক্ত এরকম বিচার চলে না। যে সমস্ত অবয়ব "একই রকম উত্তমে" পর্যবেক্ষক সাপেক্ষ 'সমরূপ' অন্তত তারই ভিতর পদার্থবিদ্যাবিদদের সীমাবদ্ধ থাকতে হবে। যে সমস্ত পর্যবেক্ষক অনুবীক্ষণ যন্ত্র কিংবা দূরবীক্ষণ যন্ত্র ব্যবহার করেন না, তাঁদের তুলনায় বেশী পছন্দ করা হয় তাঁদের, যাঁরা এগুলি ব্যবহার করেন। তার কারণ প্রথমোক্তরা যা দেখতে পান না, শেষোক্তরা সেগুলি দেখতে পান এবং দেখতে পান তার চাইতে বেশী আরো কিছু। সুবেদী (sensitive) ফটোগ্রাফিক প্লেট হয়ত তারও বেশী "দেখতে" পায়। তখন যে কোনো চোখের চাইতে সেগুলিকে বেশী পছন্দ করা হয়। কিন্তু দর্শনানুপাতে (perspective) পার্থক্য কিংবা দূরত্বের ভিন্নতার দরুণ আকারের বৈসাদৃশ্য ইত্যাদি সেই সেই বস্তুতে আরোপ করা যায় না। এগুলির জন্য দায়ী শুধুমাত্র দ্রষ্টার দৃষ্টিভঙ্গি। বস্তু বিচারকালে সাধারণ বুদ্ধি এ বৈসাদৃশ্যগুলিকে পরিত্যাগ করে। একই পদ্ধতিকে পদার্থবিদ্যা আরও অনেক দূর অবধি এগিয়ে নিয়ে যায়। কিন্তু মূল নীতি অভিন্ন।

আমি পরিষ্কার বলতে চাই: যাকে যথাযথ বলা যায় না সেরকম কোনো বিষয় নিয়ে আমি মাথা ঘামাই না। আমার বিচার এমন কতগুলি সঙ্ঘটনের (occurrences) সত্যকারের ভৌত পার্থক্য নিয়ে, যেগুলির প্রতিটি একটি বিশেষ ঘটনার নির্ভুল সাক্ষ্য। এ বিচার আমি করতে চাই ঘটনার নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি থেকে। একটা কামান যখন দাগা হয়, তখন যারা খুব কাছে না থাকে তারা আগে দেখতে পায় আলোর ঝলক, পরে শুনতে পায় আওয়াজ। তাদের বোধেন্দ্রিয়ের কোনো দোষ এ ঘটনার জন্য দায়ী নয়। এর কারণ শব্দের গতি আলোর গতির তুলনায় মন্থর। আলোর গতি এত দ্রুত যে, ভূ-পৃষ্ঠের অধিকাংশ পরিঘটনার দৃষ্টিভঙ্গি থেকে আলোক চলাচলকে তাৎক্ষণিক মনে করা যেতে পারে। পৃথিবীতে ঘটমান যা কিছু আমরা দেখতে পাই কার্যত সে সমস্তই ঘটে

আমরা যে মুহূর্তে সেগুলি দেখতে পাই সেই মুহূর্তে। আলোকের গতি সেকেণ্ডে ৩০০০০০ কিলোমিটার (প্রায় ১৮৬০০০ মাইল)। সূর্য থেকে পৃথিবীতে আসতে আলোকের প্রায় ৮ মিনিট সময় লাগে আর তারাগুলি থেকে আসতে সময় লাগে ৪ থেকে কয়েক হাজার মিলিয়ন বছর পর্যন্ত। আমরা অবশ্য, সূর্যে একটা ঘড়ি বসিয়ে সেখান থেকে গ্রীণউইচ মধ্যক সময় (Greenwich Mean Times) ১২ টাতে আলোর ঝলক পাঠিয়ে গ্রীণউইচে সেই আলোর ঝলককে —১২টা ৮ মিনিটে ধরতে পারি না। আলোকের দ্রুতি নির্ধারণে আমাদের পদ্ধতি শব্দের ক্ষেত্রে প্রতিধ্বনি ব্যবহারের মত। আমরা আলোকচ্ছটা (flash of ligh) আয়নার দিকে পাঠাতে পারি এবং পর্যবেক্ষণ করতে পারি প্রতিফলনের আমাদের কাছে আসতে কত সময় লাগে। তাহলে আমরা পাই আয়না অবধি যাতায়াতের সময় অর্থাৎ ভ্রমণকালের দ্বিগুণ। আয়নার দূরত্ব যদি মাপা যায় তাহলে আলোকে দ্রুতিও (speed) গণনা করা সম্ভব।

কাল মাপনের পদ্ধতি আজকাল এত নির্ভুল (Precise) যে এ পদ্ধতি এখন ব্যবহার করা হয় দূরত্ব নির্ধারণের জন্য—আলোকের দ্রুতি মাপনের জন্য নয়। ১৯৮৩ সালের একটি আন্তর্জাতিক চুক্তি অনুসারে "এক সেকেণ্ডের ১ ২৯৯৭৯২৪৫৮ সেকেণ্ডে শূন্যস্থানে আলোক যে পথ অতিক্রম করে সেটাই এক মিটার।" পদার্থবিদ্যাবিদদের দৃষ্টিভঙ্গিতে আলোকের দ্রুতি এখন রূপান্তর গুণকে (conversion factor) পরিণত হয়েছে। ঠিক যেমন গুণক ০.৯১৪৪ ব্যবহার করা হয় গজ-হিসাবে-দূরত্বকে মিটার-হিসাবে-দূরত্বে রূপান্তরিত করার জন্য তেমনি আলোকের দ্রুতিকে ব্যবহার করা হয় দূরত্বকে সময়ে রূপান্তরিত করার জন্য। সূর্য আট মিনিট দূরে কিংবা নিকটতম বাস স্টপ ১ সেকেণ্ডের ১০ লক্ষ ভাগ দূরে এই সমস্ত কথাই আজকাল নির্ভুল অর্থবহ।

দর্শকের দৃষ্টিভঙ্গি অনুমোদন এমন একটি সমস্যা, যে সম্পর্কে পদার্থবিদ্যা চিরকাল সম্পূর্ণ সচেতন: একথা বলা যেতে পারে। আসলে কোপার্নিকাসের আমল থেকে জ্যোতির্বিজ্ঞানে (astronomy) এই সমস্যা প্রাধান্য বিস্তার করেছে এ কথা সত্য। কিন্তু অনেক সময় ফল সম্পূর্ণ আহরণের আগেই নীতিগুলি গৃহীত হয়। যদিও তত্ত্বের দিক দিয়ে এ নীতি সমস্ত পদার্থবিদ্যাবিদই মেনে নিয়েছিলেন তবুও চিরায়ত পদার্থবিদ্যার অনেকাংশের সঙ্গে এই নীতির সঙ্গতি ছিল না।

একগুচ্ছ বিধান (rule) ছিল। সেগুলি ছিল দার্শনিক মনোভাবাপন্নদের অস্বস্তির কারণ। প্রয়োগক্ষেত্রে কিন্তু এগুলি ছিল কার্যকর। সুতরাং পদার্থবিদ্যাবিদরা বিধানগুলি মেনে নিতেন। লক (Locke) 'অপ্রধান' গুণগুলিকে ('secondary' qualities) ব্যক্তিনিষ্ঠ (subjective) গুণ আখ্যা দিয়ে পৃথক করেছিলেন, যেমন : রঙ (colour) কোলাহল (noise), স্বাদ, গন্ধ ইত্যাদি। অন্যদিকে আকার (shape) অবস্থান (position) এবং আয়তনকে (size) বলেছিলেন প্রধান গুণ (primary quality)। তাঁর মতে এগুলি ভৌত বস্তুর অকৃত্রিম ধর্ম। পদার্থবিদ্যাবিদদের বিধানগুলি ছিল এই মতবাদের ফলশ্রুতি। রঙ এবং কোলাহল ব্যক্তিনিষ্ঠ হবার অনুমোদন পেল কিন্তু তার কারণ ছিল নির্দিষ্ট নিশ্চিত গতিতে চলমান তরঙ্গ। ক্ষেত্র অনুসারে শব্দ কিংবা আলোকতরঙ্গ উৎস থেকে বোদ্ধা (percipien) পর্যন্ত চলমান। বাহ্যতঃ প্রতীয়মান আকারের পরিবর্ত্তন হয় দর্শনানুপাতের বিধি (Law of perspective) অনুসারে। এ বিধিগুলি কিন্তু সরল—ফলে বাহ্যতঃ প্রতীয়মান কয়েকটি চাক্ষুষ আকার থেকে বাস্তব (real) আকার অনুধাবন করা সহজ। তাছাড়া বস্তুপিণ্ডগুলি নিকটস্থ হলে স্পর্শের সাহায্যেও 'বাস্তব' আকার নির্ণয় করা যায়। আমাদের বোধের কাল এবং প্রেরণার গতি (velocity of transmission) বিচার করে একটি ভৌত ঘটনার বস্তুনিষ্ঠ কাল নির্ণয় করা সম্ভব। পরিস্থিতি অনুসারে প্রেরণের গতি হতে পারে আলোকের, শব্দের কিংবা স্নায়বিক প্রবাহের (current)। পেশা বহির্ভূত সময়ে তাদের বিবেকদংশন যে রকমই হোক না কেন, কার্যক্ষেত্রে পদার্থবিদ্যাবিদরা এই দৃষ্টিভঙ্গিই গ্রহণ করতেন।

যতদিন পর্য্যন্ত পদার্থবিদ্যাবিদরা ভূ-পৃষ্ঠে প্রচলিত গতির তুলনায় অতি বৃহৎ গতি নিয়ে কাজ না করেছেন ততদিন পর্যন্ত এ দৃষ্টিভঙ্গিতে ভালই কাজ চলেছে। একটা এক্সপ্রেস ট্রেন মিনিটে দু'মাইল যায়, একটি গ্রহ যায় সেকেণ্ডে কয়েক মাইল। সূর্যের কাছে থাকলে ধূমকেতুগুলি অনেক বেশী দ্রুতগামী কিন্তু অবিচ্ছিন্ন ভাবে আকারের পরিবর্তন হওয়ার দরুণ খুব নির্ভুলভাবে তাদের অবস্থান নির্ণয় করা সম্ভব নয়। কার্যক্ষেত্রে, ঠিকভাবে গতিবিদ্যা প্রয়োগ করার উপযুক্ত বস্তুপিণ্ডগুলির ভিতরে গ্রহই ছিল সবচাইতে দ্রুতগামী। তেজস্ক্রিয়তা ও মহাজাগতিক রশ্মি আবিষ্কার এবং অধুনা উচ্চশক্তি সম্পন্ন ত্বরণ যন্ত্র (accelerating machines) আবিষ্কারের ফলে পর্য-

আমরা যে মুহূর্তে সেগুলি দেখতে পাই সেই মুহূর্তে। আলোকের গতি সেকেণ্ডে ৩০০০০০ কিলোমিটার (প্রায় ১৮৬০০০ মাইল)। সূর্য থেকে পৃথিবীতে আসতে আলোকের প্রায় ৮ মিনিট সময় লাগে আর তারাগুলি থেকে আসতে সময় লাগে ৪ থেকে কয়েক হাজার মিলিয়ন বছর পর্যন্ত। আমরা অবশ্য, সূর্যে একটা ঘড়ি বসিয়ে সেখান থেকে গ্রীণউইচ মধ্যক সময় (Greenwich Mean Times) ১২ টাতে আলোর ঝলক পাঠিয়ে গ্রীণউইচে সেই আলোর ঝলককে —১২টা ৮ মিনিটে ধরতে পারি না। আলোকের দ্রুতি নির্ধারণে আমাদের পদ্ধতি শব্দের ক্ষেত্রে প্রতিধ্বনি ব্যবহারের মত। আমরা আলোকচ্ছটা (flash of ligh) আয়নার দিকে পাঠাতে পারি এবং পর্যবেক্ষণ করতে পারি প্রতিফলনের আমাদের কাছে আসতে কত সময় লাগে। তাহলে আমরা পাই আয়না অবধি যাতায়াতের সময় অর্থাৎ ভ্রমণকালের দ্বিগুণ। আয়নার দূরত্ব যদি মাপা যায় তাহলে আলোকে দ্রুতিও (speed) গণনা করা সম্ভব।

কাল মাপনের পদ্ধতি আজকাল এত নির্ভুল (Precise) যে এ পদ্ধতি এখন ব্যবহার করা হয় দূরত্ব নির্ধারণের জন্য—আলোকের দ্রুতি মাপনের জন্য নয়। ১৯৮৩ সালের একটি আন্তর্জাতিক চুক্তি অনুসারে "এক সেকেণ্ডের ১ ২৯৯৭৯২৪৫৮ সেকেণ্ডে শূন্যস্থানে আলোক যে পথ অতিক্রম করে সেটাই এক মিটার।" পদার্থবিদ্যাবিদদের দৃষ্টিভঙ্গিতে আলোকের দ্রুতি এখন রূপান্তর গুণকে (conversion factor) পরিণত হয়েছে। ঠিক যেমন গুণক ০.৯১৪৪ ব্যবহার করা হয় গজ-হিসাবে-দূরত্বকে মিটার-হিসাবে-দূরত্বে রূপান্তরিত করার জন্য তেমনি আলোকের দ্রুতিকে ব্যবহার করা হয় দূরত্বকে সময়ে রূপান্তরিত করার জন্য। সূর্য আট মিনিট দূরে কিংবা নিকটতম বাস স্টপ ১ সেকেণ্ডের ১০ লক্ষ ভাগ দূরে এই সমস্ত কথাই আজকাল নির্ভুল অর্থবহ।

দর্শকের দৃষ্টিভঙ্গি অনুমোদন এমন একটি সমস্যা, যে সম্পর্কে পদার্থবিদ্যা চিরকাল সম্পূর্ণ সচেতন : একথা বলা যেতে পারে। আসলে কোপার্নিকাসের আমল থেকে জ্যোতির্বিজ্ঞানে (astronomy) এই সমস্যা প্রাধান্য বিস্তার করেছে এ কথা সত্য। কিন্তু অনেক সময় ফল সম্পূর্ণ আহরণের আগেই নীতিগুলি গৃহীত হয়। যদিও তত্ত্বের দিক দিয়ে এ নীতি সমস্ত পদার্থবিদ্যাবিদই মেনে নিয়েছিলেন তবুও চিরায়ত পদার্থবিদ্যার অনেকাংশের সঙ্গে এই নীতির সঙ্গতি ছিল না।

একগুচ্ছ বিধান (rule) ছিল। সেগুলি ছিল দার্শনিক মনোভাবাপন্নদের অস্বস্তির কারণ। প্রয়োগক্ষেত্রে কিন্তু এগুলি ছিল কার্যকর। সুতরাং পদার্থ-বিদ্যাবিদরা বিধানগুলি মেনে নিতেন। লক (Locke) 'অপ্রধান' গুণগুলিকে ('secondary' qualities) ব্যক্তিনিষ্ঠ (subjective) গুণ আখ্যা দিয়ে পৃথক করেছিলেন, যেমন : রঙ (colour) কোলাহল (noise), স্বাদ, গন্ধ ইত্যাদি। অন্যদিকে আকার (shape) অবস্থান (position) এবং আয়তনকে (size) বলেছিলেন প্রধান গুণ (primary quality)। তাঁর মতে এগুলি ভৌত বস্তুর অকৃত্রিম ধর্ম। পদার্থবিদ্যাবিদদের বিধানগুলি ছিল এই মতবাদের ফলশ্রুতি। রঙ এবং কোলাহল ব্যক্তিনিষ্ঠ হবার অনুমোদন পেল কিন্তু তার কারণ ছিল নির্দিষ্ট নিশ্চিত গতিতে চলমান তরঙ্গ। ক্ষেত্র অনুসারে শব্দ কিংবা আলোকতরঙ্গ উৎস থেকে বোদ্ধা (percipien) পর্যন্ত চলমান। বাহ্যতঃ প্রতীয়মান আকারের পরিবর্তন হয় দর্শনানুপাতের বিধি (Law of perspective) অনুসারে। এ বিধিগুলি কিন্তু সরল—ফলে বাহ্যতঃ প্রতীয়মান কয়েকটি চাক্ষুষ আকার থেকে বাস্তব (real) আকার অনুধাবন করা সহজ। তাছাড়া বস্তুপিণ্ডগুলি নিকটস্থ হলে স্পর্শের সাহায্যেও 'বাস্তব' আকার নির্ণয় করা যায়। আমাদের বোধের কাল এবং প্রেরণার গতি (velocity of transmission) বিচার করে একটি ভৌত ঘটনার বস্তুনিষ্ঠ কাল নির্ণয় করা সম্ভব। পরিস্থিতি অনুসারে প্রেরণের গতি হতে পারে আলোকের, শব্দের কিংবা স্নায়বিক প্রবাহের (current)। পেশা বহির্ভূত সময়ে তাদের বিবেক-দংশন যে রকমই হোক না কেন, কার্যক্ষেত্রে পদার্থবিদ্যাবিদরা এই দৃষ্টিভঙ্গিই গ্রহণ করতেন।

যতদিন পর্য্যন্ত পদার্থবিদ্যাবিদরা ভূ-পৃষ্ঠে প্রচলিত গতির তুলনায় অতি বৃহৎ গতি নিয়ে কাজ না করেছেন ততদিন পর্যন্ত এ দৃষ্টিভঙ্গিতে ভালই কাজ চলেছে। একটা এক্সপ্রেস ট্রেন মিনিটে দু'মাইল যায়, একটি গ্রহ যায় সেকেণ্ডে কয়েক মাইল। সূর্যের কাছে থাকলে ধূমকেতুগুলি অনেক বেশী দ্রুতগামী কিন্তু অবিচ্ছিন্ন ভাবে আকারের পরিবর্তন হওয়ার দরুণ খুব নির্ভুলভাবে তাদের অবস্থান নির্ণয় করা সম্ভব নয়। কার্যক্ষেত্রে, ঠিকভাবে গতিবিদ্যা প্রয়োগ করার উপযুক্ত বস্তুপিণ্ডগুলির ভিতরে গ্রহই ছিল সবচাইতে দ্রুত-গামী। তেজস্ক্রিয়তা ও মহাজাগতিক রশ্মি আবিষ্কার এবং অধুনা উচ্চশক্তি সম্পন্ন ত্বরণ যন্ত্র (accelerating machines) আবিষ্কারের ফলে পর্য-

বেক্ষণকে নূতন অঞ্চলে (New ranges) প্রসারিত করা সম্ভব হয়েছে। একক উনপারমাণবিক বস্তুকণা এখন পর্যবেক্ষণ করা যায়। তাদের গতি আলোকের গতির চাইতে খুব কম নয়। প্রাচীন তত্বগুলি যে প্রত্যাশার পথিকৃৎ এই বিরাট দ্রুতিতে চলমান বস্তুপিণ্ডগুলির আচরণ সেরকম নয়। একটা ব্যাপার : দ্রুতি বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে নির্ভুল, নিশ্চিত, নির্দিষ্ট-ভাবে ভর বৃদ্ধি পায়। অতিদ্রুত চলমান একটি ইলেক্ট্রনের ক্ষেত্রে দেখা যায় : তার উপরে একটি নির্দিষ্ট বলের ক্রিয়া স্বল্প গতিসম্পন্ন অবস্থার তুলনায় বেশী বেগ সম্পন্ন অবস্থায় কম। একটি বস্তুপিণ্ডের আয়তন তার গতিদ্বারা প্রভাবিত হয়—এ চিন্তনের যুক্তি খুঁজ পাওয়া গিয়েছে। উদাহরণ : একটি ঘনককে (cub) যদি আপনি অতি দ্রুত চালনা করেন তাহলে তার সঙ্গ চলমান নয়—এরকম ব্যক্তি সাপেক্ষ ঘনকটির দৈর্ঘ্য গতির অভিমুখে হ্রস্বতর হবে। কিন্তু তার নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি থেকে (অর্থাৎ ঘনকের সঙ্গ চলমান পর্যবেক্ষক সাপেক্ষ) ঘনকটি একই রকম থাকবে। আরও বিস্ময়কর আবিষ্কার ছিল : কালাতিপাত (lapse of time) গতির উপর নির্ভরশীল। অর্থাৎ দুটি সম্পূর্ণ নির্ভুল ঘড়ির একটি যদি অন্যটি সাপেক্ষ দ্রুত চলমান হয় এবং ভ্রমণ সমাপ্ত করে ঘড়ি দুটি যদি আবার একত্রিত হয় তাহলে তারা একই সময় প্রদর্শন করবে না। এ অভিক্রিয়া (effec) এত ক্ষুদ্র যে এতদিন পরীক্ষা করা যায়নি। কিন্তু আন্তঃতারকা ভ্রমণ বিকাশে যদি আমরা কখনো সাফল্য লাভ করি তাহলে এ তথ্য পরীক্ষা সম্ভব হবে। কারণ তখন আমরা এত দীর্ঘ ভ্রমণ করতে পারব যে যাকে এই কাল শ্লথন (time dilatation) বলা হয়—সেটা বেশ বোধগম্য হবে।

কাল শ্লথনের কয়েকটি প্রত্যক্ষ সাক্ষ্য রয়েছে কিন্তু সে সাক্ষ্য পাওয়া যায় একটু অন্যভাবে। এ সাক্ষ্য আসে মহাজাগতিক (Cosmic) রশ্মি পর্যবেক্ষণ থেকে। এ রশ্মিগুলি নানারকম পারমাণবিক বস্তুকণা দিয়ে গঠিত। পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের ভিতরে এদের গতি অত্যন্ত দ্রুত। এর ভিতরে মেসন (Meson) নামে কতগুলি কণা উড়ন্ত অবস্থায় বহুভাগে ভেঙে যায়। এই বিভাজন পর্যবেক্ষণ করা সম্ভব। পৃথিবীর বৈজ্ঞানিকের দৃষ্টিতে মেসনের গতি যত দ্রুত তার বিভাজনের সময় লাগে তত বেশী। এই ধরণের পর্যবেক্ষণফলের সিদ্ধান্ত : যাকে আমরা ব্যক্তিনিরপেক্ষ বিজ্ঞানের পরকাষ্ঠা বলে মনে করতাম, ঘড়ি এবং ফুটরুলের সাহায্যে করা সেই আবিষ্কারগুলিও আংশিকভাবে

আমাদের নিজস্ব ব্যক্তিগত পরিবেশের উপর নির্ভরশীল অর্থাৎ নির্ভরশীল পরিমাপ করা বস্তুপিণ্ড সাপেক্ষ আমাদের গতির চরিত্রের উপর।

এ থেকে বোঝা যায়, কতটা পর্যবেক্ষকের অধিকারে এবং কতটা যে ঘটনা পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে তার অধিকারে—এ সম্পর্কে প্রচলিত সীমারেখার বদলে ভিন্ন একটি সীমারেখা আঁকতে হবে। নীল চশমা পরলে আপনি বুঝতে পারেন, আপনার দেখা সবকিছুর নীল রঙের কারণ ঐ চশমা। আপনি যা দেখছেন রঙটা তার অংশ নয়। আপনি যদি দুটি বিদ্যুৎচমক পর্য-বেক্ষণ করেন, আপনার পর্যবেক্ষণ দুটির অন্তর্বর্তী সময় যদি আপনার জানা থাকে, বিদ্যুৎ চমকের স্থানগুলি যদি আপনি জানেন, প্রতিটি ক্ষেত্রে আলোকের আপনার কাছে আসতে কতটা সময় লাগে সেটা যদি বিচারের ভিতর গ্রহণ করেন, আপনার কালমাপক যন্ত্র যদি নির্ভুল হয়, তাহলে সে ক্ষেত্রে দুটি বিদ্যুৎচমকের অন্তর্বর্তীকাল আপনি আবিষ্কার করেছেন, একথা আপনার পক্ষে ভাবা স্বাভাবিক। তাছাড়া এও ভাবতে পারেন এ আবিষ্কার আপনার একান্ত ব্যক্তিগত কিছু নয়। অন্যান্য যে সমস্ত সতর্ক পর্যবেক্ষকের সংবাদ আপনার জানা সম্ভব, তাঁরা যদি আপনার অনুমানের সঙ্গে একমত হন, তা হলে এই দৃষ্টিভঙ্গি আপনার কাছে সত্য বলে প্রতিপন্ন হবে। আসলে এর কারণ, আপনারা সবাই পৃথিবীবাসী এবং পৃথিবীর গতির অংশীদার। এমন কি বিপরীত অভিমুখগামী দুটি মহাকাশ যানে অবস্থিত দুজন পর্যবেক্ষকের আপেক্ষিক বেগ (relative velocity) হবে ঘণ্টায় প্রায় পঁয়ত্রিশ হাজার মাইল। সেকেণ্ডে ১৮৬ ০০০ (আলোকের বেগ) মাইলের তুলনায় এ বেগ অতি অল্প। সেকেণ্ডে ১৭০,০০০ মাইল বেগ সম্পন্ন একটি ইলেকট্রন দুটি চমকের অন্তর্বর্তীকাল মাপলে, আলোকের বেগ গণনার ভিতর গ্রহণ করেও তার অনুমান হোত সম্পূর্ণ পৃথক। পাঠক জিজ্ঞাসা করতে পারেন: আপনি কি করে জানলেন? আপনি ইলেকট্রন নন, এই রকম ভয়ঙ্কর দ্রুত আপনি চলতে পারেন না, আপনার বিবৃতির সত্যতা প্রমাণ করার জন্য কোনো বৈজ্ঞানিক এ পর্যবেক্ষণ করেন নি। তা সত্ত্বেও এই দৃঢ় ঘোষণার সপক্ষে যথেষ্ট যুক্তি রয়েছে, এবং পরের অংশে সে যুক্তি আমরা দেখব। প্রথম যুক্তি পরীক্ষা ভিত্তিক, দ্বিতীয়টি যৌক্তিক। লক্ষণীয় ব্যাপার: এ যুক্তির ভিত্তি যে কোনো সময়েই করা যেত কিন্তু যতদিন পর্যন্ত পরীক্ষায় না দেখা গিয়েছে যে আগেকার যুক্তি নিশ্চয়ই ভুল ততদিন পর্যন্ত সে ভিত্তি তৈরী হয় নি।

অপেক্ষবাদের আবেদন একটি সাধারণ নীতির কাছে। দেখা গিয়েছে যে কোনো লোকের অনুমানের চাইতে সে নীতি বেশী ক্ষমতাশালী। আপনি যদি জানেন, এক ব্যক্তি অন্য একজনের চাইতে দ্বিগুণ ধনী তাহলে তাদের সম্পদ পাউন্ড, ডলার, ফ্রাঁ কিংবা অন্য যে কোনো মুদ্রায়ই মাপুন না কেন, ব্যাপারটা একই রকম দেখাবে। সম্পদের পরিমাণজ্ঞাপক রাশির পরিবর্তন হবে, কিন্তু একটি রাশি সব সময়ই হবে অন্যটির দ্বিগুণ। পদার্থ-বিদ্যায় হয়েছে একই রকম ব্যাপারের পুনরাবির্ভাব তবে আরও জটিলভাবে। যে কোনো গতিই আপেক্ষিক সুতরাং আপনি যে কোনো বস্তুপিন্ডকেই প্রমাণ নির্দেশক বস্তুপিন্ডরূপে (standard body of reference) গ্রহণ করে সমস্ত গতিকে সেই বস্তুপিন্ড সাপেক্ষ গণনা করতে পারেন। আপনি যদি একটি ট্রেনে থাকেন এবং খাবার ঘরে হেঁটে যান তাহলে স্বাভাবিক কারণেই আপনি ট্রেনটাকে স্থির ভাবেন এবং আপনার গতি মাপেন ঐ ট্রেন সাপেক্ষ। কিন্তু আপনি যখন নিজের ভ্রমণের কথা চিন্তা করেন তখন আপনার বিচারে পৃথিবীটা স্থির। সে সময় বলেন—আপনি চলেছেন ঘণ্টায় যাট মাইল বেগে। যে জ্যোতির্বিজ্ঞানীর চিন্তন সৌরতন্ত্র নিয়ে তাঁর বিচারে সূর্য স্থির এবং আপনি আবর্তনশীল (rotating) এবং ঘূর্ণায়মান (revolving)। এই গতির তুলনায় ট্রেনের গতি এত ধীর যে হিসাবেই আসতে চায় না। তারকীয় মহা-বিশ্বে যে জ্যোতির্বিজ্ঞানীর আকর্ষণ তিনি হয়ত এরসঙ্গে তারকার গড় গতি সাপেক্ষ সূর্যের গতি যোগ করবেন। আপনার গতি নির্দ্ধারণের এই পদ্ধতি-গুলির ভিতরে একটির চাইতে অন্যটি বেশী নির্ভুল, একথা আপনি বলতে পারেন না। নির্দেশ বস্তুপিন্ড যখনই অরোপিত হয় তখন প্রতিটি পদ্ধতিই বিশুদ্ধ নির্ভুল। অন্য সম্পদের সঙ্গে সম্পর্কের পরিবর্তন না করেও আপনি যেমন একটি সম্পদ বিভিন্ন মুদ্রায় গণনা করতে পারেন তেমনি বিভিন্ন নির্দেশ বস্তুপিন্ডের সাহায্যে একটি বস্তুপিন্ডের গতি নির্দ্ধারণ করতে পারেন। এর ফলে সেই গতির সঙ্গে অন্য গতির সম্পর্কের কোনো পরিবর্তন হবে না। পদার্থবিদ্যার চিন্তনের সবটাই সম্পর্ক নিয়ে সুতরাং সংশ্লিষ্ট যে কোনো একটি বস্তুপিন্ডকে প্রমাণ মাপক (Standard) রূপে গ্রহণ করে সমস্ত বস্তুপিন্ডকে সেই মাপক সাপেক্ষ বিচার করে সম্পূর্ণ ভৌতবিধি প্রকাশ করা নিশ্চয়ই সম্ভব।

ব্যাপারটা অন্যভাবেও বলা যেতে পারে। পদার্থবিদ্যার উদ্দেশ্য ভৌত-জগতে বাস্তবে কি ঘটছে সে সম্পর্কে সংবাদ দেয়া। শুধুমাত্র একাধিক

বিচ্ছিন্ন পর্যবেক্ষকের একান্ত (private) অনুভূতি সম্পর্কে সংবাদ দেয়া পদার্থবিদ্যার উদ্দেশ্য নয়। সুতরাং পদার্থবিদ্যার অবশ্যই ভৌত পদ্ধতির সেই সমস্ত অবয়ব নিয়ে চিন্তা করতে হবে যে অবয়বগুলি সমস্ত পর্যবেক্ষকের ক্ষেত্রেই সমরূপ ; কারণ একমাত্র সেই অবয়বগুলিকেই ভৌতঘটনার নিজস্ব বলে ভাবা যেতে পারে। এর জন্য প্রয়োজন সে ঘটনা একজন পর্যবেক্ষকের কাছে কি রকম দেখায় কিংবা অপরের কাছে কি রকম দেখায় সে তথ্য নির্বিশেষে পরিঘটনা সম্পর্কীয় বিধিগুলির অভিন্ন হওয়া। এই একটিমাত্র নীতিই সমগ্র অপেক্ষবাদের উদ্দেশ্য এবং এই উদ্দেশ্যই অপেক্ষবাদের জনক।

এতদিন পর্যন্ত আমরা যেগুলিকে ভৌতঘটনার স্থানিক এবং কালিক ধর্ম ভেবেছি এখন দেখা যাচ্ছে সেটা অনেকাংশে নির্ভর করে পর্যবেক্ষকের উপর। শুধুমাত্র অবশিষ্ট অংশকেই ঘটনার নিজস্ব গুণ বলা যেতে পারে। যে ভৌতবিধির সত্য হওয়ার সম্ভাবনা পূর্বত সিদ্ধ (a prion), সে বিধিগুলি গঠনে শুধুমাত্র এই অবশিষ্ট অংশই জড়িত হতে পারে। আইনস্টাইন হাতের কাছে শুদ্ধগণিতের একটি সাধনী (instrument) পেয়েছিলেন, তার নাম টেনসর (Tensor) তত্ত্ব। সে তত্ত্বের বাগবিধিতে বস্তুনিষ্ঠ অবশিষ্টাংশকে অঙ্গীভূত করে বিধি প্রকাশিত হতে পারে। এ তত্ত্বের সঙ্গে প্রাচীন বিধির আসন্ন (approximate) ঐক্য থাকবে। যে সব ক্ষেত্রে অপেক্ষবাদের ভবিষ্যদবাণীর সঙ্গে প্রাচীন বিধির পার্থক্য, সে সব ক্ষেত্রে অপেক্ষবাদের ভবিষ্যদবাণীর সঙ্গে পর্যবেক্ষণের ঐক্য বেশী। এ তথ্য ইদানীংকাল পর্যন্ত প্রমাণিত হয়েছে।

ভৌত জগতে যদি বাস্তবতা কিছু না থাকত, শুধুমাত্র যদি থাকত কিছু লোকের দেখা কয়েকটি স্বপ্ন তাহলে একজনের স্বপ্নের সঙ্গে আর একজনের স্বপ্ন সংযুক্ত করে কোনো বিধি আমাদের আশা করা উচিত হোত না। এক ব্যক্তির অনুভূতির সঙ্গে অন্য ব্যক্তির অনুভূতির মোটামুটি তাৎক্ষণিক ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক, বিভিন্ন অনুভূতির সাধারণ বাহ্যিক উৎপত্তি সম্পর্কে আমাদের বিশ্বাস সৃষ্টি করে। আমরা যাকে একই ঘটনা বলি সে সম্পর্কে পদার্থবিদ্যা বিভিন্ন ব্যক্তির অনুভূতির ঐক্য এবং অনৈক্যের কারণ প্রদর্শন করে। এ কাজ করতে গেলে পদার্থবিদ্যাবিদের প্রথম প্রয়োজন ঐক্যগুলি ঠিক কি সেটা নির্দ্ধারণ করা। সেগুলি ঠিক ঐতিহ্যগত অনুমান নয়। কারণ এককভাবে স্থান কিংবা কালকে সম্পূর্ণ বস্তুনিষ্ঠ বলে গ্রহণ করা যায় না। বস্তুনিষ্ঠ বলা যায় 'স্থান কালের' এক ধরণের মিশ্রণকে। এর ব্যাখ্যা সহজ নয় কিন্তু চেষ্টা করতেই হবে। সে চেষ্টা শুরু হবে পরের অধ্যায়ে।

তৃতীয় অধ্যায়

আলোকের বেগ (Velocity)

অপেক্ষবাদের অধিকাংশ অদ্ভুত ব্যাপারই আলোকের বেগের সঙ্গে জড়িত। যে সমস্ত কারণে প্রাচীনতন্ত্র ভেঙে পড়েছে সে সম্পর্কে খানিকটা ধারণা না থাকলে পাঠক এই গুরুত্বপূর্ণ তাত্ত্বিক পুনর্গঠনের কারণ বুঝতে পারবেন না।

আলোক নির্দিষ্ট নিশ্চিত বেগে প্রেরিত হয় এ তথ্য প্রথম প্রমাণিত হয়েছে জ্যোতিষীয় (Astronomical) পর্যবেক্ষণের সাহায্যে। বৃহস্পতি গ্রহের চন্দ্রগুলিতে অনেক সময় বৃহস্পতি নিজেই গ্রহণ সৃষ্টি করে। এ ঘটনার সম্ভাব্যকাল গণনা করা সহজ। দেখা গিয়েছিল বৃহস্পতি যখন পৃথিবীর কাছাকাছি তখন একটি চন্দ্রের গ্রহণ দেখা যাবে প্রত্যাশিত সময়ের কয়েক মিনিট আগে আর বৃহস্পতি যখন দূরে তখন সেই গ্রহণ দেখা যাবে প্রত্যাশিত সময়ের কয়েক মিনিট পর। দেখা গেল, আলোকের একটি বিশেষ বেগ রয়েছে : এই অনুমানের ভিত্তিতে এই সমস্ত বিচ্যুতি ব্যাখ্যা করা যায়। অর্থাৎ বৃহস্পতিতে ঘটমান যা কিছু আমরা লক্ষ্য করি সেগুলি ঘটেছে কিছুক্ষণ আগে। বৃহস্পতি যখন কাছে তখনকার তুলনায় বৃহস্পতি যখন দূরে তখন একটু বেশী সময় আগে ঘটনাগুলি ঘটেছে। দেখা গেল সৌরতন্ত্রের অন্যান্য অংশ বিষয়ে সমরূপ ঘটনার ব্যাখ্যাও আলোকের এই বেগের সাহায্যে করা সম্ভব। সুতরাং মেনে নেওয়া হল, শূন্যস্থানে আলোক সব সময়ই একটি স্থির বেগে চলে। সে বেগ সেকেণ্ডে তিন লক্ষ কিলোমিটার (এক কিলোমিটার এক মাইলের আট ভাগের প্রায় পাঁচ ভাগ)। এ রাশি প্রায় নির্ভুল। তরঙ্গ দিয়ে আলোক গঠিত এ তথ্য যখন প্রতিষ্ঠিত হল তখন এটা ছিল ইথারের তরঙ্গ বিস্তারের বেগ। তখন অন্তত তরঙ্গ ছিল ইথারে। কিন্তু এখন ইথারকে পরিত্যাগ করা হয়েছে কিন্তু তরঙ্গ রয়ে গিয়েছে। একই বেগ বেতার তরঙ্গের (এগুলি আলোক তরঙ্গের মত—শুধু দীর্ঘতর) এবং এক্সরের। (এগুলি আলোক তরঙ্গের মত তবে হ্রস্বতর)। এখনকার বিশ্বাস একই বেগে মহাকর্ষও বিস্তার লাভ করে। (অপেক্ষবাদ আবিষ্কারের আগে ভাবা হোত মহাকর্ষের বিস্তার তাৎক্ষণিক। কিন্তু এখন এ দৃষ্টিভঙ্গি অচল)।

এ পর্যন্ত সবটাই সহজ সরল। কিন্তু নির্ভুলতর মাপন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নানা সঙ্কট জমতে লাগল। অনুমান করা গিয়েছিল তরঙ্গগুলি ইথারের সুতরাং তাদের বেগও হওয়া উচিৎ ইথার সাপেক্ষ। কিন্তু স্পষ্টতই ইথার (যদি তার অস্তিত্ব থাকে) নভোমণ্ডলের বস্তুপিণ্ডগুলির গতিতে কোনো বাধাদান করে না সুতরাং ইথার তাদের গতিতে অংশ গ্রহণ করে না, একথা মনে হওয়া স্বাভাবিক। একটা জাহাজকে যেরকম তার সামনে অনেকটা জল ঠেলতে হয় পৃথিবীকেও যদি সেরকম ইথার ঠেলে এগোতে হোত তাহলে জাহাজকে যেরকম জল বাধা দেয় পৃথিবীর ক্ষেত্রেও সেরকম ইথারের বাধা প্রত্যাশা করা উচিৎ ছিল। সুতরাং সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গি ছিল : মোটা ছ্যাঁদাওয়ালা ছাকনির ভিতর দিয়ে যেরকম বাতাস যাতায়াত করতে পারে ইথারও সেরকম বস্তুপিণ্ডগুলির ভিতর দিয়ে অনায়াসে যাতায়াত করতে পারে। পার্থক্য শুধু : এ ক্ষমতা ইথারের বেশী। ব্যাপারটা যদি এই হয় তাহলে নিশ্চয়ই কক্ষস্থিত পৃথিবীর সঙ্গে ইথারের একটা আপেক্ষিক বেগ থাকা উচিৎ। এরকম যদি হোত যে, কক্ষের কোনো এক বিন্দুতে পৃথিবী নির্ভুল সমরূপে ইথারের সঙ্গে চলমান তাহলে অন্য বিন্দুতে তার চলন নিশ্চয়ই দ্রুততর হোত। আপনি যদি একটা চক্রাকার পথে ঝড়ের দিনে হাঁটেন তাহলে বাতাস যেদিক থেকেই আসুক না কেন খানিকটা পথ আপনাকে বায়ুস্রোতের বিরুদ্ধে যেতে হবে। পৃথিবী এবং ইথারের ক্ষেত্রেও এই একই নিয়ম। এর ফলশ্রুতি : আপনি যদি ছ' মাস ব্যবধানে দুটি দিন নির্দ্ধারিণ করেন তাহলে পৃথিবী তার কক্ষে একদিনের তুলনায় অন্যদিন নির্ভুল বিপরীত দিকে চলমান হবে। সুতরাং এর ভিতরে কোনো একদিন নিশ্চয়ই পৃথিবী ইথার স্রোতের বিরুদ্ধগামী হবে।

এখন এ তথ্য স্পষ্ট যে ইথারের স্রোত যদি থাকে এবং পৃথিবীতে যদি একজন পর্যবেক্ষক থাকে তাহলে তার মনে হবে স্রোতকে আড়াআড়ি-ভাবে অতিক্রমের সময়ের চাইতে স্রোতের অভিমুখে গমনের সময় আলোক-সঙ্কেতের গতি দ্রুততর আবার স্রোতের বিপরীতে যাবার সময়ের তুলনায় স্রোতকে আড়াআড়িভাবে অতিক্রমের সময়ে আলোক সঙ্কেতের গতি দ্রুত-তর মনে হবে। মিচেলসন (Michelson) এবং মর্লি (Morley) তাঁদের বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় এই ব্যাপারটাই জানতে চেয়েছিলেন। তাঁরা দুটি অভিমুখে দুটি আলোক সঙ্কেত পাঠিয়েছিলেন। অভিমুখ দুটি একটি অন্যটির সমকোণে। প্রতিটি সঙ্কেতই একটা আয়না থেকে

প্রতিফলিত হয়ে যেখান থেকে প্রেরিত হয়েছিল সেখানেই ফিরে আসে। পরীক্ষা কিংবা সামান্য গণিতের সাহায্যে যেকোনো লোকই যাচাই করে দেখতে পারেন : একটি নদী আড়াআড়ি পেরিয়ে ফিরে আসতে যে সময় লাগে তার চাইতে একই দূরত্ব স্রোতের বিপক্ষে গিয়ে আবার ফিরে আসতে বেশী সময় লাগে। আলোক সঙ্কেতগুলি ইথার তরঙ্গ দিয়ে গঠিত। সুতরাং ইথার প্রবাহ যদি থাকত তাহলে দুটি আলোক সঙ্কেতের ভিতরের একটির আয়নায় গিয়ে ফিরে আসার গড় হার (average rate) অন্যটির তুলনায় মন্থরতর হোত (slower average rate)। মিচেলসন এবং মর্লি এ পরীক্ষা করেন, বিভিন্ন অবস্থান থেকে এ পরীক্ষা করেন, পরে আবারও পরীক্ষা করেন। তাঁদের যন্ত্রপাতি যথেষ্ট নির্ভুল ছিল, ছিল দ্রুতির প্রত্যাশিত পার্থক্য কিংবা তার চাইতে কম পার্থক্য ধরতে পারার উপযুক্ত, —যদি অবশ্য কোনো পার্থক্য থাকত। কিন্তু ক্ষুদ্রতম পার্থক্যও ধরা পড়েনি। এই পরীক্ষার ফল তাঁদের কাছে এবং সবার কাছেই ছিল একটা বিস্ময়। কিন্তু একাধিক সযত্ন পুনরাবৃত্তি করার ফলে সন্দেহ করা ছিল অসম্ভব। এ পরীক্ষা প্রথম করা হয় অনেক আগে,১৮৮১ সালে। আরও বিস্তৃত ব্যবস্থাপনা করে, দ্বিতীয়বার পরীক্ষা করা হয় ১৮৮৭ সালে। কিন্তু এ পরীক্ষার সঠিক ব্যাখ্যা হয় বহু বছর পর।

পৃথিবী তার গতির সঙ্গে নিজ সান্নিধ্যের ইথার বহন করে,—অনেকগুলি কারণে এ অনুমান ছিল অসম্ভব। সুতরাং একটি যৌক্তিক অচলাবস্থা সৃষ্টি হয়েছিল বলে মনে হয়। কতকগুলি অতীব যাদৃচ্ছিক প্রকল্পের সাহায্যে পদার্থবিদ্যাবিদরা এ অবস্থা থেকে মুক্তির চেষ্টা করেন। এগুলির ভিতরে সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প ছিল ফিট জারাল্ডের (Fit Zerald)। এ প্রকল্প লোরেঞ্জের (Lorentz) সাহায্যে বিকাশ লাভ করে এবং এখন লোরেঞ্জ সংকোচন প্রকল্প নামে (Lorentz Contraction Hypothesis) পরিচিত।

এই প্রকল্প অনুসারে একটি বস্তুপিণ্ড যখন গতিশীল তখন গতির অভিমুখে তার সংকোচন হয়। সংকোচনের অনুপাত তার বেগের উপর নির্ভরশীল। সংকোচনের পরিমাণ মিচেলসন মর্লি পরীক্ষার অপরা ফল (negative result) ব্যাখ্যা করার পক্ষে পর্যাপ্ত মাত্র! স্রোতের মুখে যাতায়াত আসলে স্রোতের আড়াআড়ি যাতায়াতের তুলনায় হ্রস্বতর ভ্রমণ

এবং এই হ্রস্বতা হোত ততটুকুই যতটুকু দূরত্ব ধীরতর আলোকতরঙ্গ একই সময়ে অতিক্রম করতে পারে। এই সংকোচন অবশ্য মাপনের সাহায্যে কখনোই ধরা যেত না কারণ আমাদের মাপন দণ্ডও একই সঙ্গে সঙ্কুচিত হোত। পৃথিবীর গতিরেখার অভিমুখে স্থাপিত একটি ফুট রুলের দৈর্ঘ্য গতিরেখার সমকোণে স্থাপিত একই ফুটরুলের দৈর্ঘ্যের চাইতে কম হবে। এ দৃষ্টি-ভঙ্গির সঙ্গে 'হোয়াইট নাইটের' দৃষ্টিভঙ্গির যতটা সাদৃশ্য রয়েছে আর কিছুর সঙ্গেই ততটা সাদৃশ্য নেই. "এমন ফন্দি যে, সবার গোঁফই সবুজ রঙ করা হবে কিন্তু সবসময় এতবড় একখানা পাখা চালানো হবে যে সে গোঁফ দেখা যাবে না।" কিন্তু অদ্ভুত ব্যাপার হল এ ফন্দিতে কাজ ভালই চলছিল, পরে যখন আইনস্টাইন তাঁর বিশিষ্ট অপেক্ষবাদ উপস্থাপন করলেন (১৯০৫) তখন দেখা গেল প্রকল্পটি একটি বিশেষ অর্থে নির্ভুল, কিন্তু শুধুমাত্র একটি বিশেষ অর্থেই। অর্থাৎ অনুমিত সংকোচন কোনো ভৌত বাস্তবতা নয়, শুধু কয়েকটি মাপন রীতির ফলশ্রুতি মাত্র। সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি একবার খুঁজে পেলে দেখা যায় সে রীতি গ্রহণ করতে আমরা প্রায় বাধ্য। কিন্তু এ ধাঁধাঁর আইনস্টাইনের করা সমাধান এখন আমি প্রকাশ করতে চাইনা। আপাতত আমি শুধু চাই ধাঁধাঁর নিজস্ব চরিত্রটা স্পষ্ট করে বলতে।

আপাতদৃষ্টিতে তদর্থক (ad hoc) প্রকল্পটি ছাড়াও মিচেলসন মর্লি পরীক্ষা (অন্যান্য পরীক্ষার সংযোগে) দেখিয়েছে—পৃথিবী সাপেক্ষ আলোকের গতি সর্বদিকেই অভিন্ন এবং সূর্য প্রদক্ষিণের সময় যদিও পৃথিবীর গতির অভিমুখ সবসময়ই পরিবর্তিত হচ্ছে তবুও বৎসরের সবসময় এ তথ্য সমভাবে সত্য। তাছাড়া দেখা গেল—ব্যাপারটা শুধু পৃথিবীরই বিশেষত্ব নয়, সমস্ত বস্তুপিণ্ড সাপেক্ষই এ তথ্য সত্য। একটি বস্তুপিণ্ড থেকে যদি আলোক সঙ্কেত প্রেরিত হয় তাহলে সে বস্তুপিণ্ডটি যেভাবেই চলমান হোক না কেন—সবসময়ই তার স্থিতি হবে বহির্মুখে বিস্তারমান আলোক তরঙ্গের কেন্দ্রে। অন্ততপক্ষে বস্তুপিণ্ডটির সঙ্গে চলমান পর্যবেক্ষকের সেই ধারণাই হবে। এটাই ছিল পরীক্ষাগুলির সরল এবং স্বাভাবিক অর্থ। আইনস্টাইন সাফল্যের সঙ্গে যে তত্ত্বটি আবিষ্কার করেন সে তত্ত্ব এই তথ্যকে মেনে নিয়েছে। কিন্তু প্রথমে মনে হয়েছিল এই সরল স্বাভাবিক অর্থ মেনে নেওয়া যুক্তির দিক থেকে অসম্ভব।

কয়েকটি উদাহরণ দিলে পরিষ্কার হবে তথ্যগুলি কিরকম অদ্ভুত। কামান দাগলে গোলাটা শব্দের চাইতে আগে যায়. যাদের লক্ষ্য করে

কামান দাগা হল তারা প্রথমে দেখতে পায় আলোর ঝলক, তারপর (যদি কপাল ভাল হয়) গোলাটাকে যেতে দেখে এবং সবচাইতে শেষে শুনতে পায় শব্দ। স্পষ্ট বোঝা যায়, গোলার সঙ্গে যারা যেতে পারত তারা শব্দটা কখনোই শুনতে পেতনা কারণ শব্দটা গোলা অবধি আসবার আগেই গোলার বিস্ফোরণে তাদের মৃত্যু হোত। কিন্তু শব্দের কর্মপদ্ধতি যদি আলোকের মত হোত তাহলে তারা স্থিতাবস্থায় থাকলে যেরকম শুনত, কামানের গোলার সঙ্গে চলমান অবস্থাতেও শুনত সেই ভাবেই। সে ক্ষেত্রে শব্দ প্রতিধ্বনিত করার ক্ষমতাসম্পন্ন একটা পর্দা যদি কামানের গোলার সঙ্গে সংযুক্ত থাকত এবং সঙ্গে চলমান হোত—ধরুণ একশ গজ সামনে—তাহলে তারা পর্দা থেকে প্রতিধ্বনিত কামানের আওয়াজ যে কালব্যবধানে শুনতে পেত সে ব্যবধান হোত তারা আর কামানের গোলা স্থিতাবস্থায় থাকার সময়কার কাল ব্যবধানের সমান। এ পরীক্ষা অবশ্য করা সম্ভব নয় কিন্তু সম্ভাব্য কতগুলি পরীক্ষা থেকে পার্থক্যটা বোঝা যাবে। আমরা একটা রেলপথের উপর এমন একটি স্থান জোগাড় করতে পারি যেখানে ঐ রেলপথেরই উপর দূরস্থিত একটি জায়গা থেকে প্রতিধ্বনি আসে—ধরুণ এমন একটি জায়গা যেখানে রেললাইনটি একটি সুড়ঙ্গের (tunnel) ভিতর দিয়ে গিয়েছে। ট্রেনটি যখন চলমান তখন লাইনের ধার থেকে কেউ একটা বন্দুকের আওয়াজ করুক। ট্রেনের গতি যদি প্রতিধ্বনির অভিমুখী হয় তাহলে ট্রেনের আরোহীরা প্রতিধ্বনি শুনতে পাবে লাইনের পাশের লোকটির চাইতে অনেক আগে কিন্তু অভিমুখ যদি বিপরীত হয় তাহলে তারা শুনতে পাবে পরে। কিন্তু এ পরিস্থিতি ঠিক মিচেলসন মর্লি পরীক্ষার পরিস্থিতির মত নয়। ঐ পরীক্ষার আয়নাগুলি প্রতিধ্বনির অনুরূপ এবং আয়নাগুলি পৃথিবীর সঙ্গে চলমান তাহলে প্রতিধ্বনিরও ট্রেনের সঙ্গে চলমান হওয়া উচিৎ ছিল। অনুমান করা যাক বন্দুকের আওয়াজ করা হয়েছে গার্ডের গাড়ী থেকে এবং প্রতিধ্বনি এসেছে ইঞ্জিনের উপরের একটি পর্দা থেকে। আমাদের অনুমান হবে গার্ডের গাড়ী থেকে ইঞ্জিনের দূরত্ব, শব্দ এক সেকেণ্ডে যতদূর যেতে পারে ততটা (এক মাইলের পাঁচভাগের এক ভাগের মত) এবং ট্রেনের দ্রুতি শব্দের দ্রুতির বারো ভাগের এক ভাগ (ঘণ্টায় প্রায় ষাট মাইল) এখন, এমন একটি পরীক্ষা আমাদের রয়েছে যেটা ট্রেনের আরোহীরা করতে

পারে। গাড়ীটা—স্থিতিশীল থাকলে গার্ড দু সেকেণ্ডে প্রতিধ্বনি শুনবে। এমনিতে (as it is) আসলে সময় লাগবে ২/১৪৩ সেকেণ্ড। শব্দের বেগ জানা থাকলে এই পার্থক্য থেকে গাড়ীর বেগ গণনা করা সম্ভব। এমন কি, রাত যদি কুয়াশাচ্ছন্ন হয়, যদি পার দেখা না যায় তাহলেও। কিন্তু শব্দের আচরণ যদি আলোকের মত হয় তাহলে ট্রেনের গতি যত দ্রুতই হোক না কেন গার্ড দু সেকেণ্ড পরেই প্রতিধ্বনি শুনবে।

ঐতিহ্য এবং সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গি থেকে আলোকের বেগ বিষয়ক তথ্য কিরকম অসাধারণ, সেটা বুঝতে কয়েকটা দৃষ্টান্ত আমাদের সাহায্য করবে। সবাই জানে একটা এস্‌কালেটারে (Escaltor—চলমান সিঁড়ি) উঠে হাঁটলে তাড়াতাড়ি উপরে ওঠা যায়—চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকলে সময় বেশী লাগে। কিন্তু এস্‌কালেটর যদি আলোকের বেগে চলে (এমনকি নিউ ইয়র্কেও এস্‌কালেটর এ বেগে চলে না) তাহলে আপনি হাঁটুন কিংবা চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকুন, পৌঁছবেন একই সময়ে। আবার : আপনি যদি একটা রাস্তা দিয়ে ঘণ্টায় চার মাইল বেগে হাঁটেন, আর একটি মোটর গাড়ী যদি একই অভিমুখে ঘণ্টায় চল্লিশ মাইল বেগে পাশ দিয়ে আপনাকে ছাড়িয়ে যায় এবং আপনি এবং মোটরগাড়ী দুইই যদি চলতে থাকেন তাহলে একঘণ্টা বাদে আপনার সঙ্গে মোটরগাড়ীর দূরত্ব হবে ছত্রিশ মাইল। কিন্তু আপনার সঙ্গে দেখা হবার সময় মোটর গাড়ীটা যদি বিপরীত অভিমুখে চলতে থাকত তাহলে একঘণ্টা বাদে আপনার সঙ্গে মোটর গাড়ীর দূরত্ব হোত চুয়াল্লিশ মাইল। কিন্তু মোটর গাড়ীটা যদি আলোকের বেগে যেত তাহলে গাড়ীটার সঙ্গে আপনার দেখা হওয়া কিংবা গাড়ীটা আপনাকে ছাড়িয়ে যাওয়াতে কোনো পার্থক্যই হোত না। দুটি ক্ষেত্রেই এক সেকেণ্ড বাদে আপনার সঙ্গে তার দূরত্ব হোত ১৮৬,০০০ মাইল। আগের সেকেণ্ডে যদি অন্য কোনো কম দ্রুতগামী গাড়ীর সঙ্গে আপনার দেখা হোত কিংবা সে গাড়ী যদি আপনাকে ছাড়িয়ে যেত তাহলে সে গাড়ীর সঙ্গেও ঐ আলোকের দূরত্ব হোত ১৮৬,০০০ মাইল। ব্যাপারটা অসম্ভব মনে হয় : গাড়ীটা কি করে রাস্তার উপরে বিভিন্ন বিন্দু থেকে একই দূরত্বে থাকতে পারে ?

আর একটি দৃষ্টান্ত বিচার করা যাক। একটা মাছি স্থির একটা জলাশয় স্পর্শ করলে ছোট ছোট ঢেউ সৃষ্টি করে। ঢেউগুলি ক্রমপ্রসারমান বৃত্তে

বহির্মুখে যেতে থাকে। যে কোনো মুহূর্তেই বৃত্তের কেন্দ্র হবে সেই বিন্দুটি— যে বিন্দুতে মাছি জলাশয় স্পর্শ করেছিল। মাছিটা যদি জলাশয়ের উপর চলতে থাকে তাহলে সে আর ঢেউয়ের কেন্দ্রে থাকে না। কিন্তু ঢেউগুলি যদি আলোকতরঙ্গ হোত আর মাছিটি যদি কুশলী পদার্থবিদ্যাবিদ হোত তাহলে দেখতে পেত সে যতই চলাচল করুক না কেন তার অবস্থান তরঙ্গের কেন্দ্রে। এই সময় জলাশয়ের পাশে উপবিষ্ট একজন কুশলী পদার্থ—বিদ্যাবিদ ভাবতেন সাধারণ তরঙ্গের ক্ষেত্রের মত কেন্দ্র এখানে মাছি নয়: জলাশয়ের যে বিন্দু মাছিটা স্পর্শ করেছিল সেটাই কেন্দ্র। আবার অন্য একটি মাছি যদি একই মুহূর্তে একই বিন্দুতে জল স্পর্শ করত তাহলে সেও দেখত প্রথম মাছিটা থেকে বহুদূরে সরে গেলেও সে তরঙ্গের কেন্দ্রেই অবস্থান করছে। মিচেলসন মর্লি পরীক্ষার সঙ্গে ব্যাপারটার পূর্ণ সাদৃশ্য রয়েছে। জলাশয় ইথারের অনুরূপ, মাছিটি পৃথিবীর অনুরূপ, মাছি এবং জলাশয়ের সংযোগ, মিচেলসন এবং মর্লি মহাশয়েরা যে আলোক সংকেত পাঠিয়েছিলেন তার অনুরূপ এবং ঢেউগুলি অনুরূপ আলোক তরঙ্গের।

প্রথম দৃষ্টিতে মনে হয় এরকম ব্যাপার সম্পূর্ণ অসম্ভব। আশ্চর্য হবার কিছু নেই যে: মিচেলসন মর্লি পরীক্ষা যদিও ১৮৮১ সালে হয়েছিল তবুও সে পরীক্ষার নির্ভুল ব্যাখ্যা ১৯০৫ সালের আগে হয়নি। দেখা যাক আমরা ঠিক কি বলছি। পদচারী আর মোটরগাড়ীর দৃষ্টান্তটা বিচার করুন। অনুমান করা যাক রাস্তার একই বিন্দুতে কয়েকজন রয়েছে, কেউ হাঁটছে, কেউ চলেছে মোটর গাড়ীতে। অনুমান করা যাক তাদের বেগের হারও বিভিন্ন, তাদের কেউ চলেছে একদিকে, কেউ চলেছে অন্যদিকে। আমি বলছি: এই মুহূর্তে যদি ওরা সবাই যেখানে আছে সেখান থেকে একটা আলোর ঝলক পাঠানো যায় তাহলে ভ্রাম্যমান প্রত্যেকের ঘড়ি অনুসারেই এক সেকেন্ড পরে আলোক তরঙ্গগুলি প্রত্যেকের কাছ থেকে ১৮৬,০০০ মাইল দূরে থাকবে। অথচ ভ্রাম্যমান সবাই কিন্তু আর এক বিন্দুতে থাকবে না। আপনার ঘড়িতে এক সেকেন্ড হবার পর আলোক তরঙ্গগুলি আপনার কাছ থেকে ১৮৬,০০০ মাইল দূরবর্তী হবে আবার আলোক তরঙ্গ প্রেরণ করার সময় যাদের সঙ্গে আপনার দেখা হয়েছিল তাদের ঘড়িতে এক সেকেন্ড কাল অতিক্রান্ত হবার পর ঐ তরঙ্গগুলি তাদের কাছ থেকেও ১৮৬,০০০ মাইল দূরবর্তী হবে। এমন কি, তাদের গতি বিপরীত মুখী হলেও। অবশ্য দুটো

ঘড়িই নির্ভুল এ অনুমান করলে। এরকম ব্যাপার কি করে হতে পারে?

এরকম তথ্য ব্যাখ্যা করার উপায় একটিই। সে উপায় হল, ঘড়ির চলন গতি দ্বারা প্রভাবিত হয়: এই অনুমান করা। আমার কথার অর্থ এই নয় যে প্রভাবিত হয় এমনভাবে, যা ঘড়ির আরো নির্ভুল গঠনের সাহায্যে শোধরানো সম্ভব। আমার বক্তব্য আরো মূলগত। আমার বক্তব্য: আপনি যদি বলেন দুটি ঘটনার মধ্যে একঘণ্টা অতিক্রান্ত হয়েছে এবং আপনার এই সজোর বক্তব্যের ভিত্তি যদি হয় আদর্শ নির্ভুল ঘড়ির সাহায্যে আদর্শ সযত্ন মাপন তাহলেও আপনি সাপেক্ষ দ্রুত চলমান একই রকম নির্ভুল অন্য এক ব্যক্তি বলতে পারেন ঐ কাল একঘণ্টার কম কিংবা বেশী ছিল। যেমন একটি ঘড়িতে যদি নিউইয়র্কের সময় দেখা যায় এবং আর একটি যদি গ্রীনউইচের সময় দেখায় তাহলে আপনি একটিকে ভুল এবং অন্যটিকে শুদ্ধ বলতে পারেন না, ঠিক তেমনি এক্ষেত্রেও পারেন না একজনকে ভুল এবং অপরকে শুদ্ধ বলতে। কি করে এটা হয় সে ব্যাখ্যা আমি পরের অধ্যায়ে করব।

আলোকের গতিবেগ সম্পর্কিত আরো অনেক অদ্ভুত ব্যাপার রয়েছে। একটি: যত বিশাল বল যত বেশীক্ষণ ধরে ক্রিয়া করুক না কেন, কোনো জড়পিণ্ড (material body) কখনোই আলোকের মত দ্রুত চলতে পারে না। একটা দৃষ্টান্ত হয়তো এ তথ্য স্পষ্ট করতে সাহায্য করবে। প্রদর্শনীতে অনেক সময় চক্রাকারে ঘূর্ণায়মান চলমান মঞ্চের শ্রেণী দেখা যায়। বাইরেরটা চলে ঘণ্টায় চার মাইল, তার পরেরটা ঘণ্টায় চার মাইল বেশী, পরপর এই রকম। একটা মঞ্চ থেকে আপনি পরের মঞ্চে যেতে পারেন —শেষ পর্যন্ত দেখবেন আপনি বিরাট গতিতে চলেছেন। এখন, আপনি ভাবতে পারেন প্রথম মঞ্চটি যদি ঘণ্টায় চার মাইল চলে এবং দ্বিতীয়টি যদি প্রথমটির তুলনায় ঘণ্টায় চার মাইল বেশী চলে তাহলে নীচের জমি সাপেক্ষ দ্বিতীয় মঞ্চটি চলেছে ঘণ্টায় আট মাইল: এটা কিন্তু ভুল। দ্বিতীয়টি চলে একটু কম। যদিও এত কম যে সর্বাপেক্ষা সযত্ন মাপনেও এ পার্থক্য ধরা পড়বে না। আমার বক্তব্য আমি বেশ স্পষ্ট করে বলতে চাই। অনুমান করা যাক সকাল বেলা যন্ত্রটি চলতে শুরু করার ঠিক আগে আপনি জমির উপরে একটা সাদা রেখা আঁকলেন এবং প্রথম দুটি মঞ্চের প্রতিটিতে এ দাগের মুখোমুখি (opposite) সাদা রেখা আঁকলেন।

এরপর আপনি প্রথম মঞ্চের সাদা দাগের পাশে দাঁড়িয়ে মঞ্চের সঙ্গে চলতে লাগলেন। প্রথম মঞ্চ ভূমি সাপেক্ষ ঘণ্টায় চার মাইল চলে এবং দ্বিতীয় মঞ্চ প্রথম মঞ্চ সাপেক্ষ ঘণ্টায় চার মাইল চলে। ঘণ্টায় চার মাইলের অর্থ মিনিটে ৩৫২ ফুট। আপনার ঘড়ির এক মিনিট বাদে আপনি আপনার পিছনের জমিতে সাদা দাগের মুখোমুখি (opposite) মঞ্চের উপর অবস্থান চিহ্নিত করুন এবং চিহ্নিত করুন আপনার সামনে দ্বিতীয় মঞ্চের সাদা দাগের মুখোমুখি জমির উপরের এবং আপনার মঞ্চের উপরের অবস্থান। তারপর আপনি আপনার মঞ্চের উপর দুদিকে দুটি অবস্থান পর্যন্ত দূরত্ব মাপুন। আপনি দেখবেন প্রতিটি দূরত্বই ৩৫২ ফুট। এই বার আপনি প্রথম মঞ্চ থেকে মাটিতে নেমে আসুন, অন্তিমে জমির উপরে যে সাদা চিহ্ন দিয়ে আপনি শুরু করেছিলেন সেখান থেকে আরম্ভ করে এক মিনিট ভ্রমণের পর দ্বিতীয় মঞ্চের সাদা দাগের মুখোমুখি যে অবস্থান চিহ্নিত করেছিলেন সেই অবধি মাপুন। সমস্যা : তাদের দূরত্ব কত? আপনি বলবেন ৩৫২ ফুটের দ্বিগুণ অর্থাৎ ৭০৪ ফুট। আসলে মাপটা কিন্তু একটু কম হবে। কমের পরিমাণ এত ক্ষুদ্র যে বোঝাই যায় না। গরমিলের কারণ : অপেক্ষবাদ অনুসারে চিরায়ত (traditional) নিয়মে একাধিক বেগ যোগ করা যায় না। আপনার যদি এইরকম চলমান মঞ্চের দীর্ঘমালা (series) থাকত, প্রতিটি মঞ্চই যদি আগের মঞ্চটির চাইতে ঘণ্টায় চার মাইল বেশী বেগে চলত তবুও এমন কোনো বিন্দুতে আপনি পৌঁছতে পারতেন না যে বিন্দু ভূমি সাপেক্ষ আলোকের বেগে চলমান। আপনার যদি বহু মিলিয়ন মঞ্চ থাকত তাহলেও না। ক্ষুদ্র গতিবেগের ক্ষেত্রে যে গরমিল অতি ক্ষুদ্র, গতিবেগ বৃদ্ধির সঙ্গে সে গরমিল বৃহত্তর হয়। ফলে আলোর গতিবেগ একটি অপ্রাপ্য সীমা হয়ে দাঁড়ায়। এটা কি করে হয় পরের আলোচ্য বিষয় সেটাই। এখন আমাদের সেই আলোচনাই করতে হবে।

চতুর্থ অধ্যায়

ঘড়ি আর ফুট রুল (Foot Rule)

দুটি ভিন্ন স্থানে দুটি ঘটনা একই কালে ঘটেছে : এ বিবৃতিতে অনিশ্চিত কিছু থাকতে পারে, বিশিষ্ট অপেক্ষবাদের আবির্ভাবের আগে একথা কেউ ভাবেননি। স্থান দুটি যদি পরস্পর সাপেক্ষ বহুদূরস্থিত হয় তাহলে ঘটনা দুটি সত্যিই যুগপৎ কিনা সে তথ্য নির্ধারণে অসুবিধা থাকতে পারে : এ কথা মেনে নেয়া যায়। কিন্তু সবাই ভেবেছে এ প্রশ্নের অর্থ সম্পূর্ণ নির্দিষ্ট নিশ্চিত। কিন্তু দেখা গেল এ ধারণাও ছিল ভুল। ত্রুটিশূন্যতা নিশ্চিত করার জন্য যে পর্যবেক্ষকটি সবরকম সতর্কতা অবলম্বন করেছেন (বিশেষ করে আলোকের বেগ বিচার করেছেন) তাঁর কাছে দুটি ঘটনা যুগপৎ মনে হতে পারে, আবার একই রকম সতর্ক অন্য একজন পর্যবেক্ষকের বিচারে মনে হতে পারে প্রথম ঘটনা ঘটেছে দ্বিতীয়টির আগে এবং তৃতীয় আর এক পর্যবেক্ষকের বিচারে মনে হতে পারে দ্বিতীয়টি ঘটেছে প্রথমটির আগে। তিন পর্যবেক্ষকই যদি পরস্পর সাপেক্ষ দ্রুত চলমান হন তাহলে এরকম হতে পারে। একজন নির্ভুল এবং অন্য দুজন ভুল করেছেন—ব্যাপারটা এরকম নয়। তারা প্রত্যেকে একই রকম নির্ভুল। ঘটনার কালবিন্যাস (time order) আংশিক পর্যবেক্ষক নির্ভর এবং সব সময় ঘটনাগুলির সঙ্গে স্বতঃত সম্পূর্ণ অঙ্গাঙ্গী সম্পর্কযুক্ত নয়। অপেক্ষবাদ দেখিয়েছে : এ দৃষ্টিভঙ্গি শুধু পরিঘটনা ব্যাখ্যা করে তাই নয়—এই দৃষ্টিভঙ্গির হওয়া উচিত ছিল প্রাচীন উপাত্তের ভিত্তিতে সতর্ক যুক্তি প্রয়োগের ফলশ্রুতি। আসলে কিন্তু যতদিন পর্যন্ত বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় বিষম (odd) ফলগুলি মানুষের যুক্তিকে সজোরে ধাক্কা না দিয়েছে ততদিন পর্যন্ত কেউ অপেক্ষবাদের যৌক্তিক ভিত্তি লক্ষ্য করেনি।

ভিন্নস্থানের দুটি ঘটনা যুগপৎ কিনা সে সম্পর্কে আমরা স্বাভাবিকভাবে কি করে সিদ্ধান্ত নেব? স্বভাবতই লোকে বলবে : নির্ভুলভাবে মধ্যবর্তী কোনো ব্যক্তি যদি ঘটনা দুটি যুগপৎ দেখতে পায়—তাহলে সে দুটি ঘটনা যুগপৎ, (একই স্থানে দুটি ঘটনার যৌগপত্তায় কোনো অসুবিধা নেই, উদাহরণ : আলো দেখা এবং শব্দ শোনা)। ধরুন দুটি ভিন্ন স্থানে বিদ্যুৎ

চমকেছে। অনুমান করুন গ্রীনউইচ মানমন্দির এবং কিউ মানমন্দির (Greenwich Observatory & Kew Observatory)। অনুমান করা যাক সেণ্ট পল্স্—দুটো মানমন্দিরের মধ্যবর্তী এবং সেণ্ট পল্সের গম্বুজের উপরের একজন পর্যবেক্ষকের কাছে দুটো চমকই যুগপৎ মনে হয়েছে। সে ক্ষেত্রে কিউয়ের লোক কিউয়ের বিদ্যুৎ চমক প্রথমে দেখবে আর গ্রীনউইচের লোক প্রথম দেখবে গ্রীনউইচের বিদ্যুৎ চমক। এর কারণ অন্তর্বর্তী দূরত্ব অতিক্রম করার জন্য প্রয়োজনীয় কাল। আদর্শ নির্ভুল পর্যবেক্ষক হলে তিনজনই বিচার করবেন বিদ্যুৎ চমক দুটি ছিল যুগপৎ। কারণ আলোক প্রেরণের জন্য প্রয়োজনীয় সময়কে তাঁরা স্বীকৃতি দেবেন। (নির্ভুলতার এমন মান আমি অনুমান করছি যা মানুষের পক্ষে অসম্ভব)। সুতরাং যতক্ষণ পর্যন্ত ভূ-পৃষ্ঠের ঘটনা নিয়ে আমরা বিচার করছি ততক্ষণ পর্যন্ত পৃথিবীর পর্যবেক্ষক সাপেক্ষ যুগপত্তার সংজ্ঞা যথেষ্ট কার্যকর হবে। এ সংজ্ঞার প্রদত্ত ফল পরস্পরের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ এবং যে সমস্ত ক্ষেত্রে আমরা পৃথিবীর গতিকে অগ্রাহ্য করতে পারি সে সমস্ত ক্ষেত্রে পার্থিব পদার্থবিদ্যার সমস্ত সমস্যাতেই এ সংজ্ঞা ব্যবহার সম্ভব।

কিন্তু যেখানে দুইদল পর্যবেক্ষক পরস্পর সাপেক্ষ দ্রুত চলমান সেখানে এ সংজ্ঞা অতটা সন্তোষজনক নয়। অনুমান করা যাক আলোকের স্থলে শব্দকে প্রতিস্থাপন করলে কি হয় আমরা তাই দেখছি এবং দুটি ঘটনার মধ্যবর্তী কেউ যখন যুগপৎ শুনতে পাচ্ছে তখন আমরা ঘটনা দুটিকে যুগপৎ বলে সংজ্ঞিত করছি। নীতিগতভাবে এতে কোনো পরিবর্তন হয় না কিন্তু শব্দের গতিবেগ তুলনায় অনেক কম হওয়াতে ব্যাপারটা অনেক সহজ হয়ে যায়। অনুমান করা যাক এক কুয়াশাচ্ছন্ন রাত্রিতে দুজন ডাকাত ট্রেনের গার্ড আর ড্রাইভারকে গুলি করেছে। গার্ড রয়েছে গাড়ীর পিছনে, ডাকাতরা লাইনের উপরে এবং তারা নিহতদের গুলি করেছে খুব কাছ থেকে। গাড়ীর ঠিক মাঝখানের একজন যাত্রী দুটি গুলির শব্দই যুগপৎ শুনতে পেল। সুতরাং আপনি হয়ত বলবেন দুটি গুলিই ছিল যুগপৎ। কিন্তু একজন স্টেশন মাষ্টার ছিলেন দুটো ডাকাতেরই ঠিক মাঝখানে। তিনি প্রথমে শুনতে পেলেন যে গুলিতে গার্ড মরেছে সেই গুলির আওয়াজ। গার্ড এবং ড্রাইভারের (এরা দুজন মাসতুত ভাই) কোটিপতি এক অষ্ট্রেলিয়ান মাসী (aunt) তাঁর সমস্ত সম্পত্তি দিয়ে গিয়েছেন গার্ডকে। কিন্তু গার্ড

যদি আগে মারা যায় তাহলে সম্পত্তি পাবে ড্রাইভার। কে আগে মারা গিয়েছে সে প্রশ্নের সঙ্গে বিরাট সম্পত্তি জড়িত। মামলা উঠেছে লর্ডসভায়। দু'পক্ষের উকিলরাই অক্সফোর্ডে শিক্ষা নিয়েছেন এবং তাঁরা এ বিষয়ে এক মত যে, হয় যাত্রীটি ভুল করেছে নয়তো ভুল করেছে সেই স্টেশন মাষ্টার। আসলে দুজনেই কিন্তু একদম সঠিক হতে পারে। গাড়ীটা চলেছে গার্ডের প্রতি গুলি থেকে দূরে এবং ড্রাইভারের প্রতি গুলির অভিমুখে সুতরাং যাত্রীর কাছে পৌঁছতে ড্রাইভারের অভিমুখে নিক্ষিপ্ত গুলির শব্দের তুলনায় গার্ডের অভিমুখে নিক্ষিপ্ত গুলির শব্দের বেশী সময় লাগবে। সুতরাং যাত্রীটি যখন বলছে সে শব্দ দুটি যুগপৎ শুনেছে, তখন সে ঠিকই বলছে। ষ্টেশন মাষ্টার যখন বলছে সে গার্ডের অভিমুখে নিক্ষিপ্ত গুলির শব্দ আগে শুনেছে তখন সে নিশ্চয়ই ঠিক কথা বলছে।

এরকম ক্ষেত্রে আমরা পৃথিবীবাসীরা একজন ট্রেনযাত্রীর দৃষ্টিভঙ্গির তুলনায় পৃথিবীতে স্থিতিশীল ব্যক্তির যুগপত্তা সম্পর্কীয় দৃষ্টিভঙ্গি বেশী পছন্দ করব। কিন্তু তাত্ত্বিক পদার্থবিদ্যায় এরকম সঙ্কীর্ণ সীমাবদ্ধ সংস্কার অনুমোদনীয় নয়। যুগপত্তা সম্পর্কীয় দৃষ্টিভঙ্গি বিষয়ে একজন পৃথিবী-বাসী পদার্থবিদদের যতটা অধিকার, ধূমকেতুবাসী একজন পদার্থবিদ্যাবিদের অধিকারও ততটাই : অবশ্য ধূমকেতুতে যদি কোনো পদার্থবিদ্যাবিদ থাকেন। তবে আমাদের গুলি এবং ট্রেনের দৃষ্টান্তের ক্ষেত্রে যেমন হয়েছিল এক্ষেত্রেও তেমনি ফলের পার্থক্য হবে। গতির ব্যাপারে পৃথিবীর তুলনায় ট্রেন এমন কিছু বেশী 'বাস্তব' (real) নয়—এ ব্যাপারে কোনো 'বিশেষ বাস্তবিকতা'-ই নেই। আপনি কল্পনা করতে পারেন : একটি খরগোশ আর একটি জল-হস্তী তর্ক করছে মানুষ 'বাস্তবিকই' (realy) বৃহৎ জন্তু কিনা। প্রত্যেকেই ভাববে তার নিজের দৃষ্টিভঙ্গিটাই স্বাভাবিক আর অন্যেরটা শুদ্ধ কল্পনা-বিলাস মাত্র। পৃথিবী আর ট্রেনের ভিতরে কোনটা 'বাস্তবিকই' গতিশীল —এ তর্কের ভিতরেও সারবস্তু (substance) একইরকম অল্প। সুতরাং দূরে সংঘটিত একাধিক ঘটনার যুগপত্তার সংজ্ঞা নির্ণয়ের সময় মধ্যবর্তী বিন্দু নির্ণয়ের জন্য বিভিন্ন বস্তুপিণ্ডের ভিতর থেকে একটিকে বেছে নেয়া কিংবা নির্বাচন করার কোনো অধিকার আমাদের নেই। সমস্ত বস্তুপিণ্ডেরই নির্বাচিত হবার অধিকার সমান। কিন্তু সংজ্ঞা অনুসারে যদি একটি বস্তুপিণ্ড সাপেক্ষ দুটি ঘটনা যুগপৎ হয় তাহলে অন্য

বস্তুপিণ্ড থাকবে যেগুলি সাপেক্ষ প্রথম ঘটনা দ্বিতীয়টির পূর্বগামীএবং আরও অন্য বস্তুপিণ্ড থাকবে যেগুলি সাপেক্ষ দ্বিতীয়টি প্রথমটির পূর্বগামী। সুতরাং দূরের দুটি ঘটনা যুগপৎ একথা আমরা নিশ্চিতভাবে বলতে পারিনা। এরকম বিবৃতির নির্দিষ্ট নিশ্চিত অর্থ শুধুমাত্র হতে পারে নির্দিষ্ট নিশ্চিত পর্যবেক্ষক সাপেক্ষ। এ বিবৃতি আমাদের ভৌত পরিঘটনা পর্যবেক্ষণের ব্যক্তিনিষ্ঠ অংশ—বস্তুনিষ্ঠ অংশ নয়। এই বস্তুনিষ্ঠ অংশই ভৌত বিধির উপাদান।

বিভিন্ন স্থানের কাল বিষয়ক এই প্রশ্নই বোধহয় কল্পনের ক্ষেত্রে অপেক্ষবাদের সবচাইতে কঠিন দিক। সবকিছুরই একটা তারিখ থাকতে পারে : এ ধারণায় আমরা অভ্যস্ত। ৭৭৬ খৃষ্ট পূর্ব অব্দের ২৭শে আগষ্টে চীনে একটি সূর্যগ্রহণ দেখা গিয়েছিল : এ তথ্য ইতিহাসবেত্তারা ব্যবহার করেন। উত্তর চীনের একটি নির্দিষ্ট স্থানে সূর্যগ্রহণ কখন পূর্ণগ্রাসে পরিণত হতে শুরু করেছিল সে তথ্য জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা ঘণ্টা মিনিট মেপে নির্ভুলভাবে বলতে পারতেন এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। এ তথ্যও স্পষ্ট প্রতীয়মান যে আমরা নির্দিষ্ট মুহূর্তে গ্রহগুলির অবস্থান বলে দিতে পারি। নিউটনীয় তত্ত্বের সাহায্যে আমরা গ্রীনউইচ ঘড়ি অনুসারে নির্দিষ্টকালে পৃথিবী আর (ধরা যাক) বৃহস্পতির দূরত্ব গণনা করতে পারি তার ফলে আমরা জানতে পারি আলোকের বৃহস্পতি থেকে পৃথিবীতে পৌঁছতে কত সময় লাগে। ধরুণ আধঘণ্টা লাগে। তাহলে আমরা সিদ্ধান্ত করতে পারি : এখন আমরা বৃহস্পতিকে যেখানে দেখছি আধঘণ্টা আগে বৃহস্পতি সেখানে ছিল : এ সমস্তই স্পষ্ট বোঝা যায়। কিন্তু আসলে প্রয়োগক্ষেত্রে এটা কার্যকর কারণ আলোকের গতিবেগের তুলনায় গ্রহগুলির গতিবেগ অত্যন্ত অল্প। আপনার বিচারে যখন বৃহস্পতি গ্রহের একটি ঘটনা এবং পৃথিবীর একটি ঘটনা যুগপৎ ঘটেছে—উদাহরণ : গ্রীণউইচ সময়ের মধ্যরাত্রি বারোটায় বৃহস্পতির

ফুটনোট ঃ একটি সমকালীন চীনাগাঁথায় গ্রহণের সাল তারিখ নির্ভুলভাবে উল্লেখ করে লেখা হয়েছে ঃ

চাঁদের গ্রহণ,
একটা সাধারণ ব্যাপার,
সূর্যও এখন রাহুগ্রস্ত,
কী যে মন্দ ঘটনা !

একটি চাঁদে গ্রহণ হল—পৃথিবী সাপেক্ষ দ্রুত চলমান কোনো ব্যক্তির বিচারে তখন ব্যাপারটা অন্যরকম হবে। যদি অনুমান করা যায় দুজনেই আলোকের গতিবেগকে সঠিকভাবে হিসাবের ভিতরে নিয়েছেন তা সত্ত্বেও এ পার্থক্য থাকবে। স্বভাবতই যুগপত্তা সম্পর্কীয় মতানৈক্য সময়ের পর্যায়কাল (periods of time) সম্পর্কীয় মতানৈক্যের সঙ্গে যুক্ত। আমাদের বিচারে যদি মনে হয় বৃহস্পতি গ্রহের দুটি ঘটনার অন্তর্বর্তীকাল চব্বিশঘণ্টা, বৃহস্পতি এবং পৃথিবী সাপেক্ষ দ্রুতগামী আর একজনের বিচারে মনে হতে পারে অন্তর্বর্তীকাল দীর্ঘতর।

সুতরাং যে সর্বগত ব্রহ্মাণ্ডীয় কালকে (Universal Cosmic Time) মেনে নেওয়া হোত সে কাল আর গ্রহণীয় নয়। প্রতিটি বস্তুপিণ্ড সাপেক্ষ সান্নিধ্যের ঘটনাবলী সম্পর্কে নির্দিষ্ট নিশ্চিত কালবিন্যাস রয়েছে। এর নাম দেওয়া যেতে পারে সেই বস্তুপিণ্ডের "বিশিষ্ট" কাল (proper time)। আমাদের নিজদেহের 'বিশিষ্ট' (proper) কাল আমাদের নিজস্ব অভিজ্ঞতার নিয়ামক, যেহেতু আমরা পৃথিবীর উপরে প্রায় স্থিরভাবে অবস্থান করি সেই-জন্য বিভিন্ন মানুষের বিশিষ্ট কালের ভিতরে ঐক্য রয়েছে এবং সেগুলিকে একসঙ্গে বলা যেতে পারে পার্থিব কাল (Terrestrial time)। কিন্তু এ কাল শুধুমাত্র পৃথিবীর 'বৃহৎ' (large) বস্তুপিণ্ডগুলির উপযুক্ত। ল্যাবরেটরীর ইলেক্ট্রনের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ অন্য কাল প্রয়োজন। যেহেতু আমরা নিজস্ব কাল ব্যবহারের জন্য জিদ করি সেই জন্যই আমাদের মনে হয় দ্রুত-গতির সঙ্গে সঙ্গে এদের ভর বৃদ্ধি পায়, তাদের দৃষ্টিতে তাদের ভর অপরিবর্তিত থাকে বরং আমরাই হঠাৎ রোগা কিংবা মোটা হয়ে যাই। একজন পদার্থবিদ্যাবিদের ইতিহাস যদি একটি ইলেক্ট্রন পর্যবেক্ষণ করে তাহলে সে গ্যালিভারের ভ্রমণকাহিনীর সঙ্গে সাদৃশ্য দেখতে পারে।

এখন প্রশ্ন : ঘড়ি আসলে কি মাপে? অপেক্ষবাদে যখন আমরা ঘড়ির কথা বলি তখন আমরা শুধুমাত্র মানুষের তৈরী ঘড়ির কথাই বলি না —যা কিছু নিয়মিত পর্যাবৃত্ত ক্রিয়া (regular periodic performance) করে তাকেই আমরা ঘড়ি বলি। পৃথিবী তেইশ ঘণ্টা ছাপান্ন মিনিটে একবার আবর্তিত হয় সুতরাং পৃথিবী একটি ঘড়ি। পরমাণুও ঘড়ি কারণ পরমাণু থেকে অত্যন্ত নির্দিষ্ট নিশ্চিত স্পন্দাংক (frequency) সম্পন্ন আলোক তরঙ্গ বিচ্ছুরিত হয়। পরমাণুর বর্ণালীতে এই আলোক

বস্তুপিণ্ড থাকবে যেগুলি সাপেক্ষ প্রথম ঘটনা দ্বিতীয়টির পূর্বগামীএবং আরও অন্য বস্তুপিণ্ড থাকবে যেগুলি সাপেক্ষ দ্বিতীয়টি প্রথমটির পূর্বগামী। সুতরাং দূরের দুটি ঘটনা যুগপৎ একথা আমরা নিশ্চিতভাবে বলতে পারিনা। এরকম বিবৃতির নির্দিষ্ট নিশ্চিত অর্থ শুধুমাত্র হতে পারে নির্দিষ্ট নিশ্চিত পর্যবেক্ষক সাপেক্ষ। এ বিবৃতি আমাদের ভৌত পরিঘটনা পর্যবেক্ষণের ব্যক্তিনিষ্ঠ অংশ—বস্তুনিষ্ঠ অংশ নয়। এই বস্তুনিষ্ঠ অংশই ভৌত বিধির উপাদান।

বিভিন্ন স্থানের কাল বিষয়ক এই প্রশ্নই বোধহয় কল্পনের ক্ষেত্রে অপেক্ষবাদের সবচাইতে কঠিন দিক। সবকিছুরই একটা তারিখ থাকতে পারে : এ ধারণায় আমরা অভ্যস্ত। ৭৭৬ খৃষ্ট পূর্ব অব্দের ২৭শে আগষ্টে চীনে একটি সূর্যগ্রহণ দেখা গিয়েছিল : এ তথ্য ইতিহাসবেত্তারা ব্যবহার করেন। উত্তর চীনের একটি নির্দিষ্ট স্থানে সূর্যগ্রহণ কখন পূর্ণগ্রাসে পরিণত হতে শুরু করেছিল সে তথ্য জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা ঘণ্টা মিনিট মেপে নির্ভুলভাবে বলতে পারতেন এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। এ তথ্যও স্পষ্ট প্রতীয়মান যে আমরা নির্দিষ্ট মুহূর্তে গ্রহগুলির অবস্থান বলে দিতে পারি। নিউটনীয় তত্ত্বের সাহায্যে আমরা গ্রীনউইচ ঘড়ি অনুসারে নির্দিষ্টকালে পৃথিবী আর (ধরা যাক) বৃহস্পতির দূরত্ব গণনা করতে পারি তার ফলে আমরা জানতে পারি আলোকের বৃহস্পতি থেকে পৃথিবীতে পৌঁছতে কত সময় লাগে। ধরুণ আধঘণ্টা লাগে। তাহলে আমরা সিদ্ধান্ত করতে পারি : এখন আমরা বৃহস্পতিকে যেখানে দেখছি আধঘণ্টা আগে বৃহস্পতি সেখানে ছিল : এ সমস্তই স্পষ্ট বোঝা যায়। কিন্তু আসলে প্রয়োগক্ষেত্রে এটা কার্যকর কারণ আলোকের গতিবেগের তুলনায় গ্রহগুলির গতিবেগ অত্যন্ত অল্প। আপনার বিচারে যখন বৃহস্পতি গ্রহের একটি ঘটনা এবং পৃথিবীর একটি ঘটনা যুগপৎ ঘটেছে—উদাহরণ : গ্রীণউইচ সময়ের মধ্যরাত্রি বারোটায় বৃহস্পতির

ফুটনোট ঃ একটি সমকালীন চীনাগাঁথায় গ্রহণের সাল তারিখ নির্ভুলভাবে উল্লেখ করে লেখা হয়েছে ঃ

চাঁদের গ্রহণ,
একটা সাধারণ ব্যাপার,
সূর্যও এখন রাহুগ্রস্ত,
কী যে মন্দ ঘটনা!

একটি চাঁদে গ্রহণ হল—পৃথিবী সাপেক্ষ দ্রুত চলমান কোনো ব্যক্তির বিচারে তখন ব্যাপারটা অন্যরকম হবে। যদি অনুমান করা যায় দুজনেই আলোকের গতিবেগকে সঠিকভাবে হিসাবের ভিতরে নিয়েছেন তা সত্ত্বেও এ পার্থক্য থাকবে। স্বভাবতই যুগপত্তা সম্পর্কীয় মতানৈক্য সময়ের পর্যায়কাল (periods of time) সম্পর্কীয় মতানৈক্যের সঙ্গে যুক্ত। আমাদের বিচারে যদি মনে হয় বৃহস্পতি গ্রহের দুটি ঘটনার অন্তর্বর্তীকাল চব্বিশঘণ্টা, বৃহস্পতি এবং পৃথিবী সাপেক্ষ দ্রুতগামী আর একজনের বিচারে মনে হতে পারে অন্তর্বর্তীকাল দীর্ঘতর।

সুতরাং যে সর্বগত ব্রহ্মাণ্ডীয় কালকে (Universal Cosmic Time) মেনে নেওয়া হোত সে কাল আর গ্রহণীয় নয়। প্রতিটি বস্তুপিণ্ড সাপেক্ষ সান্নিধ্যের ঘটনাবলী সম্পর্কে নির্দিষ্ট নিশ্চিত কালবিন্যাস রয়েছে। এর নাম দেওয়া যেতে পারে সেই বস্তুপিণ্ডের "বিশিষ্ট" কাল (proper time)। আমাদের নিজদেহের 'বিশিষ্ট' (proper) কাল আমাদের নিজস্ব অভিজ্ঞতার নিয়ামক, যেহেতু আমরা পৃথিবীর উপরে প্রায় স্থিরভাবে অবস্থান করি সেই-জন্য বিভিন্ন মানুষের বিশিষ্ট কালের ভিতরে ঐক্য রয়েছে এবং সেগুলিকে একসঙ্গে বলা যেতে পারে পার্থিব কাল (Terrestrial time)। কিন্তু এ কাল শুধুমাত্র পৃথিবীর 'বৃহৎ' (large) বস্তুপিণ্ডগুলির উপযুক্ত। ল্যাবরেটরীর ইলেক্ট্রনের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ অন্য কাল প্রয়োজন। যেহেতু আমরা নিজস্ব কাল ব্যবহারের জন্য জিদ করি সেই জন্যই আমাদের মনে হয় দ্রুত-গতির সঙ্গে সঙ্গে এদের ভর বৃদ্ধি পায়, তাদের দৃষ্টিতে তাদের ভর অপরিবর্তিত থাকে বরং আমরাই হঠাৎ রোগা কিংবা মোটা হয়ে যাই। একজন পদার্থবিদ্যাবিদের ইতিহাস যদি একটি ইলেক্ট্রন পর্যবেক্ষণ করে তাহলে সে গ্যালিভারের ভ্রমণকাহিনীর সঙ্গে সাদৃশ্য দেখতে পারে।

এখন প্রশ্ন : ঘড়ি আসলে কি মাপে? অপেক্ষবাদে যখন আমরা ঘড়ির কথা বলি তখন আমরা শুধুমাত্র মানুষের তৈরী ঘড়ির কথাই বলি না —যা কিছু নিয়মিত পর্যাবৃত্ত ক্রিয়া (regular periodic performance) করে তাকেই আমরা ঘড়ি বলি। পৃথিবী তেইশ ঘণ্টা ছাপান্ন মিনিটে একবার আবর্তিত হয় সুতরাং পৃথিবী একটি ঘড়ি। পরমাণুও ঘড়ি কারণ পরমাণু থেকে অত্যন্ত নির্দিষ্ট নিশ্চিত স্পন্দাংক (frequency) সম্পন্ন আলোক তরঙ্গ বিচ্ছুরিত হয়। পরমাণুর বর্ণালীতে এই আলোক

তরঙ্গ দেখা দেয় উজ্জ্বল রেখা রূপে। বিশ্ব পূর্ণ রয়েছে পর্যাবৃত্ত ঘটনায় (periodic occurences) এবং পরমাণুর মত মূলগত ক্রিয়াবিধিগুলির (fundamental mechanism) অসাধারণ সমরূপত্ব দেখা যায় মহাবিশ্বের বিভিন্ন অংশে। এই পর্যাবৃত্ত ঘটনাগুলির যে কোনো একটিকে কাল মাপনের জন্য ব্যবহার করা সম্ভব। মানুষের তৈরী ঘড়ি পর্যবেক্ষণ করা বিশেষভাবে সুবিধাজনক। এটাই সে ঘড়ির একমাত্র সুবিধা। অন্য অনেক ঘড়ি কিন্তু তার চাইতে নির্ভুল। আজকাল কালের মাপকের ভিত্তি সিসিয়াম পরমাণুর (coesium atom) একটি বিশেষ দোলনের (perticular oscilation) স্পন্দাংক। মাপনের এই ভিত্তি পৃথিবীর আবর্তন নির্ভর ভিত্তির চাইতে অনেক বেশী সুষম (uniform)। কিন্তু প্রশ্ন থেকে যায় : ব্রহ্মাণ্ডীয় কাল যদি পরিত্যাগ করা হয় তাহলে শব্দটির উপর এক্ষুনি আমরা যে ব্যাপক অর্থ আরোপ করলাম সেই অর্থে ঘড়ি আসলে কি মাপে ?

প্রত্যেকটি ঘড়ি তার নিজস্ব 'বিশিষ্ট' (proper) কালের নির্ভুল মাপ প্রদর্শন করে। আমরা এখনি দেখতে পাব এই নির্ভুল মাপ একটি গুরুত্বপূর্ণ ভৌতরাশি (quantity)। কিন্তু একটি ঘড়ি সাপেক্ষ দ্রুত চলমান বস্তুপিণ্ডগুলির সঙ্গে সংযুক্ত ঘটনাবলীর কোনো ভৌত রাশির নির্ভুল মাপন আমরা ঘড়ির সাহায্যে পাইনা। ঐ রকম ঘটনাবলীর সঙ্গে সংযুক্ত ভৌতরাশি আবিষ্কারের একটি উপাত্ত (datum) আমরা ঘড়ির সাহায্যে পাই কিন্তু আর একটি উপাত্ত প্রয়োজন। সে উপাত্ত আহরণ করতে হবে স্থানে (space) দূরত্ব মাপনের সাহায্যে। স্থানে দূরত্ব (distance in space) কালের পর্যাবৃত্তির মত, সাধারণত বস্তুনিষ্ঠ কোনো ভৌত (periods of time) তথ্য নয়, এগুলি আংশিকভাবে পর্যবেক্ষক নির্ভর। ব্যাপারটা কি করে হয় এখন অবশ্যই সে ব্যাখ্যা করতে হবে।

প্রথমত আমাদের ভাবতে হবে দুটো ঘটনার দূরত্ব—দুটো বস্তুপিণ্ডের দূরত্ব নয়। কাল বিষয়ে আমরা যা জেনেছি তা থেকেই এ তথ্য তৎক্ষনাৎ আহরণ করা যায়। দুটি বস্তুপিণ্ড যদি পরস্পর সাপেক্ষ চলমান হয়—আসলে ব্যাপারটা সব সময় এইরকমই হয়—তাহলে তাদের পারস্পরিক দূরত্ব সন্তত (continuous) পরিবর্তনশীল। সুতরাং তাদের দূরত্ব উল্লেখ

করতে হলে একটি বিশেষ কালে দূরত্বই বলতে হয়। আপনি যখন ট্রেনে এডিনবরা চলেছেন তখন এডিনবরা থেকে আপনার দূরত্ব একটি বিশেষ সময়কার দূরত্ব। কিন্তু আগেই আমরা বলেছি এডিনবরার একটি ঘটনা এবং ট্রেনের একটি ঘটনার 'সমকাল' (same time) সম্পর্কে বিভিন্ন পর্যবেক্ষক বিভিন্ন বিচার করবেন। এর ফল : ঠিক যেমন দেখা গিয়েছে কালের মাপন আপেক্ষিক তেমনি দূরত্বের মাপনও আপেক্ষিক। আমরা সাধারণত ভাবি দুটি ঘটনার ভিতরে আলাদা দুরকম অন্তর (interval) আছে : স্থানের অন্তর এবং কালের অন্তর। আপনার লণ্ডন থেকে রওনা হওয়া এবং এডিনবরায় পৌঁছানোর ভিতরে রয়েছে চারশ মাইল আর দশ ঘণ্টা। আমরা আগেই দেখেছি অন্য পর্যবেক্ষকরা সময় বিচার করবেন পৃথকভাবে এবং তাঁরা যে দূরত্বও পৃথকভাবে বিচার করবেন সে তথ্য আরও স্পষ্ট। সূর্যের উপরের একজন পর্যবেক্ষক ট্রেনের গতিকে অত্যন্ত তুচ্ছ মনে করবেন। তাঁর বিচারে আপনার চলার পরিমাণ—পৃথিবীর নিজ কক্ষে ভ্রমণ এবং পৃথিবীর আহ্নিক আবর্তনের পরিমাণের যোগফলের সমান। আবার রেলগাড়ীর একটি মাছি ভাববে আপনি স্থানে কোনো চলাচলই করেননি কিন্তু তাকে আপনি কিছুকালের জন্য আনন্দ দান করেছেন। তবে সে কালটা সে গ্রীণউইচ মানমন্দির দিয়ে মাপবে না, মাপবে তার নিজস্ব 'বিশিষ্ট' কাল দিয়ে। আপনি কিংবা সূর্যবাসী কিংবা মাছি কেউ ভুল করেছে বলা চলবে না। প্রত্যেকেরই চিন্তা একই রকম যুক্তিসঙ্গত। একমাত্র ভুল হল—ব্যক্তিনিষ্ঠ মাপনের উপর বস্তুনিষ্ঠ সত্যতা আরোপ করা। সুতরাং দুটি ঘটনার ভিতরের স্থানিক দূরত্ব স্বতত একটি ভৌত ঘটনা (physical fact) নয়। এর পরে কিন্তু আমরা দেখব ভৌত ঘটনা একটি আছে এবং কালিক দূরত্ব আর স্থানিক দূরত্ব থেকে সে ঘটনা জানা যেতে পারে। একেই বলা হয় স্থানকাল 'অন্তর' (interval)।

ব্রহ্মাণ্ডের (universe) যে কোনো দুটি ঘটনা বিচার করলে তাদের ভিতরে দুটি পৃথক সম্পর্কের সম্ভাবনা দেখা যায়। ভৌতভাবে একটি বস্তুপিণ্ডের পক্ষে এমন গতি সম্ভব হতে পারে যে দুটি ঘটনাস্থলেই তার উপস্থিত হওয়া সম্ভব কিংবা সম্ভব নয়। এটা নির্ভর করে এই তথ্যের উপর : কোনো বস্তুপিণ্ডই আলোর মত দ্রুত চলতে পারে না। উদাহরণ: ধরুণ একটি আলোর ঝলক পৃথিবী থেকে চাঁদে প্রেরিত হয়েছে এবং

প্রতিফলিত হয়ে ফিরে এসেছে। আলোক প্রেরণ এবং প্রতিফলনের প্রত্যাবর্তনের অন্তর্বর্তী কাল হবে প্রায় আড়াই সেকেণ্ড। এই আড়াই সেকেণ্ডের ভিতরে কোনো এক সময় পৃথিবীতে উপস্থিত থাকা এবং আলোকের চাঁদে পেঁছানোর মুহূর্তে চাঁদে উপস্থিত থাকার মত দ্রুতগতি কোনো বস্তুপিণ্ডের পক্ষে সম্ভব নয়। কারণ তা করতে হলে বস্তুপিণ্ডটিকে আলোকের চাইতে দ্রুততর গতিতে যেতে হবে, কিন্তু তাত্ত্বিক দিক থেকে একটি বস্তুপিণ্ডের ঐ আড়াই সেকেণ্ডের আগে কিংবা পরে যে কোনো সময়ে পৃথিবীতে উপস্থিত থাকা সম্ভব এবং সম্ভব আলোর ঝলক পেঁছবার সময় চাঁদে উপস্থিত থাকা। যখন একটি বস্তুপিণ্ডের দুটি ঘটনাস্থলে উপস্থিত থাকার মত চলন ভৌতভাবে সম্ভব নয় তখন আমরা বলি দুটি ঘটনার 'অন্তর' *(interval) স্থানানুরূপ (space like) ; যখন বস্তুপিণ্ডটির দুটি ঘটনাস্থলেই উপস্থিত থাকা ভৌত ভাবে (physically) সম্ভব তখন আমরা বলব দুটি ঘটনার অন্তর কালানুরূপ (time like)। অন্তর যখন 'স্থানানুরূপ' তখন একটি বস্তুপিণ্ডের পক্ষে এমন ভাবে চলা সম্ভব যে তার উপরিস্থিত একজন পর্যবেক্ষকের বিচারে দুটি ঘটনা যুগপৎ হবে। সে ক্ষেত্রে ঐ রকম একজন পর্যবেক্ষকের বিচারে দুটি ঘটনার 'অন্তর' হবে স্থানে দুটি ঘটনার দূরত্ব (distance in space)। অন্তর যখন স্থানানুরূপ একটি বস্তুপিণ্ড তখন দুটি ঘটনা স্থলেই উপস্থিত থাকতে পারে। সে ক্ষেত্রে বস্তুপিণ্ডের উপরিস্থিত একজন পর্যবেক্ষকের বিচারে দুটি ঘটনার অন্তর হবে তাদের অন্তর্বর্তী কাল অর্থাৎ সেটাই দুটি ঘটনার অন্তর্বর্তী বিশিষ্ট কাল। কিন্তু এ দুটির মাঝে একটি সীমক ঘটনা (limiting case) রয়েছে; যখন দুটি ঘটনা একটি আলোক ঝলকের অংশ কিংবা আমরা বলতে পারি যখন একটি ঘটনা অন্যটির দর্শন (seeing of the other)। সে ক্ষেত্রে দুটি ঘটনার অন্তর হবে শূন্য (zero)।

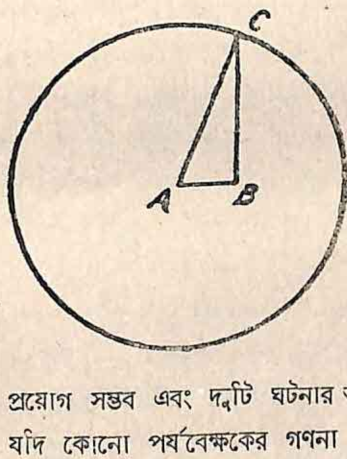
তাহলে ঘটনা রয়েছে তিনটি। (১) একটি আলোক রশ্মির দুটি ঘটনাস্থলেই উপস্থিত থাকা সম্ভব হতে পারে। এ ব্যাপার ঘটে যখন একটি ঘটনা অন্য ঘটনার দর্শন। এক্ষেত্রে দুটি ঘটনার অন্তর শূন্য (zero)। (২) হতে পারে একটি বস্তুপিণ্ড কোনক্রমেই একটি ঘটনাস্থল থেকে অন্য ঘটনাস্থলে যেতে পারে না—কারণ সে ক্ষেত্রে তার চলন আলোকের চাইতে

* ফুটনোট : অন্তর শব্দের সংজ্ঞা আমি এখনি দেব।

দ্রুত হতে হবে। সে ক্ষেত্রে একটি বস্তুপিণ্ডের সব সময়ই এমন ভাবে চলার ভৌত সম্ভাবনা রয়েছে যে সেই বস্তুপিণ্ডের উপরিস্থিত একজন পর্যবেক্ষকের বিচারে দুটি ঘটনা হবে যুগপৎ। পর্যবেক্ষকের বিচারে দুটি ঘটনার স্থানিক দূরত্ব হবে অন্তর (interval)। এই রকম অন্তরের নাম স্থানানুরূপ। (৩) একটি বস্তুপিণ্ডের পক্ষে এমন চলন ভৌত ভাবে সম্ভব হতে পারে যে সে দুটি ঘটনাতেই উপস্থিত থাকবে। সে ক্ষেত্রে ঐরকম বস্তুপিণ্ডের উপরে অবস্থিত একজন পর্যবেক্ষকের বিচারে তাদের অন্তর্বর্তী কাল হবে তাদের অন্তর। এইরকম অন্তরের নাম কালানুরূপ (time like)।

দুটি ঘটনার মধ্যবর্তী অন্তর সেগুলি বিষয়ে ভৌত তথ্য। এ তথ্য পর্যবেক্ষকের বিশেষ পরিবেশের উপর নির্ভরশীল নয়।

অপেক্ষবাদের দুটি অবয়ব (from)—বিশিষ্ট এবং ব্যাপক। পূর্বোক্তটি সাধারণত আসন্নমাত্র (only approximate) কিন্তু মহাকর্ষ সৃষ্টি করে এরকম পদার্থ (gravitating matter) থেকে বহুদূরে থাকলে এ তত্ব প্রায় নির্ভুল হতে পারে। মহাকর্ষ যেখানেই অগ্রাহ্য করা যায় সেখানেই



বিশিষ্ট অপেক্ষবাদ প্রয়োগ সম্ভব এবং দুটি ঘটনার অন্তর্বর্তী স্থানিক দূরত্ব এবং কালিক দূরত্ব যদি কোনো পর্যবেক্ষকের গণনা থেকে আমরা জানতে পারি তাহলে দুটি ঘটনার মধ্যবর্তী অন্তর আমরা গণনা করতে পারি। স্থানিক দূরত্ব যদি আলোক ঐ কালে যতদূর যেতে পারত তার চাইতে বেশী হয় বিচ্ছিন্নতা (separation) তাহলে স্থানানরূপ। তাহলে দুটি ঘটনার অন্তর পাওয়া যায় নিম্নলিখিত গঠন থেকে: একটি রেখা AB অঙ্কন করুন। ঐ কালে আলোক যতদূর গমন করতে পারত রেখার দৈর্ঘ্য হবে ততটা। A-কে

কেন্দ্র করে এবং স্থানে দুটি ঘটনার দূরত্বকে ব্যাসার্দ্ধ করে একটি বৃত্ত অঙ্কন করুন। B-থেকে BC লম্ব আঁকুন। BC-এর সঙ্গে AB-এর লম্ব সম্পর্ক থাকবে লম্বটি C-তে এসে বৃত্তের সঙ্গে মিলিত হোক। তাহলে BC হবে দুটি ঘটনার অন্তরের দৈর্ঘ্য।

দূরত্ব যখন কালানুরূপ তখন একই চিত্র ব্যবহার করুন। কিন্তু তখন কালে আলোক যে দূরত্ব অতিক্রম করত সেটা হোক AC, এবং AB হবে স্থানে দুটি ঘটনার মধ্যবর্তী দূরত্ব। এখন তাদের অন্তর হবে BC দূরত্ব অতিক্রম করতে আলোকের যে সময় লাগে সেই সময়।

ভিন্ন ভিন্ন পর্যবেক্ষক সাপেক্ষ AB এবং AC ভিন্ন হলেও ব্যাপক অপেক্ষবাদ-কৃত সংশোধন সাপেক্ষ সমস্ত পর্যবেক্ষকের ক্ষেত্রেই BC অভিন্ন। প্রাচীন পদার্থ-বিদ্যার স্থান এবং কাল বিষয়ক দুটি অন্তরের স্থলে "স্থান-কাল" অন্তর প্রতিস্থাপিত হয়েছে : এটা তারই প্রতিরূপ। আপাতত অন্তর সম্পর্কীয় এই দৃষ্টিভঙ্গি একটু রহস্যজনক মনে হতে পারে। কিন্তু আমরা অগ্রসর হবার সঙ্গে সঙ্গে এ বোধ কমবে এবং বস্তুর স্বভাবের ব্যাপারে এর যুক্তি, ক্রমশ প্রকাশ পাবে।

পঞ্চম অধ্যায়

স্থান-কাল

অপেক্ষবাদ সম্পর্কে যাঁরা কখনো শুনেছেন তাঁদের সবাই 'স্থান-কাল' কথাটা জানেন। এবং এও জানেন যে এই কথাটাই শুদ্ধ এবং আগেকার দিনে আমাদের বলতে হোত "স্থান এবং কাল"। কিন্তু যাঁরা গণিতবিদ নন তাঁদের ভিতরে খুব কম লোকেরই বাগবিধির এই পরিবর্তন সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা আছে। বিশিষ্ট অপেক্ষবাদ নিয়ে আর অগ্রসর হবার আগে এই নূতন শব্দসমষ্টি "স্থান কালের" সঙ্গে কি জড়িত রয়েছে সেটাই আমি পাঠকদের কাছে উপস্থিত করার চেষ্টা করব। কারণ, আইনস্টাইন যে সমস্ত নূতনত্ব উপস্থাপন করেছেন সেগুলির ভিতরে দর্শন (philosophical) এবং কল্পনের (imaginatics) দিক থেকে সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ এটাই।

অনুমান করা যাক একটি ঘটনা—যেমন বিমানে একটি বিস্ফোরণ—কোথায় কখন ঘটেছে—আপনি সেটা বলতে চান, তাহলে আপনাকে উল্লেখ করতে হবে চারটি রাশি—অক্ষাংশ (Latitude) দ্রাঘিমা (Longitude), জমি থেকে উচ্চতা এবং কাল। চিরায়ত দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে এগুলির ভিতরে প্রথম তিনটি প্রকাশ করে স্থানে অবস্থান এবং চতুর্থটি প্রকাশ করে কালে অবস্থান। যে তিনটি রাশি (quantity) স্থানে অবস্থান প্রকাশ করে সেগুলিকে নানাভাবে আরোপ করা সম্ভব। উদাহরণ : আপনি বিষুবরেখার তল (plane) গ্রহণ করতে পারেন, গ্রীণউইচের মধ্যরেখার (meridian) তল গ্রহণ করতে পারেন, গ্রহণ করতে পারেন নবতিতম মধ্যরেখার তল এবং এর প্রতিটি তল থেকে বিমানটি কতদূর ছিল সে কথা বলতে পারেন। দেকার্তের নাম (Descartes) অনুসারে যাকে "কার্তেজীয় স্থানাঙ্ক" (Cartesian Co-ordinate) বলা হয়, এই তিনটি দূরত্ব হল তাই। পরস্পর সমকোণ সম্পর্কযুক্ত অন্য যে কোনো তিনটি তল (plane) আপনি নিতে পারেন। তখনো আপনি কার্তেজীয় স্থানাঙ্ক পাবেন। কিংবা আপনি নিতে পারেন লণ্ডন থেকে, উল্লম্বভাবে বিমানের নীচের বিন্দু পর্যন্ত দূরত্ব, এই দূরত্বের অভিমুখ (উত্তরপূর্ব, পশ্চিম-দক্ষিণ-পশ্চিম কিংবা যাই হোক) এবং মাটি থেকে বিমানের উচ্চতা। স্থানে অবস্থান নির্দিষ্ট করার এরকম পদ্ধতি সংখ্যায় অসীম এবং প্রত্যেকটি পদ্ধতি একই রকম বিধিসঙ্গত (legitimate)। এগুলির ভিতর থেকে একটিকে নির্বাচনের কারণ শুধুমাত্র সুবিধা।

লোকে যখন বলত স্থানের তিনটি মাত্রা তখন তাদের কথার অর্থ ছিল ঠিক এই : স্থানে একটি বিন্দুর অবস্থান নির্দেশ করতে তিনটি রাশি প্রয়োজন। কিন্তু এই রাশিগুলি আরোপ করার পদ্ধতি ছিল সম্পূর্ণ যাদৃচ্ছিক।

কাল বিষয়ে ভাবা হোত : ব্যাপারটা সম্পূর্ণ পৃথক। কাল গণনার একমাত্র যাদৃচ্ছিক উপাদান ছিল কালের একক এবং কাল গণনার আরম্ভ বিন্দু। গ্রীণউইচের কাল, প্যারিসের কাল কিংবা নিউ ইয়র্কের কাল অনুসারে গণনা করা যেত—এতে পার্থক্য হোত প্রস্থান বিন্দুর (point of departure)। সেকেণ্ডে, ঘণ্টায়, দিনে কিংবা বছরে গণনা করা যেত—সে ক্ষেত্রে পার্থক্য হোত এককের। এ ব্যাপারগুলো কিন্তু ছিল স্বতঃপ্রতীয়মান এবং তুচ্ছ। অবস্থান নির্দিষ্ট করার পদ্ধতির ব্যাপারে স্থানের অনুরূপ কোনো নির্বাচনের স্বাধীনতা ছিলনা। তাছাড়া বিশেষ করে ভাবা হোত স্থানে অবস্থান নির্দিষ্ট করার পদ্ধতি এবং কালে অবস্থান নির্দিষ্ট করার পদ্ধতি—এদুটিকে পরস্পর সাপেক্ষ সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র করা সম্ভব। এই সমস্ত কারণে লোকে ভাবত—স্থান এবং কাল সম্পূর্ণ পৃথক।

এ বিষয়ে পরিবর্তন এনেছে অপেক্ষবাদ। কালে অবস্থান নির্দিষ্ট করার এখন একাধিক বিভিন্ন পদ্ধতি রয়েছে। পদ্ধতিগুলির ভিতরে পার্থক্য শুধু একক এবং আরম্ভবিন্দুর নয়। আসলে আগে আমরা দেখেছি একরকম গণনায় যদি একটি ঘটনা অন্য একটি ঘটনার সঙ্গে যুগপৎ হয় তাহলে অন্য গণনায় সেটা অগ্রবর্তী হবে এবং তৃতীয় একটি গণনায় সেটা হবে পশ্চাদ্বর্তী। তাছাড়া স্থান এবং কাল গণনা এখন আর পরস্পর থেকে স্বতন্ত্র নয়। আপনি যদি স্থানে অবস্থান গণনা করার পদ্ধতি পরিবর্তন করেন তাহলে হয়ত আপনি দুটি ঘটনার কাল অন্তরও পরিবর্তন করবেন। আপনি যদি কাল গণনার পদ্ধতির পরিবর্তন করেন তাহলে আপনি স্থানে দুটি ঘটনার দূরত্বেরও পরিবর্তন করতে পারেন। সুতরাং স্থান এবং কাল এখন আর স্বতন্ত্র নয়। স্থানের তিন মাত্রায় যে স্বাতন্ত্র্য তার চাইতে বেশী স্বাতন্ত্র্য কালের নেই। একটি ঘটনার অবস্থান নির্ণয় করতে এখনো আমাদের চারটি রাশিই লাগে কিন্তু আগের মত এখন আমরা একটিকে অন্য তিনটে থেকে স্বতন্ত্র্য ভাবতে পারিনা।

স্থান এবং কালে কোনো পার্থক্য আর নেই এ বিবৃতি কিন্তু সম্পূর্ণ

সত্য নয়। আমরা আগে দেখেছি কালানুরূপ অন্তর এবং স্থানানুরূপ অন্তরের অস্তিত্ব রয়েছে। আগে যেরকম অনুমান করা হোত এ পার্থক্যটা তার চাইতে অন্যরকম। মহাবিশ্বের সর্ব অংশে প্রযোজ্য কোনো দ্ব্যর্থবোধহীন (without ambiguity) সার্বিক কালের অস্তিত্ব নেই। শুধুমাত্র রয়েছে মহাবিশ্বের নানা বস্তুপিণ্ড সাপেক্ষ নানা 'বিশিষ্ট' (proper) কাল। যে দুটি বস্তুপিণ্ড দ্রুত চলমান নয়—তাদের বিশিষ্ট কালের ভিতরে আসন্ন (approximate) ঐক্য রয়েছে। কিন্তু যে বস্তুপিণ্ডগুলি পরস্পর সাপেক্ষ সম্পূর্ণ স্থিতিশীল সেগুলির ক্ষেত্রে ছাড়া এ ঐক্য কখনোই সম্পূর্ণ হতে পারে না।

ঘটনাবলীর এই পরিপ্রেক্ষিতে যে বিশ্বচিত্র প্রয়োজন তার রূপ এইরকম : ধরুন আমাতে একটি ঘটনা E ঘটেছে এবং যুগপৎ আমার কাছ থেকে সর্বদিকে একটি আলোর ঝলক বহির্গত হয়েছে। আলোর ঝলক একটি বস্তুপিণ্ডে পেঁছানোর পর সে বস্তুপিণ্ডে যাই ঘটুক না কেন সেগুলি ঘটেছে নিশ্চিতভাবে ঘটনা E এর পর। কাল গণনা যে তন্ত্র হিসাবে হোক না কেন (any system of reckoning), এ তথ্য সত্য হবে। আমার ভিতরে ঘটনা E ঘটবার আগে আমি যদি যে কোনো জায়গায় ঘটিত কোনো ঘটনা দেখে থাকি তাহলে সে ঘটনা নিশ্চিত ভাবে E এর আগে ঘটেছে—কাল গণনার যে কোনো তন্ত্র অনুসারে এ তথ্য সত্য। কিন্তু অন্তবর্তী কালে সংঘটিত কোনো ঘটনা নিশ্চিত-ভাবে E ঘটনার আগে কিংবা পরে নয়। ব্যাপারটাকে আরও নির্দিষ্ট নিশ্চিত করার জন্য উদাহরণ : অনুমান করা যাক আমি সিরিয়াসের (serius) এক ব্যক্তিকে পর্যবেক্ষণ করতে পারি এবং সেই সিরিয়াসবাসীও আমাকে পর্যবেক্ষণ করতে পারে। আমাতে ঘটনা E ঘটবার আগে সিরিয়াসবাসী করেছে এরকম যা আমি দেখতে পাই সেগুলি নিশ্চিতভাবে E এর পূর্ববর্তী। ঘটনা E দেখবার পর সিরিয়াসবাসী যা যা কিছু করে সেগুলি নিশ্চিত ভাবে E এর পর। ঘটনা E দেখবার আগে সিরিয়াসবাসীর করা যা কিছু আমি E ঘটবার পর দেখতে পাই সেগুলি নিশ্চিতভাবে E এর আগে কিংবা পরে নয়। আলোকের সিরিয়াস থেকে পৃথিবীতে পেঁছতে সাড়ে আট বছর লাগে সুতরাং এ থেকে সিরিয়াসে আমরা সতের বছর সময় পাই যে সময়কে আমরা বলতে পারি E এর সমসাময়িক (contemporary) —কারণ এ ঘটনাগুলি নিশ্চিতভাবে E-এর আগে কিংবা পরে নয়।

লোকে যখন বলত স্থানের তিনটি মাত্রা তখন তাদের কথার অর্থ ছিল ঠিক এই : স্থানে একটি বিন্দুর অবস্থান নির্দেশ করতে তিনটি রাশি প্রয়োজন। কিন্তু এই রাশিগুলি আরোপ করার পদ্ধতি ছিল সম্পূর্ণ যাদৃচ্ছিক।

কাল বিষয়ে ভাবা হোত : ব্যাপারটা সম্পূর্ণ পৃথক। কাল গণনার একমাত্র যাদৃচ্ছিক উপাদান ছিল কালের একক এবং কাল গণনার আরম্ভ বিন্দু। গ্রীণউইচের কাল, প্যারিসের কাল কিংবা নিউ ইয়র্কের কাল অনুসারে গণনা করা যেত—এতে পার্থক্য হোত প্রস্থান বিন্দুর (point of departure)। সেকেণ্ডে, ঘণ্টায়, দিনে কিংবা বছরে গণনা করা যেত—সে ক্ষেত্রে পার্থক্য হোত এককের। এ ব্যাপারগুলো কিন্তু ছিল স্বতঃপ্রতীয়মান এবং তুচ্ছ। অবস্থান নির্দিষ্ট করার পদ্ধতির ব্যাপারে স্থানের অনুরূপ কোনো নির্বাচনের স্বাধীনতা ছিলনা। তাছাড়া বিশেষ করে ভাবা হোত স্থানে অবস্থান নির্দিষ্ট করার পদ্ধতি এবং কালে অবস্থান নির্দিষ্ট করার পদ্ধতি—এদুটিকে পরস্পর সাপেক্ষ সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র করা সম্ভব। এই সমস্ত কারণে লোকে ভাবত—স্থান এবং কাল সম্পূর্ণ পৃথক।

এ বিষয়ে পরিবর্তন এনেছে অপেক্ষবাদ। কালে অবস্থান নির্দিষ্ট করার এখন একাধিক বিভিন্ন পদ্ধতি রয়েছে। পদ্ধতিগুলির ভিতরে পার্থক্য শুধু একক এবং আরম্ভবিন্দুর নয়। আসলে আগে আমরা দেখেছি একরকম গণনায় যদি একটি ঘটনা অন্য একটি ঘটনার সঙ্গে যুগপৎ হয় তাহলে অন্য গণনায় সেটা অগ্রবর্তী হবে এবং তৃতীয় একটি গণনায় সেটা হবে পশ্চাদ্‌বর্তী। তাছাড়া স্থান এবং কাল গণনা এখন আর পরস্পর থেকে স্বতন্ত্র নয়। আপনি যদি স্থানে অবস্থান গণনা করার পদ্ধতি পরিবর্তন করেন তাহলে হয়ত আপনি দুটি ঘটনার কাল অন্তরও পরিবর্তন করবেন। আপনি যদি কাল গণনার পদ্ধতির পরিবর্তন করেন তাহলে আপনি স্থানে দুটি ঘটনার দূরত্বেরও পরিবর্তন করতে পারেন। সুতরাং স্থান এবং কাল এখন আর স্বতন্ত্র নয়। স্থানের তিন মাত্রায় যে স্বাতন্ত্র্য তার চাইতে বেশী স্বাতন্ত্র্য কালের নেই। একটি ঘটনার অবস্থান নির্ণয় করতে এখনো আমাদের চারটি রাশিই লাগে কিন্তু আগের মত এখন আমরা একটিকে অন্য তিনটে থেকে স্বতন্ত্র্য ভাবতে পারিনা।

স্থান এবং কালে কোনো পার্থক্য আর নেই এ বিবৃতি কিন্তু সম্পূর্ণ

সত্য নয়। আমরা আগে দেখেছি কালানুরূপ অন্তর এবং স্থানানুরূপ অন্তরের অস্তিত্ব রয়েছে। আগে যেরকম অনুমান করা হোত এ পার্থক্যটা তার চাইতে অন্যরকম। মহাবিশ্বের সর্ব অংশে প্রযোজ্য কোনো দ্ব্যর্থবোধহীন (without ambiguity) সার্বিক কালের অস্তিত্ব নেই। শুধুমাত্র রয়েছে মহাবিশ্বের নানা বস্তুপিণ্ড সাপেক্ষ নানা 'বিশিষ্ট' (proper) কাল। যে দুটি বস্তুপিণ্ড দ্রুত চলমান নয়– তাদের বিশিষ্ট কালের ভিতরে আসন্ন (approximate) ঐক্য রয়েছে। কিন্তু যে বস্তুপিণ্ডগুলি পরস্পর সাপেক্ষ সম্পূর্ণ স্থিতিশীল সেগুলির ক্ষেত্রে ছাড়া এ ঐক্য কখনোই সম্পূর্ণ হতে পারে না।

ঘটনাবলীর এই পরিপ্রেক্ষিতে যে বিশ্বচিত্র প্রয়োজন তার রূপ এইরকম : ধরুন আমাতে একটি ঘটনা E ঘটেছে এবং যুগপৎ আমার কাছ থেকে সর্বদিকে একটি আলোর ঝলক বহির্গত হয়েছে। আলোর ঝলক একটি বস্তুপিণ্ডে পেঁছানোর পর সে বস্তুপিণ্ডে যাই ঘটুক না কেন সেগুলি ঘটেছে নিশ্চিতভাবে ঘটনা E এর পর। কাল গণনা যে তন্ত্র হিসাবে হোক না কেন (any system of reckoning), এ তথ্য সত্য হবে। আমার ভিতরে ঘটনা E ঘটবার আগে আমি যদি যে কোনো জায়গায় ঘটিত কোনো ঘটনা দেখে থাকি তাহলে সে ঘটনা নিশ্চিত ভাবে E এর আগে ঘটেছে—কাল গণনার যে কোনো তন্ত্র অনুসারে এ তথ্য সত্য। কিন্তু অন্তবর্তী কালে সংঘটিত কোনো ঘটনা নিশ্চিত-ভাবে E ঘটনার আগে কিংবা পরে নয়। ব্যাপারটাকে আরও নির্দিষ্ট নিশ্চিত করার জন্য উদাহরণ : অনুমান করা যাক আমি সিরিয়াসের (serius) এক ব্যক্তিকে পর্যবেক্ষণ করতে পারি এবং সেই সিরিয়াসবাসীও আমাকে পর্যবেক্ষণ করতে পারে। আমাতে ঘটনা E ঘটবার আগে সিরিয়াসবাসী করেছে এরকম যা আমি দেখতে পাই সেগুলি নিশ্চিতভাবে E এর পূর্ববর্তী। ঘটনা E দেখবার পর সিরিয়াসবাসী যা যা কিছু করে সেগুলি নিশ্চিত ভাবে E এর পর। ঘটনা E দেখবার আগে সিরিয়াসবাসীর করা যা কিছু আমি E ঘটবার পর দেখতে পাই সেগুলি নিশ্চিতভাবে E এর আগে কিংবা পরে নয়। আলোকের সিরিয়াস থেকে পৃথিবীতে পেঁছতে সাড়ে আট বছর লাগে সুতরাং এ থেকে সিরিয়াসে আমরা সতের বছর সময় পাই যে সময়কে আমরা বলতে পারি ∙E এর সমসাময়িক (contemporary) —কারণ এ ঘটনাগুলি নিশ্চিতভাবে E-এর আগে কিংবা পরে নয়।

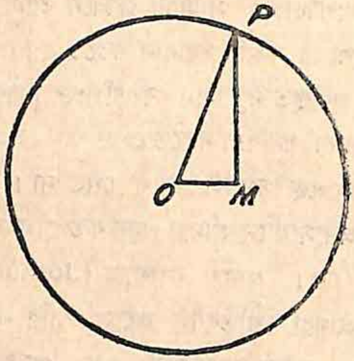
ডাঃ এ, এ, রব (Dr. A. A. Robb) তাঁর "স্থান এবং কাল বিষয়ক তত্ত্ব" (Theory of time and space) পুস্তকে একটি দৃষ্টিভঙ্গির কথা বলেছেন —সে দৃষ্টিভঙ্গি দর্শন শাস্ত্রের দিক থেকে মূলগত হতে পারে, নাও হতে পারে। সে যাই হোক, যে ব্যাপারটার বিবরণ দিতে আমরা চেষ্টা করছি সেটা বুঝতে এ দৃষ্টিভঙ্গি আমাদের সাহায্য করবে। তাঁর মতে একটি ঘটনাকে অন্য একটি ঘটনার নিশ্চিত পূর্বগামী বলা যায় তখনই যখন সে ঘটনা অন্য ঘটনাটিকে কোনোভাবে প্রভাবিত করে। একটি কেন্দ্র থেকে প্রভাব বিস্তৃত হয় নানা হারে। লণ্ডন থেকে উদ্ভুত সংবাদপত্রের প্রভাব ঘণ্টায় কুড়ি মাইল হারে বিস্তার লাভ করে—দূরত্ব দীর্ঘতর হলে এর চাইতে একটু বেশী হারেও করে। সংবাদপত্রে প্রবন্ধ পাঠের ফলে একটি লোক যা কিছু করে সেগুলি স্পষ্টতই সংবাদপত্র মুদ্রণের পরবর্তী। শব্দ অনেক বেশী দ্রুতগামী। রাজ-পথবরাবর লাউডস্পীকারের সার বসিয়ে কাগজের খবর একটা থেকে পরেরটায় চেঁচিয়ে বলা সম্ভব। কিন্তু টেলিগ্রাফ যায় আরও তাড়াতাড়ি আর রেডিও সঙ্কেত চলে আলোর বেগে সুতরাং এর চাইতে দ্রুত কিছু আশা করা যায় না। কোনো ব্যক্তি বেতার বার্তা পাবার ফলে যে কাজ করে সে কাজ করা হয় বার্তা প্রেরণের পর ; এক্ষেত্রে পরবর্তী শব্দের অর্থ কাল মাপনের রীতি-নিরপেক্ষ। কিন্তু বার্তা যখন চলার পথে তখন যা করা হয় সেগুলি বার্তা প্রেরণের দ্বারা প্রভাবিত হতে পারে না এবং বার্তা প্রেরণের সামান্য কাল পরে ছাড়া বার্তা প্রেরককে প্রভাবিত করতে পারে না। সেই সময় অতিবাহিত হবার আগে যা ঘটে সে ঘটনা দূরবর্তী বস্তুপিণ্ডকে প্রভাবিত করতে পারে না। দৃষ্টান্ত : অনুমান করা যাক সূর্যে একটি লক্ষণীয় ঘটনা ঘটেছে। ষোল মিনিট পর্যন্ত পৃথিবীর কোনো ঘটনা সূর্যের সেই ঘটনাকে প্রভাবিত করতে পারে না কিংবা সে ঘটনার দ্বারা প্রভাবিত হতে পারে না। ফলে পৃথিবীর ষোল মিনিট কালকে সূর্যের ঘটনার পূর্ববর্তী কিংবা পরবর্তী না ভাববার বাস্তব যুক্তি রয়েছে।

বিশিষ্ট অপেক্ষবাদের স্ববিরোধগুলিকে (paradox) স্ববিরোধী মনে হয় শুধুমাত্র আমরা ঐ দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে পরিচিত নই বলে ; এবং যে সমস্ত তথ্যকে সত্য বলে মেনে নেবার কোনো অধিকার আমাদের নেই, সেই সমস্ত তথ্যকে সত্য বলে গ্রহণ করার অভ্যাসের দরুণ। দৈর্ঘ্য মাপন ব্যাপারে এ তথ্য বিশেষভাবে সত্য। দৈনন্দিন জীবনে আমাদের দৈর্ঘ্য মাপনের পদ্ধতি

ফুটরুল (foot rule) কিংবা অন্য কোনো মানদণ্ড প্রয়োগ করা। প্রয়োগের মুহূর্তে ফুটরুলটি যে জিনিষটিকে মাপা হচ্ছে সেটি সাপেক্ষ স্থিতিশীল। সুতরাং মাপনের সাহায্যে যে দৈর্ঘ্য পাওয়া যায় সেটাই 'সঠিক' (proper) দৈর্ঘ্য। অর্থাৎ সে দৈর্ঘ্য স্থির করেছেন এমন একজন পর্যবেক্ষক যিনি ঐ বস্তুপিণ্ডের গতির অংশীদার। সাধারণ জীবনে আমাদের কখনোই অবিরাম চলমান বস্তুপিণ্ড মাপনের সমস্যা সমাধান করতে হয় না। পৃথিবীর বেগের তুলনায় পৃথিবীতে অবস্থিত দৃশ্যমান বস্তুপিণ্ডগুলির বেগ এত কম যে আমাদের যদি সে সমস্যার সমাধান করতে হোত তাহলেও অপেক্ষবাদ যে সমস্ত অসঙ্গতি নিয়ে বিচার করেছে সেগুলি প্রকাশ পেত না। কিন্তু জ্যোতির্বিজ্ঞানে কিংবা আণবিক গঠন অনুসন্ধানে আমরা এমন কতগুলি সমস্যায় পড়ি যেগুলির সমাধান এভাবে সম্ভব নয়। আমরা যোশুয়া (Joshua) নই সুতরাং মাপবার সময় সূর্যকে আমরা স্থিতিশীল করতে পারি না। সূর্যের আয়তন পরিমাপ করতে হলে করতে হবে সূর্য যখন পৃথিবী সাপেক্ষ চলমান তখনই। ইলেক্ট্রন সাপেক্ষও ব্যাপারটা একই। ইলেক্ট্রন মাপতে হবে দ্রুত চলমান অবস্থায়। কারণ ইলেক্ট্রন মুহূর্তের জন্যও স্থির থাকে না। এই রকম সমস্যা নিয়েই অপেক্ষবাদের চিন্তন। ফুটরুল দিয়ে যখন মাপা সম্ভব তখন মাপন ফল সবসময়ই এক হয়। কারণ এ পদ্ধতিতে আমরা পাই বস্তুপিণ্ডের 'সঠিক' (proper—নিজস্ব) দৈর্ঘ্য। এ পদ্ধতি যখন সম্ভব নয় বিশেষ করে যে বস্তুপিণ্ডকে মাপতে হবে সেটা যখন পর্যবেক্ষক সাপেক্ষ দ্রুত চলমান তখন অদ্ভুত সব ব্যাপার ঘটে। ব্যাপারটা বুঝতে হলে আগের অধ্যায়ের শেষের চিত্রটির মত একটা চিত্র আমাদের সাহায্য করতে পারে।

অনুমান করা যাক যে বস্তুপিণ্ডের দৈর্ঘ্য আমরা মাপতে চাই সেটা আমরা সাপেক্ষ চলমান এবং সেটি এক সেকেণ্ডে OM দৈর্ঘ্য অতিক্রম করে। Oকে কেন্দ্র করে একটি বৃত্ত আঁকা যাক। আলোক এক সেকেণ্ডে যে দূরত্ব অতিক্রম করে সেটা হবে বৃত্তের ব্যাসার্ধ। M থেকে OM এর উপর MP লম্ব আঁকুন। লম্বটি বৃত্তের সঙ্গে মিলিত হবে P বিন্দুতে। তাহলে OP হবে আলোক এক সেকেণ্ডে যে দূরত্ব অতিক্রম করে তার সমান। OP-এর সঙ্গে OM-র অনুপাত তাহলে আলোকের বেগের সঙ্গে বস্তুপিণ্ডের বেগের অনুপাত। গতির ফলে আপাতদৃষ্ট দৈর্ঘ্যের যে পরিবর্তন হয় সেটা হল OP-এর সঙ্গে MP-এর অনুপাত। অর্থাৎ একজন পর্যবেক্ষকের বিচারে একটি চলমান

বস্তুপিণ্ডের গতিরেখার দুটি বিন্দুর পারস্পরিক দূরত্বের প্রতিরূপ যদি MP হয় তাহলে ঐ বস্তুপিণ্ডের সঙ্গে চলমান একটি ব্যক্তির বিচারে ঐ দূরত্বের প্রতিরূপ (একই মাপক্রমে scale) হবে OP। চলমান বস্তুপিণ্ডের উপর



গতিরেখার সমকোণীয় দূরত্ব গতিদ্বারা প্রভাবিত হয় না। পুরো ব্যাপারটাই পারস্পরিক (erciprocal)। অর্থাৎ বস্তুপিন্ডটির সঙ্গে চলমান একজন পর্যবেক্ষক যদি আগের পর্যবেক্ষকের বস্তুপিণ্ডের উপরের দৈর্ঘ্য মাপেন তাহলে তার পরিবর্তন হবে একই অনুপাতে। দুটি বস্তুপিণ্ড যখন পরস্পর সাপেক্ষ চলমান তখন একটির উপরের দৈর্ঘ্য নিজেদের তুলনায় অপরের কাছে হ্রস্বতর মনে হয়। এরই নাম লোরেনৎস সংকোচন (Lorcntz-contraction)। মিচেলসন মর্লি পরীক্ষার ফল ব্যাখ্যা করার জন্য এ তথ্য প্রথম আবিষ্কৃত হয়। যুগপত্তা সম্পর্কে দুজন পর্যবেক্ষকের বিচার এক হয়না এই তথ্য থেকে লোরেনৎস সঙ্কোচন তত্ত্বের আবির্ভাব স্বাভাবিক।

যুগপত্তা আসছে এইভাবে : যখন আমরা একটি বস্তুপিণ্ডের দুটি বিন্দুর একটিতে ফুটরুলের একপ্রান্ত এবং অন্যটিতে ফুটরুলের অন্যপ্রান্ত "যুগপৎ" প্রয়োগ করতে পারি তখন আমরা বলি বিন্দু দুটির দূরত্ব একফুট। কিন্তু দুই ব্যক্তির যদি যুগপতা বিষয়ে মতানৈক্য থাকে এবং বস্তুপিণ্ডটি যদি চলমান হয় তাহলে তাদের দুজনের মাপনফল ভিন্ন ভিন্ন হবে এ তথ্য স্বতঃপ্রতীয়মান। সুতরাং দূরত্ব বিষয়ক সঙ্কটের মূলে রয়েছে কাল বিষয়ক সঙ্কট।

এই সমস্ত বিষয়ের মূলে রয়েছে (essential thing) OP এর সঙ্গে MP এর অনুপাত। আলোচ্য বস্তুপিণ্ড যখন পর্যবেক্ষক সাপেক্ষ চলমান

তখন কাল, দৈর্ঘ্য এবং ভর এই অনুপাতে পরিবর্তিত হয়। দেখা যাবে OM যদি OP এর তুলনায় খুব ছোট হয় অর্থাৎ বস্তুপিণ্ডের গতি আলোকের তুলনায় অত্যন্ত অল্প হলে MP এবং OP হবে প্রায় সমান সুতরাং গতির ফলে পরিবর্তনের পরিমাণ হবে অত্যন্ত অল্প। কিন্তু OM যদি OP এর সমান হয় অর্থাৎ বস্তুপিণ্ডটির গতি যদি প্রায় আলোকের সমান হয় তাহলে OP এর তুলনায় MP হয় অত্যন্ত ছোট এবং ক্রিয়াফল (effect) হয় অত্যন্ত বেশী। দ্রুতগামী বস্তুকণাগুলির ভরের আপাতদৃষ্ট বৃদ্ধি আগেই লক্ষ্য করা গিয়েছিল এবং বিশিষ্ট অপেক্ষবাদ আবিষ্কারের আগেই সঠিক সঙ্কেতও (formula) আবিষ্কৃত হয়েছিল। লোরেন্‌ৎস রূপান্তর (Lorentz Transformation) নামক সঙ্কেত লোরেন্‌ৎস আবিষ্কার করেছিলেন। আসলে বিশিষ্ট অপেক্ষবাদের গাণিতিক সারাংশের (mathematical essence) সবটাই এ সঙ্কেতের অঙ্গীভূত। কিন্তু আইনস্টাইনই দেখিয়েছিলেন পুরো ব্যাপারটাই আশানুরূপ; বিস্ময়কর পরীক্ষাফল ব্যাখ্যা করার জন্য এক গুচ্ছ অস্থায়ী কৌশল মাত্র নয়। বৈজ্ঞানিক পরীক্ষালব্ধ ফলই ছিল সম্পূর্ণ তত্বটির প্রাথমিক প্রেরণা; একথা কিন্তু ভুললে চলবে না। ভুললে চলবে না, অপেক্ষবাদের সঙ্গে জড়িত বিরাট যৌক্তিক পুনর্গঠনের দায় গ্রহণ করার কারণ ছিল এই পরীক্ষাফল।

এবার আমরা স্থান এবং কালের পরিবর্তে 'স্থান-কাল' প্রতিস্থাপন করার প্রয়োজনগুলি পুনরাবৃত্তি করতে পারি, স্থান এবং কালের প্রাচীন বিচ্ছিন্নতা প্রতিষ্ঠিত ছিল এই বিশ্বাসের উপর : দূরস্থিত দুটি ঘটনা একই কালে ঘটেছে—এই কথার ভিতর দ্ব্যর্থবোধক কিছু নেই। সেই জন্য চিন্তা করা হোত যে কোনো একটি বিশেষ মুহূর্তে ব্রহ্মাণ্ডের সংস্থান বিবরণ (topography of the universe) শুদ্ধ স্থানিক বাগ্‌বিধিতে (purely spatial terms) প্রকাশ করা সম্ভব। কিন্তু এখন যুগপত্তার অর্থ দাঁড়িয়েছে একজন বিশেষ পর্যবেক্ষক সাপেক্ষ যুগপত্তা, সুতরাং এ পদ্ধতি এখন অচল। একজন পর্যবেক্ষক সাপেক্ষ যেটা এক বিশেষ মুহূর্তে বিশ্বের অবস্থার বিবরণ আর একজন পর্যবেক্ষক সাপেক্ষ সেটা নানা ভিন্ন ভিন্ন কালের ঘটনার মালিকামাত্র। সে ঘটনাগুলির পারস্পারিক সম্পর্ক শুধু স্থানিক নয়—কালিকও বটে। সেই জন্যই আমাদের বিচার 'ঘটনা' (events)

নিয়ে, বস্তুপিণ্ড (body) নিয়ে নয়। আগেকার তত্ত্বে একই মুহূর্তে একাধিক বস্তুপিণ্ড সম্পর্কে বিচার সম্ভব ছিল। প্রতিটি বস্তুপিণ্ড সাপেক্ষ কাল ছিল অভিন্ন সুতরাং কালকে অগ্রাহ্য করা যেত। কিন্তু ভৌত ঘটনাগুলি সম্পর্কে বস্তুনিষ্ঠ তথ্য সংগ্রহ করতে হলে এখন আর আমরা কালকে অগ্রাহ্য করতে পারি না। একটি বস্তুপিণ্ড বিচারের কালাংক আমাদের উল্লেখ করতে হবে এইভাবে আমরা উপনীত হব ঘটনায় অর্থাৎ একটি বিশেষ কালে ঘটমান একটা কিছুতে। একজন পর্যবেক্ষকের গণনাপদ্ধতি অনুসারে একটি ঘটনার স্থান এবং কাল জানলে আমরা অন্য পর্যবেক্ষক সাপেক্ষ সে ঘটনার স্থান এবং কাল গণনা করতে পারি। আগের পর্যবেক্ষকের 'সমকালে' (same time) পরের পর্যবেক্ষকের স্থান কোথায়? এ প্রশ্ন আর করা সম্ভব নয়। সুতরাং আমাদের স্থান এবং কাল দুটোই জানতে হবে, বিভিন্ন পর্যবেক্ষক পরস্পর সাপেক্ষ স্থিতিশীল না হলে তাদের সবার 'একই' কালের কোনো অস্তিত্ব নেই। একটি অবস্থান নির্দিষ্ট করতে আমাদের চারটি মাপন প্রয়োজন। এই চারটি মাপন স্থানকালে একটি ঘটনার অবস্থান নির্দিষ্ট করে—শুধুমাত্র স্থানে বস্তুপিণ্ডের অবস্থান নির্দিষ্ট করে না। একটি অবস্থান নির্দিষ্ট করতে তিনটি মাপন যথেষ্ট নয়। স্থান এবং কালের স্থলে 'স্থান-কাল' প্রতিস্থাপনের অর্থের সারাংশ এটাই।

ষষ্ঠ অধ্যায়

বিশিষ্ট অপেক্ষবাদ

বিদ্যুৎ চুম্বকীয় তথ্য ব্যাখ্যা করার একটি পদ্ধতি রূপেই বিশিষ্ট অপেক্ষবাদের উদ্ভব। এই ইতিহাস বেশ অদ্ভূত। অষ্টাদশ শতাব্দী এবং উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে বিদ্যুৎ বিষয়ক তত্ত্ব ছিল সম্পূর্ণভাবে নিউটনীয় তত্ত্বের সঙ্গে (Newtonian Analogy) সাদৃশ্যের প্রভাবাধীন। দু'টি বৈদ্যুতিক আধান (electric charge) ভিন্নরূপের হলে অর্থাৎ একটি পরা আধান (পজিটিভ্ আধান positive charge) এবং একটি অপরা আধান (নেগেটিভ আধান—Negative charge) হলে তারা পরস্পরকে আর্কষণ করবে। আধান সমরূপের হলে তারা পরস্পরকে বিকর্ষণ করবে। মহাকর্ষের ক্ষেত্রে যেমন হয় তেমনি এর প্রতিটি ক্ষেত্রে বল বিপরীত বর্গে (Inverse square) পরিবর্তী। ফ্যারাডের পূর্বে এই বলকে দূরের ক্রিয়ারূপে কল্পনা করা হোত। ফ্যারাডে কয়েকটি উল্লেখ যোগ্য পরীক্ষার সাহায্যে অন্তবর্তী মাধ্যমের ক্রিয়া প্রদর্শন করেন। ফ্যারাডে গণিতবিদ্ ছিলেন না। ক্লার্ক ম্যাক্সওয়েলই প্রথম ফ্যারাডের বৈজ্ঞানিক পরীক্ষালব্ধ ফলকে গাণিতিক রূপ দিয়েছেন। তাছাড়া আলোক একটি বিদ্যুৎ চুম্বকীয় পরিঘটনা এবং বিদ্যুৎ চুম্বকীয় তরঙ্গ দিয়ে আলোক গঠিত এই চিন্তনের ভিত্তি এসেছে ক্লার্ক ম্যাক্সওয়েলের কাছ থেকে। সুতরাং বিদ্যুৎ চুম্বকীয় অভিক্রিয়া প্রেরণের মাধ্যম হিসাবে ইথারকে গ্রহণ করা যেত। ইথার আলোক প্রেরণের মাধ্যম এ অনুমান বহুকালের। বিদ্যুৎচুম্বকীয় তরঙ্গ তৈরী বিষয়ে হার্জ (Hertz)-এর পরীক্ষাগুলি ম্যাক্সওয়েলের আলোকতত্ত্বের নির্ভুলতা প্রমান করেছে। বেতার এবং রাডারের ভিত্তিও এই পরীক্ষাগুলি। এই পর্য্যন্ত রয়েছে আমাদের বিজয়োদ্ধত অগ্রগতির স্মারক (record of triumphant progress) তত্ত্ব এবং বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা পর্যায়ক্রমে এই অভিযানের নেতৃত্ব নিয়েছে। হার্জের পরীক্ষার সময় মনে হয়েছে ইথার দৃঢ় ভাবে প্রতিষ্ঠিত। প্রত্যক্ষ প্রমাণ সম্ভব নয় এই রকম যে কোনো বৈজ্ঞানিক প্রকল্পের (Hypothesis) মতই দৃঢ় ছিল ইথারের প্রতিষ্ঠা। কিন্তু আবিষ্কার হতে শুরু করল নূতন তথ্যমালা এবং ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হল সম্পূর্ণ চিত্র।

সব জিনিষকে সন্তত (continuous) করার এই আন্দোলনকে সর্বোচ্চ স্থরে তুলে ধরেন হার্জ। ইথার ছিল সন্তত, ইথার তরঙ্গ ছিল সন্তত এবং আশা করা গিয়েছিল দেখা যাবে পদার্থের উপাদানেও রয়েছে ইথারের ভিতরের কয়েকটি সন্তত গঠন (structure)। কিন্তু তারপর আবিস্কৃত হল পদার্থের পারমাণবিক গঠন এবং পরমাণুগুলির নিজস্ব বিবিক্ত (discrete) গঠন। বিশ্বাস ছিল পরমাণুগুলি ইলেক্‌ট্রেন, প্রোটন এবং নিউট্রন দিয়ে গঠিত। ইলেকট্রন—নির্দিষ্ট, নিশ্চিত অপরা বৈদ্যুতিক আধান বহনকারী ক্ষুদ্র বস্তুকণা। প্রোটন বহন করে নির্দিষ্ট নিশ্চিত পরা বৈদ্যুতিক আধান (positive electric charge)। নিউট্রনে কোনো বৈদ্যুতিক আধান নেই (ইলেকট্রনকে অপরা এবং প্রোটনকে পরা বলা হয়। উল্টোটা বলা হয় না শুধুমাত্র রীতির জন্য)। মনে হয়েছিল সম্ভবত ইলেকট্রন আর প্রোটনে আধান রূপে ছাড়া বিদ্যুৎ পাওয়া যায় না। সমস্ত ইলেকট্রনেই ঠিক একই অপরা বৈদ্যুতিক আধান রয়েছে এবং সমস্ত প্রোটনেই রয়েছে ঠিক সমান এবং বিপরীতধর্মী পরা বিদ্যুৎ আধান। এরপর আরও উনপারমাণবিক কণা আবিস্কৃত হয় (sub-atomic particles)। সেগুলির অধিকাংশেরই নাম মেসন (Meson) কিংবা হাইপেরন (Hyperon)। সমস্ত প্রোটনের ওজন অভিন্ন। এগুলি ইলেকট্রনের চাইতে প্রায় আঠারশগুণ বেশী ভারী। সমস্ত নিউট্রনেরও ওজন ঠিক এক (exactly same weight)। এগুলি প্রোটনের চাইতে সামান্য বেশী ভারী। মেসন অনেক ভিন্ন ভিন্ন রকমের রয়েছে। সেগুলির ওজন ইলেকট্রনের চাইতে বেশী কিন্তু প্রোটনের চাইতে কম। হাইপেরন প্রোটন কিংবা নিউট্রনের চাইতে ভারী।

কতগুলি কণায় বৈদ্যুতিক আধান রয়েছে আবার কতগুলিতে নেই। দেখা গিয়েছে পরা আধানযুক্ত কণাগুলির আধান একেবারেই প্রোটনের সমান আবার অপরা আধানযুক্ত কণাগুলির আধান যথাযথভাবে ইলেকট্রনের সমান। অথচ তাদের অন্যান্য ধর্মগুলি একেবারেই পৃথক। পজিট্রন (Positron) নামে এক বস্তুকণা ব্যাপারটাকে আরো গোলমেলে করে দিয়েছে। এই বস্তুকণা এবং ইলেকট্রন অভিন্ন অথচ তার বৈদ্যুতিক আধান পরা, ইলেকট্রনের মত অপরা নয়। পরীক্ষামূলকভাবে এমন কণা সৃষ্টি করা সম্ভব যা সর্ব বিষয়ে প্রোটনের সঙ্গে অভিন্ন, শুধুমাত্র তার বৈদ্যুতিক আধান অপরা, এগুলির নাম এ্যান্টিপ্রোটন (Antiproton)।

পদার্থের বিবিক্ত গঠন সম্পর্কীয় এই আবিস্কারগুলিকে পরমাণুর

বর্ণালীর উজ্জ্বল রেখাগুলির মত অন্যান্য তথাকথিত কোয়াণ্টাম পরিঘটনা আবিস্কার থেকে পৃথক করা যায় না। মনে হয় যেখানেই যথেষ্ট নির্ভুল মাপন সম্ভব, প্রকৃতির সমস্ত পদ্ধতি সেখানেই মূলগত বিচ্ছিন্নতা প্রদর্শন করে।

পদার্থবিদ্যাকে এইভাবে হজম করতে হয়েছে নতুন নতুন তথ্য এবং মুখোমুখি হতে হয়েছে একাধিক নতুন সমস্যার। কোয়াণ্টাম তত্ত্ব প্রায় আধুনিক অবয়বে বর্তমান রয়েছে ষাট বছর এবং বিশিষ্ট অপেক্ষবাদ রয়েছে আশি বছর কিন্তু এই দুটির সংযুক্তি বিষয়ে ত্রিশ বছর আগে পর্যন্ত বিশেষ কোনো অগ্রগতি হয়নি। সাম্প্রতিক বিকাশের ফলে কোয়াণ্টাম তত্ত্ব বিশিষ্ট অপেক্ষবাদের সঙ্গে আরও সঙ্গতিপূর্ণ হয়েছে। এই অগ্রগতি উনপারমাণবিক কণা বুঝতে আমাদের অনেক সাহায্য করেছে কিন্তু অনেক গুরুত্বপূর্ণ অসুবিধা রয়ে গিয়েছে।

কোয়াণ্টাম তত্ত্ব ছাড়াও যেসমস্ত সমস্যা বিশিষ্ট অপেক্ষবাদ নিজ কৃতিত্বে (In its own right) সমাধান করেছে মিচেলসন-মর্লি পরীক্ষা তার একটি জাতিরূপ (typified)। ম্যাক্সওয়েলের বিদ্যুৎ চুম্বকীয় তত্ত্বের সত্যতা মেনে নিলে ইথারের গতির কোনো আবিস্কারযোগ্য ক্রিয়া থাকা উচিত ছিল কিন্তু কোনো কিছুই আসলে পাওয়া যায়নি। তাছাড়া অত্যন্ত দ্রুত গতিতে একটি বস্তুপিণ্ডের ভর বৃদ্ধি দেখা যায়: এ তথ্য পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে। এই বৃদ্ধি আগের অধ্যায়ের চিত্রের OP এর সঙ্গে MP এর অনুপাতের সমান। এই ধরনের তথ্য জমতে থাকে এবং প্রয়োজন হয় এমন একটি তত্ত্বের যে তত্ত্ব এই সমস্ত তথ্যকে ব্যাখ্যা করতে পারে।

ম্যাক্সওয়েলের তত্ত্ব কতকগুলি সমীকরণে পরিণত হয়েছিল। সেগুলির নাম 'ম্যাক্সওয়েল সমীকরণ'। গত শতাব্দীতে পদার্থবিদ্যায় যে কটি বিপ্লব হয়েছে তার সবকটি অতিক্রম করেও ম্যাক্সওয়েল সমীকরণ বেঁচে আছে (remained standing)। আসলে এই সমীকরণগুলির গুরুত্ব এবং নিশ্চয়তা ক্রমশই বেড়েছে। এগুলির সপক্ষে ম্যাক্সওয়েলের যুক্তি ছিল এত দুর্বল যে এর নির্ভুলতার কৃতিত্ব প্রায় স্বজ্ঞার (Intuition) উপরেই আরোপ করা উচিৎ সন্দেহ নেই। এই সমীকরণগুলির ভিত্তি ছিল পার্থিব গবেষণাগারে কৃত পরীক্ষা কিন্তু ইথারের ভিতর দিয়ে পৃথিবীর গতি অগ্রাহ্য করা যেতে পারে এই নীরব অনুমান ম্যাক্সওয়েল তত্ত্বে নিহিত

ছিল। মিচেলসন-মর্লি পরীক্ষার মত কতকগুলি ক্ষেত্রে মাপন যোগ্য ভুল ছাড়া এটা সম্ভব হওয়া উচিৎ ছিল না। কিন্তু দেখা গেল ব্যাপারটা সব সময়ই সম্ভব। পদার্থবিদ্যাবিদরা এক অদ্ভুত সঙ্কটে পড়েছিলেন : ম্যাক্সওয়েলের সমীকরণগুলি ছিল যতটা হওয়া উচিত তার চাইতেও নির্ভুল। আধুনিক পদার্থবিদ্যার সুরুতে একই রকম এক সঙ্কট ব্যাখ্যা করেছিলেন গ্যালিলিও। অধিকাংশ লোকেরই ধারণা একটি ওজনকে পড়তে দিলে সেটা পড়বে উল্লম্বভাবে (vertically)। কিন্তু আপনি যদি একটি চলমান জাহাজের কেবিনে এই পরীক্ষা করেন তাহলে কেবিন সাপেক্ষ ওজনটির পতন এমন ভাবে হবে যেন জাহাজটি গতিহীন—। উদাহরণ : ওজনটা ছাতের মাঝখান থেকে পড়তে সুরু করলে ঠিক মেঝের মাঝখানে এসে পড়বে। তীরের একজন পর্যবেক্ষক সাপেক্ষ পতন কিন্তু উল্লম্ব (vertical) নয় কারণ ওজনটা জাহাজের গতির অংশীদার। যতক্ষণ পর্যন্ত জাহাজের গতি অবিচালিত (steady) ততক্ষণ পর্যন্ত জাহাজের ভিতরের ঘটনাবলী এমন ভাবে হবে যেন জাহাজটি চলমান নয়। ব্যাপারটা কি করে হয় সে ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন গ্যালিলিও। এ্যারিষ্টোটলের শিষ্যরা তাতে খুব অপমানিত বোধ করেছিলেন, বেজায় রেগে গিয়েছিলেন। গ্যালিলিও থেকে আহরিত প্রাচীন পদার্থবিদ্যা অনুসারে 'ঋজুরেখায় সমরূপ গতির কোনো আবিষ্কারযোগ্য অভিক্রিয়া (dishoverable effects) নেই। আজকের দিনে আইনষ্টাইনের আপেক্ষিকতা যে রকম বিষ্ময়কর সে সময়ে গ্যালিলিওর আপেক্ষিকতাও (form of relativity) ছিল সেই রকম। বিশিষ্ট অপেক্ষবাদে আইনষ্টাইনের কর্মপ্রচেষ্টা ছিল ইথারের ভিতর দিয়ে সমরূপ গতি দ্বারা কি করে বিদ্যুৎচুম্বকীয় পরিঘটনা অপ্রভাবিত থাকতে পারে সেটা দেখানো : অবশ্য ইথার বলে কিছু যদি থেকে থাকে তাহলে। এ সমস্যা ছিল আরো কঠিন। শুধুমাত্র গ্যালিলিওর নীতির ভিত্তিতে এ এ সমস্যার সমাধান সম্ভব ছিল না।

এ সমাধানে সত্যিকারের কঠিন প্রচেষ্টার প্রয়োজন ছিল কালিক সমস্যা বিষয়ে। প্রয়োজন ছিল বিশিষ্টকাল সম্পর্কীয় ধারণা উপস্থাপন করা। এ বিষয়ে আমরা আগেই আলোচনা করেছি। আর প্রয়োজন ছিল এক ব্রহ্মাণ্ডীয় কাল সম্পর্কীয় প্রাচীন বিশ্বাস পরিত্যাগ করা। বিদ্যুৎচুম্বক পরিঘটনা সম্পর্কিত পরিমাণগত বিধি ম্যাক্সওয়েলের সমীকরণে প্রকাশিত।

দেখা যায় সমস্ত পর্যবেক্ষক সাপেক্ষই এই সমীকরণগুলি সত্য। পর্যবেক্ষকের গতি যে রকমই হোক না—তাতে কিছু এসে যায় না। একজন পর্যবেক্ষকের প্রযুক্ত মাপনের সঙ্গে অন্য একজন পর্যবেক্ষকের প্রযুক্ত মাপনের পার্থক্য থাকবেই। তাদের আপেক্ষিক গতি সত্ত্বেও যদি তারা ঐ সমীকরণগুলির সত্যতা প্রমাণ করতে চায় তাহলে সে পার্থক্য নির্ণয় করা একটি প্রত্যক্ষ গাণিতিক সমস্যা মাত্র। এ সমস্যার উত্তর রয়েছে 'লোরেঞ্জ রূপান্তরে'। এটা একটা সঙ্কেতরূপে আবিস্কার করেছিলেন লোরেঞ্জ (Lorentz) কিন্তু এর ব্যাখ্যা করেছিলেন আইনস্টাইন এবং একে বোধগম্যও করেছিলেন তিনি।

একজন পর্যবেক্ষকের দূরত্ব এবং পরিব্যাপ্তি কাল আমাদের জানা থাকলে যার আপেক্ষিক গতি জানা আছে সেই রকম অন্য একজন পর্যবেক্ষকের প্রথমোক্ত পর্যবেক্ষকের দূরত্ব এবং পরিব্যাপ্তি কাল (period of time) সম্পর্কে সম্ভাব্য অনুমান (estimate) প্রকাশ করেছে লোরেঞ্জ রূপান্তর।

আমরা অনুমান করতে পারি ঠিক পূর্বদিকগামী একটা রেলগাড়ীতে আপনি রয়েছেন। যে ষ্টেশান থেকে আপনার যাত্রা শুরু সেই ষ্টেশনের ঘড়ি অনুসারে আপনার ভ্রমণকাল 't'। লাইনের উপরের লোকেদের মাপন অনুসারে আপনার যাত্রা বিন্দু থেকে x দূরত্বে এই মুহূর্তে একটা ঘটনা ঘটে—ধরুন লাইনে বাজ পড়ল। সব সময়ই আপনি সমরূপ গতি 'v'-তে ভ্রমণ করছিলেন। প্রশ্নটা হল : আপনার বিচারে আপনার থেকে কতটা দূরে ঘটনাটা ঘটেছে বলে মনে হবে এবং রেলগাড়ীতে অবস্থিত একজন পর্যবেক্ষকের দৃষ্টিভঙ্গিতে যদি আপনার ঘড়ি নির্ভুল অনুমান করা হয় তাহলে সেই ঘড়ি অনুসারে আপনার যাত্রা শুরুর কতক্ষণ পর ঘটনাটা ঘটেছে ?

আমরা এই সমস্যার যে সমাধান করব সে সমাধানের কয়েকটি শর্ত পালন করতে হবে। সমাধান ফল এমন হতে হবে যে গতির প্রকার নির্বিশেষে সমস্ত পর্যবেক্ষক সাপেক্ষই আলোকের বেগ অভিন্ন হবে। তাছাড়া বিভিন্ন ভৌত পরিঘটনা বিশেষ করে বিদ্যুৎ চুম্বকীয় পরিঘটনাগুলিকে বিভিন্ন পর্যবেক্ষক সাপেক্ষ একই বিধি মানাতে হবে। তাদের নিজস্ব গতির ফলে তাদের কাল এবং দূরত্ব মাপনে যতই ভিন্নতা প্রদর্শিত হোক না কেন ভৌত পরিঘটনাগুলিকে বিশেষ করে বিদ্যুৎচুম্বকীয় পরিঘটনাগুলিকে একই বিধি মানতে হবে। তাছাড়া মাপনের উপর সেই সমস্ত অভিক্রিয়াকে করতে

ছিল। মিচেলসন-মর্লি পরীক্ষার মত কতকগুলি ক্ষেত্রে মাপন যোগ্য ভুল ছাড়া এটা সম্ভব হওয়া উচিৎ ছিল না। কিন্তু দেখা গেল ব্যাপারটা সব সময়ই সম্ভব। পদার্থবিদ্যাবিদরা এক অদ্ভুত সঙ্কটে পড়েছিলেন : ম্যাক্সওয়েলের সমীকরণগুলি ছিল যতটা হওয়া উচিত তার চাইতেও নির্ভুল। আধুনিক পদার্থবিদ্যার সুরুতে একই রকম এক সঙ্কট ব্যাখ্যা করেছিলেন গ্যালিলিও। অধিকাংশ লোকেরই ধারণা একটি ওজনকে পড়তে দিলে সেটা পড়বে উল্লম্বভাবে (vertically)। কিন্তু আপনি যদি একটি চলমান জাহাজের কেবিনে এই পরীক্ষা করেন তাহলে কেবিন সাপেক্ষ ওজনটির পতন এমন ভাবে হবে যেন জাহাজটি গতিহীন—। উদাহরণ : ওজনটা ছাতের মাঝখান থেকে পড়তে সুরু করলে ঠিক মেঝের মাঝখানে এসে পড়বে। তীরের একজন পর্যবেক্ষক সাপেক্ষ পতন কিন্তু উল্লম্ব (vertical) নয় কারণ ওজনটা জাহাজের গতির অংশীদার। যতক্ষণ পর্যন্ত জাহাজের গতি অবিচলিত (steady) ততক্ষণ পর্যন্ত জাহাজের ভিতরের ঘটনাবলী এমন ভাবে হবে যেন জাহাজটি চলমান নয়। ব্যাপারটা কি করে হয় সে ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন গ্যালিলিও। এ্যারিস্টোটলের শিষ্যরা তাতে খুব অপমানিত বোধ করেছিলেন, বেজায় রেগে গিয়েছিলেন। গ্যালিলিও থেকে আহরিত প্রাচীন পদার্থবিদ্যা অনুসারে 'ঋজুরেখায় সমরূপ গতির কোনো আবিষ্কারযোগ্য অভিক্রিয়া (dishoverable effects) নেই। আজকের দিনে আইনষ্টাইনের আপেক্ষিকতা যে রকম বিস্ময়কর সে সময়ে গ্যালিলিওর আপেক্ষিকতাও (form of relativity) ছিল সেই রকম। বিশিষ্ট অপেক্ষবাদে আইনষ্টাইনের কর্মপ্রচেষ্টা ছিল ইথারের ভিতর দিয়ে সমরূপ গতি দ্বারা কি করে বিদ্যুৎচুম্বকীয় পরিঘটনা অপ্রভাবিত থাকতে পারে সেটা দেখানো : অবশ্য ইথার বলে কিছু যদি থেকে থাকে তাহলে। এ সমস্যা ছিল আরো কঠিন। শুধুমাত্র গ্যালিলিওর নীতির ভিত্তিতে এ এ সমস্যার সমাধান সম্ভব ছিল না।

এ সমাধানে সত্যিকারের কঠিন প্রচেষ্টার প্রয়োজন ছিল কালিক সমস্যা বিষয়ে। প্রয়োজন ছিল বিশিষ্টকাল সম্পর্কীয় ধারণা উপস্থাপন করা। এ বিষয়ে আমরা আগেই আলোচনা করেছি। আর প্রয়োজন ছিল এক ব্রহ্মাণ্ডীয় কাল সম্পর্কীয় প্রাচীন বিশ্বাস পরিত্যাগ করা। বিদ্যুৎচুম্বক পরিঘটনা সম্পর্কিত পরিমাণগত বিধি ম্যাক্সওয়েলের সমীকরণে প্রকাশিত।

দেখা যায় সমস্ত পর্যবেক্ষক সাপেক্ষই এই সমীকরণগুলি সত্য। পর্যবেক্ষকের গতি যে রকমই হোক না—তাতে কিছু এসে যায় না। একজন পর্যবেক্ষকের প্রযুক্ত মাপনের সঙ্গে অন্য একজন পর্যবেক্ষকের প্রযুক্ত মাপনের পার্থক্য থাকবেই। তাদের আপেক্ষিক গতি সত্ত্বেও যদি তারা ঐ সমীকরণগুলির সত্যতা প্রমাণ করতে চায় তাহলে সে পার্থক্য নির্ণয় করা একটি প্রত্যক্ষ গাণিতিক সমস্যা মাত্র। এ সমস্যার উত্তর রয়েছে 'লোরেঞ্জ রূপান্তরে'। এটা একটা সঙ্কেতরূপে আবিস্কার করেছিলেন লোরেঞ্জ (Lorentz) কিন্তু এর ব্যাখ্যা করেছিলেন আইনস্টাইন এবং একে বোধগম্যও করেছিলেন তিনি।

একজন পর্যবেক্ষকের দূরত্ব এবং পরিব্যাপ্তি কাল আমাদের জানা থাকলে যার আপেক্ষিক গতি জানা আছে সেই রকম অন্য একজন পর্যবেক্ষকের প্রথমোক্ত পর্যবেক্ষকের দূরত্ব এবং পরিব্যাপ্তি কাল (period of time) সম্পর্কে সম্ভাব্য অনুমান (estimate) প্রকাশ করেছে লোরেঞ্জ রূপান্তর।

আমরা অনুমান করতে পারি ঠিক পূর্বদিকগামী একটা রেলগাড়ীতে আপনি রয়েছেন। যে ষ্টেশান থেকে আপনার যাত্রা শুরু সেই ষ্টেশনের ঘড়ি অনুসারে আপনার ভ্রমণকাল 't'। লাইনের উপরের লোকেদের মাপন অনুসারে আপনার যাত্রা বিন্দু থেকে x দূরত্বে এই মুহূর্তে একটা ঘটনা ঘটে—ধরুন লাইনে বাজ পড়ল। সব সময়ই আপনি সমরূপ গতি 'v'-তে ভ্রমণ করছিলেন। প্রশ্নটা হল : আপনার বিচারে আপনার থেকে কতটা দূরে ঘটনাটা ঘটেছে বলে মনে হবে এবং রেলগাড়ীতে অবস্থিত একজন পর্যবেক্ষকের দৃষ্টিভঙ্গিতে যদি আপনার ঘড়ি নির্ভুল অনুমান করা হয় তাহলে সেই ঘড়ি অনুসারে আপনার যাত্রা শুরুর কতক্ষণ পর ঘটনাটা ঘটেছে ?

আমরা এই সমস্যার যে সমাধান করব সে সমাধানের কয়েকটি শর্ত পালন করতে হবে। সমাধান ফল এমন হতে হবে যে গতির প্রকার নির্বিশেষে সমস্ত পর্যবেক্ষক সাপেক্ষই আলোকের বেগ অভিন্ন হবে। তাছাড়া বিভিন্ন ভৌত পরিঘটনা বিশেষ করে বিদ্যুৎ চুম্বকীয় পরিঘটনাগুলিকে বিভিন্ন পর্যবেক্ষক সাপেক্ষ একই বিধি মানাতে হবে। তাদের নিজস্ব গতির ফলে তাদের কাল এবং দূরত্ব মাপনে যতই ভিন্নতা প্রদর্শিত হোক না কেন ভৌত পরিঘটনাগুলিকে বিশেষ করে বিদ্যুৎচুম্বকীয় পরিঘটনাগুলিকে একই বিধি মানতে হবে। তাছাড়া মাপনের উপর সেই সমস্ত অভিক্রিয়াকে করতে

হবে পারস্পরিক। অর্থাৎ আপনি যদি ট্রেনে থাকেন এবং আপনার গতি যদি ট্রেনের বাইরের সম্ভাব্য দূরত্ব সম্পর্কে আপনার অনুমানকে প্রভাবিত করে তাহলে যারা ট্রেনের বাইরে আছেন ট্রেনের ভিতরকার সম্ভাব্য দূরত্ব সম্পর্কে তাঁদের অনুমানকেও ঠিক একই রকম প্রভাবিত হতে হবে। এই শর্তগুলি সমস্যার সমাধান নির্দেশ করার পক্ষে যথেষ্ট কিন্তু সমাধানের জন্য যে পরিমাণ গণিত প্রয়োজন এ পুস্তকে নিজেকে সে পরিমাণ গণিত ব্যবহারের অনুমতি আমি দিইনি।

ব্যাপারটা সাধারণ ভাবে আলোচনা করার আগে একটা উদাহরণ বিবেচনা করা যাক। অনুমান করা যাক আপনি দীর্ঘ ঋজুমুখী রেললাইনের উপরে একটা ট্রেনে রয়েছেন এবং আলোকের গতির পাঁচভাগের তিনভাগ গতিতে সঠিক পূর্ব দিকে চলেছেন। অনুমান করুন রেললাইনের দৈর্ঘ্য আপনি মেপেছেন এবং দেখেছেন গাড়ীটা একশ গজ লম্বা। ধরুন—চলার পথে যারা আপনাকে এক পলক দেখতে পেয়েছে এবং তারা পর্যবেক্ষণের দক্ষতাপূর্ণ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির সাহায্যে আপনার গাড়ীর দৈর্ঘ্য গণনা করতে পেরেছে। তাদের গণনা নির্ভুল হলে তারা দেখতে পাবে গাড়ীর দৈর্ঘ্য আশি গজ, তাদের কাছে রেলগাড়ীর গতির অভিমুখে গাড়ীর ভিতরের প্রতিটি জিনিষেরই দৈর্ঘ্য আপনার যা মনে হয় তার চাইতে কম মনে হবে। আপনার দৃষ্টিতে খাবার থালাগুলি সাধারণ বৃত্তাকার কিন্তু বাইরের লোকের দৃষ্টিতে সেগুলোকে মনে হবে ডিম্বাকৃতি। গাড়ীর প্রস্থের অভিমুখের তুলনায় গাড়ীর গতির অভিমুখে থালাগুলি মনে হবে চার পঞ্চমাংশ চওড়া। সমস্তই আবার পারস্পরিক। ধরুন—আপনি জানলা দিয়ে একটা মাছধরার ছিপ দেখতে পাচ্ছেন। যে লোকটি নিয়ে চলেছে সে দেখেছে ছিপটা পনের গজ লম্বা। সেটা যদি খাড়া ভাবে (held upright) নেয়া হয় তাহলে আপনি দেখবেন ওটা পনের ফুট লম্বা। ছিপটাকে যদি অনুভূমিক-ভাবে এবং রেললাইনের সঙ্গে সমকোণে বহন করা হয় (carried horizontally) তাহলেও ওটা পনের ফুট লম্বাই মনে হবে। কিন্তু রেললাইনের অভিমুখী হলে মনে হবে ছিপটা মোটে বারো ফুট লম্বা। যা দেখা যাচ্ছে তার বিবরণ দেবার সময় আমি অনুমান করেছি প্রত্যেকেই দর্শনানুপাতের সমুচিত বিচার করেছেন (due allowance for perspective)। তা সত্ত্বেও বাইরের লোকের বিচারে রেলগাড়ীর প্রত্যেক

জিনিষের দৈর্ঘ্যই গতির অভিমুখে শতকরা কুড়িভাগ কমবে। রেলগাড়ীতে আপনার বিচারেও বাইরের জিনিষগুলির একই অবস্থা হবে।

কিন্তু সময় সাপেক্ষ ক্রিয়াগুলি হবে আরও অদ্ভূত।

এ ব্যাপারটা প্রায় আদর্শ প্রাঞ্জলতার সঙ্গে ব্যাখ্যা করেছিলেন এডিংটন। আমার উদাহরণের ভিত্তি তাঁরই একটা উদাহরণ ঃ

এমন একটা মহাকাশযান কল্পনা করুন যেটা প্রতি সেকেণ্ডে পৃথিবী থেকে ১৫৬০০০ মাইল দূরে অপসৃত হচ্ছে। যদি আপনি মহাকাশযানের ভিতরকার মানুষদের পর্যবেক্ষণ করতে পারতেন তাহলে আপনার সিদ্ধান্ত হোত ওদের চলন অস্বাভাবিক মন্থর। মহাকাশযানের অন্যান্য ঘটনার গতিও একই রকম মন্থর মনে হোত। মনে হোত সেখানে সংগঠিত সমস্ত ঘটনাই সাধারণের চাইতে দ্বিগুণ সময় নিয়েছে। সিদ্ধান্ত (infer) কথাটা আমি বিশেষ বিবেচনা করেই ব্যবহার করেছি। আপনি কালের আরও অনেক বেশী মন্থরগতি লক্ষ্য করবেন। ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করা কিন্তু সহজ। কারণ আপনার কাছ থেকে মহাকাশযানের দূরত্ব দ্রুত বাড়ছে এবং আলোকবাহিত অনুভূতি (light impression) আপনার কাছে পৌঁছাতে বেশী বেশী সময় নিচ্ছে। আলোক প্রেরণের সময় বিচারের পর যা অবশিষ্ট থাকে সেটাই এর আগে স্বল্পতর মন্থরতারূপে উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু এখানেও পারস্পরিক ক্রিয়ার (reciprocity) প্রশ্ন আসে। মহাকাশযানের যাত্রীদের দৃষ্টিভঙ্গিতে আপনি তাদের কাছ থেকে সেকেণ্ডে ১৫৬০০০ মাইল দূরে অপসৃত হচ্ছেন এবং সব দিক হিসাব করার পর তারা দেখছে আপনিই মন্থর।

সময়ের এই প্রশ্নটা জটিল। তার কারণ যে সমস্ত ঘটনা একজনের বিচারে যুগপৎ অন্যের বিচারে সেগুলি কালিক ব্যবধান দিয়ে বিচ্ছিন্ন। সময় কি করে প্রভাবিত হয় সে তথ্য স্পষ্ট করার জন্য আমি আলোকের বেগের পাঁচ ভাগের তিন ভাগ বেগে সঠিক পূর্ব দিকগামী রেলগাড়ীর প্রসঙ্গে ফিরে যাব। উদাহরণ দেবার স্বার্থে আমি অনুমান করব পৃথিবীটা বড় এবং চ্যাপ্টা—ছোট এবং গোলকাকৃতি নয়।

আমরা যদি পৃথিবীর একটি স্থির বিন্দুতে সংঘটিত একাধিক ঘটনা বিচার করি এবং নিজেদের প্রশ্ন করি ঘটনা সুরু করার কতক্ষণ পর যাত্রীরা সেগুলি বুঝতে পারবে তাহলে তার উত্তর হবে : এডিংটন উল্লি-

খিত মন্থরতা এক্ষেত্রে থাকবে। অর্থাৎ মাটিতে যারা রয়েছেন তাদের কাছে যে কাল একঘণ্টা মনে হবে, রেলগাড়ী থেকে যারা পর্যবেক্ষণ করছেন তাঁদের বিচারে সে কাল মনে হবে সোয়া একঘণ্টা এবং ব্যাপারটা হবে পারস্পারিক। পারস্পরিকভাবে ট্রেনের লোকের জীবনে যে কাল এক-ঘণ্টা মনে হবে বাইরের লোক পর্যবেক্ষণ করলে তাদের বিচারে মনে হবে সে কাল সোয়া একঘণ্টা। প্রত্যেকেই অপরের জীবনের কালকে সে জীবন যারা যাপন করছে তাদের তুলনায় এক-চতুর্থাংশ বাড়িয়ে দেখে। কালের ক্ষেত্রের মত দৈর্ঘ্যের ক্ষেত্রেও অনুপাত একই।

কিন্তু পৃথিবীর একই স্থানের বিভিন্ন ঘটনার ভিতরে তুলনা না করে বিরাট দূরত্ব দ্বারা বিচ্ছিন্ন ঘটনাবলী তুলনা করলে ফল হয় আরও অদ্ভুত। এবার রেললাইন বরাবর সমস্ত ঘটনা বিচার করা যাক। পৃথিবীতে যাঁরা স্থিরাবস্থায় রয়েছেন তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে ঘটনাগুলি ঘটছে একটি বিশেষ মুহূর্তে—ধরুন যে মুহূর্তে রেলগাড়ীটা একটা বিশেষ সিগন্যাল অতি-ক্রম করছে। এই ঘটনাগুলির ভিতরে যেগুলির ঘটনাস্থল রেলগাড়ীর গতির অভিমুখে কোনো বিন্দুতে—যাত্রীদের মনে হবে সে ঘটনাগুলি আগেই ঘটে গিয়েছে। আবার যেগুলির ঘটনাস্থল রেলগাড়ীর পিছনে সে ঘটনাগুলিকে তখনো ভবিষ্যতের গর্ভে মনে হবে। যখন আমি বলছি মনে হবে সম্মুখের ঘটনাগুলি আগেই ঘটেছে তখন কিন্তু আমার বক্তব্য সম্পূর্ণ নির্ভুল নয়। কারণ ঘটনা গুলি তারা তখনো দেখেনি। ঘটনা-গুলি যখন তারা দেখবে তখন আলোকের গতিবেগ হিসাব করে তাদের সিদ্ধান্ত হবে এই ঘটনাগুলি নিশ্চয়ই ঘটেছে আলোচ্য মুহূর্তের আগে। যে ঘটনা রেললাইন বরাবর সম্মুখ অভিমুখে ঘটে এবং স্থির পর্যবেক্ষক-দের বিচারে বর্তমান মুহূর্তে ঘটে [কিংবা যখন তারা জানতে পারে তখন তাদের বিচারে বর্তমান মুহূর্ত (now) হয়] এবং যদি রেললাইন বরাবর এতটা দূরত্বে ঘটে থাকে যে দূরত্ব অতিক্রম করতে আলোকের এক সেকেন্ড লাগে তাহলে যাত্রীরা ভাববে ঘটনাটি ঘটেছে এক সেকেন্ডের তিন-চতুর্থাংশ ভাগ আগে। ঘটনাটি যদি এমন দূরত্বে ঘটে আলোকের যে দূরত্ব অতিক্রম করতে পৃথিবীর লোকের বিচারে একবছর লাগে তাহলে যাত্রীদের বিচারে (তারা যখন ঘটনাটি জানতে পারবে) ঘটনাটি ঘটেছে তারা পৃথিবীবাসীদের যে মুহূর্তে অতিক্রম করেছে তার নয় মাস আগে।

এবং সাধারণভাবে, তাদের নিজেদের কাছ থেকে, যে পৃথিবীবাসীদের তারা যেই মুহূর্তে অতিক্রম করছে তাদের কাছে আলোকের পৌঁছাতে যে সময় লাগে রেললাইন বরাবর সম্মুখবর্তী স্থানে সংঘটিত ঘটনাবলীকে তারা তার তিন-চতুর্থাংশ পূর্ববর্তী কালাঙ্ক আরোপ করবে। পৃথিবীবাসীরা কিন্তু বিশ্বাস করবে ঘটনাটি ঘটছে এখনি কিংবা তারা বরং বিশ্বাস করবে ঘটছে এখুনি অর্থাৎ ঘটনাস্থল থেকে আলোক যখন তাদের কাছে পৌঁচ্ছছে তখন। রেলগাড়ীর পশ্চাতে রেললাইনে সংঘটিত ঘটনাগুলিকে নির্ভুল একই পরিমানে পরবর্তী কালাঙ্ক দেয়া হবে (post dated)।

সুতরাং পার্থিব পর্যবেক্ষকদের কাছ থেকে যাত্রীদের কাছে উত্তরণের জন্য কালাঙ্কের দু'রকম সংশোধন আমাদের করতে হবে। প্রথমে আমাদের নিতে হবে পৃথিবীবাসীদের গণনার পাঁচ চতুর্থাংশ (five-fourths)। তারপর তা থেকে আমাদের বাদ দিতে হবে আলোচ্য ঘটনা থেকে আলোকের পৃথিবীবাসীদের কাছে আসতে যে কাল লাগে তার তিন চতুর্থাংশ।

দূরে মহাবিশ্বে সংঘটিত একটি ঘটনা বিচার করুন। পৃথিবীবাসীরা এবং যাত্রীরা যখন পরস্পরকে অতিক্রম করছে ঘটনাটা দৃষ্ট-হচ্ছে ঠিক সেই সময়। ঘটনাটা কতদূরে ঘটেছিল সেটা যদি পৃথিবীবাসীদের জানা থাকে তাহলে তারা বিচার করতে পারে ব্যাপারটা কতক্ষণ আগে ঘটেছিল। তার কারণ আলোকের গতিবেগ তাদের জানা। ঘটনাটা যদি যাত্রীদের গতির অভিমুখে ঘটে থাকে তাহলে যাত্রীদের সিদ্ধান্ত হবে পৃথিবীবাসীরা যা ভেবেছে তার দিগুণ আগে ঘটনাটা ঘটেছিল। কিন্তু যাত্রীরা যেদিক থেকে আসছে ঘটনাটা সেদিকে ঘটে থাকলে তারা বলবেন পৃথিবীবাসীরা যা ভেবেছেন ঘটনাটা ঘটেছে তার অর্দ্ধেক সময় আগে। যাত্রীদের দ্রুতি ভিন্ন হলে এই অনুপাতগুলিও ভিন্ন হবে।

অনুমান করা যাক দু'টি তারকা হঠাৎ জ্বলে উঠেছে (মাঝে মাঝে এরকম ঘটে) এবং যাত্রীরা যখন পৃথিবীবাসীদের অতিক্রম করছিল তখন দু'পক্ষই সেটা দেখতে পেয়েছে। একটি হোক রেলগাড়ী যেদিকে চলেছে সেদিকে এবং অন্যটি হোক রেলগাড়ী যেদিক থেকে আসছে সেদিকে। অনুমান করা যাক পৃথিবীবাসীরা কোনো উপায়ে দু'টি তারকার দূরত্ব নির্দ্ধারণ করতে পেরেছে এবং তারা সিদ্ধান্ত করেছে যেদিকে যাত্রীরা চলেছে সেদিককার তারকা থেকে তাদের কাছে আলো পৌঁছাতে পঞ্চাশ বছর

লাগে এবং অন্য তারকা থেকে তাদের কাছে আসতে আলোকের লাগে একশ' বছর। তখন পৃথিবীবাসীদের যুক্তি হবে: যে বিস্ফোরণের ফলে সামনের তারকাটির জন্ম হয়েছে সেটা ঘটেছে পঞ্চাশ বছর আগে, আর যে বিস্ফোরণের ফলে অন্য নূতন তারকাটি জন্মেছে সেটা ঘটেছে একশ' বছর আগে। যাত্রীরা কিন্তু এ অঙ্ক উল্টে দেবে : তাদের সিদ্ধান্ত হবে সম্মুখের বিস্ফোরণ হয়েছে একশ' বছর আগে আর পঞ্চাশ বছর আগে হয়েছে পিছনের বিস্ফোরণ। আমি ধরে নিচ্ছি উভয় পক্ষের যুক্তিই নির্ভুল এবং সে যুক্তির ভিত্তি নির্ভুল ভৌত উপাত্ত (data)। আসলে উভয় পক্ষই নির্ভুল; অবশ্য যদি তারা মনে না করে যে অন্য পক্ষ নিশ্চয়ই ভুল করেছে। এটা মনে রাখতে হবে যে আলোর বেগ সম্পর্কে অনুমান (estimate) উভয় পক্ষের একই ছিল। তার কারণ বিস্ফোরণের পর সময় সম্পর্কে তাদের অনুমানের পরিবর্তন এবং দু'টি তারকার দূরত্ব সম্পর্কে তাদের অনুমানের পরিবর্তন হবে একেবারে আনুপাতিক। আসলে সম্পূর্ণ তত্ত্বটার একটা প্রধান উদ্দেশ্য হল, পর্যবেক্ষকের নিজস্ব গতি নির্বিশেষে সমস্ত পর্যবেক্ষক সাপেক্ষই আলোকের বেগ অভিন্ন, এই তথ্য প্রতিষ্ঠা করা। বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাদ্বারা প্রমাণিত এই তথ্যের সঙ্গে প্রাচীন তত্ত্বের সংগতি ছিল না এবং চরম প্রয়োজন ছিল চমকপ্রদ একটা কিছু মেনে নেয়ার। অপেক্ষবাদ ঘটনার সঙ্গে যতটা সঙ্গতিপূর্ণ ঠিক ততটাই চমকপ্রদ। আসলে কিছুদিন পর এ তত্ত্বকে মোটেই আর চমকপ্রদ মনে হয় না।

আমাদের আলোচ্য তত্ত্বের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আর একটি অবয়ব রয়েছে। সেটা হল : যদিও ভিন্ন ভিন্ন পর্যবেক্ষক সাপেক্ষ দূরত্ব এবং কাল (time) পরিবর্তিত হয় তবুও আমরা সেগুলি থেকে অন্তর (interval) নামক একটি পরিমাণ (quantity) আহরণ করতে পারি। সে পরিমাণ প্রতিটি পর্যবেক্ষক সাপেক্ষ অভিন্ন। বিশিষ্ট অপেক্ষবাদে 'অন্তর' পাওয়া যায় নিম্নলিখিত উপায়ে : দুটি ঘটনার অন্তর্বর্তী দূরত্বের বর্গ (square) হিসাব করুন এবং দু'টি ঘটনার অন্তর্বর্তী কালে আলোক যে দূরত্ব অতিক্রম করে তার বর্গ হিসাব করুন। দু'টির ভিতরে বৃহত্তর থেকে ক্ষুদ্রতরটি বিয়োগ করুন। বিয়োগ ফল ঘটনাগুলির অন্তরের বর্গ বলে সংজ্ঞিত (difined)। অন্তর সমস্ত পর্যবেক্ষক সাপেক্ষ অভিন্ন এবং দু'টি ঘটনার একটি ভৌত সম্পর্কের আসল প্রতিরূপ। স্থান এবং কাল কিন্তু

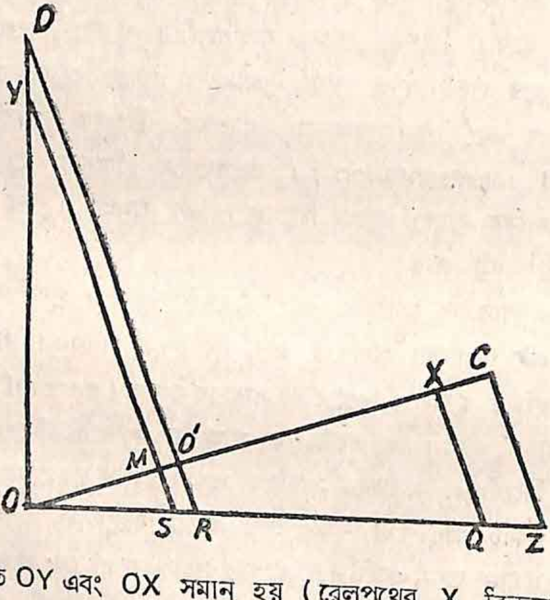
সে রকম প্রতিরূপ নয়। চতুর্থ অধ্যায়ের শেষে অন্তরের একটি জ্যামিতিক গঠন আমরা দিয়েছি। ঐ গঠন উপরে লিখিত নিয়মের মত একই ফল প্রদান করে। একটি ঘটনাস্থল থেকে অন্য ঘটনাস্থলে যেতে আলোকের যে কাল প্রয়োজন, দু'টি ঘটনার অন্তর্বর্তী কাল যখন তার চাইতে দীর্ঘ, অন্তর তখন কালানুরূপ। বিপরীত ক্ষেত্রে অন্তর স্থানানুরূপ। যখন দুটি ঘটনার অন্তর্বর্তীকাল এবং আলোকের একস্থান থেকে অন্য স্থানে গমনকাল নির্ভুল অভিন্ন, অন্তর তখন শূন্য (zero) তখন ঘটনা দুটি একই আলোক রশ্মির বিভিন্ন অংশে অবস্থিত। অবশ্য ঐ পথে গমনশীল কোনো আলোক রশ্মি যদি না থাকে।

ব্যাপক অপেক্ষবাদে এসে আমাদের অন্তর সম্পর্কীয় ধারণার সাধারণীকরণ করতে হবে। বিশ্বের গঠনের যত গভীরে আমরা প্রবেশ করি এই কল্পনের গুরুত্ব ততই বৃদ্ধি পায়। আমাদের বলতে আকাঙ্খা হয় এটাই বাস্তব। দূরত্ব এবং ব্যাপ্তিকাল সে বাস্তবের বিভ্রান্ত প্রতিরূপ মাত্র (confused representation)। অপেক্ষবাদ বিশ্বের মূলগত গঠন সম্পর্কে আমাদের ধারণা বদলে দিয়েছে। এই জন্যই এ তত্ব দুরূহ, এ তত্বের গুরুত্বও এই জন্য।

যে সমস্ত পাঠকের জ্যামিতি এবং বীজগণিতের সঙ্গে প্রাথমিক পরিচয়ও নেই তাঁরা এই অধ্যায়ের অবশিষ্ট অংশ বাদ দিতে পারেন। যাঁদের শিক্ষা একদম অবহেলিত হয়নি তাদের জন্য সাধারণ সঙ্কেত (general formula) খানিকটা ব্যাখ্যা করব। এ পর্যন্ত সে সঙ্কেতের কয়েকটি বিশেষ উদাহরণ মাত্র আমি দিয়েছি। আলোচ্য সাধারণ সঙ্কেতের নাম লোরেনজ রূপান্তর। এর বক্তব্য : একটি বস্তুপিণ্ড যখন অন্য একটি বস্তুপিণ্ড সাপেক্ষ নির্দিষ্ট প্রণালীতে চলমান তখন একটি বস্তুপিণ্ডের সঠিক দৈর্ঘ্য এবং কালের ভিত্তিতে কি করে অন্য বস্তুপিণ্ডের সঠিক দৈর্ঘ্য এবং কাল নির্ণয় করা যায়। বীজগণিতের সঙ্কেত দেবার আগে আমি একটি জ্যামিতিক গঠন উপস্থিত করব। আগের মতই আমি দু'জন পর্যবেক্ষক অনুমান করব তাদের নাম আমরা দেব O এবং O'। এদের একজন পৃথিবীতে স্থিতিশীল এবং অন্যজন একটি ঋজুরেলপথে সমরূপ গতিতে চলমান। বিচার্যকালের শুরুতে দু'জন পর্যবেক্ষকেরই অবস্থান ছিল রেলপথের একটি বিন্দুতে ; কিন্তু এখন তারা খানিকটা দূরত্বে বিচ্ছিন্ন। রেলপথের X বিন্দুতে একটি বাজ পড়েছে।

O-এর বিচারে বাজ পড়ার মুহূর্তে রেলগাড়ীর পর্যবেক্ষক O′ বিন্দুতে পেঁছেছে। সমস্যা হল : বিদ্যুতের চমক থেকে O′-এর দূরত্ব কত এবং O′-এর বিচারে যাত্রা শুরু হবার (যখন O এবং O′ একসঙ্গে ছিল) কতক্ষণ পর ঘটনাটা ঘটেছিল O-এর অনুমান (estimate) আমাদের জানবার কথা এবং আমরা O′-এর অনুমান গণনা করতে চাই।

O-এর বিচারে যাত্রারম্ভের পর যে কাল অতিক্রান্ত হয়েছে সেই কালে রেলপথ বরাবর আলোক যে দূরত্ব অতিক্রম করত OC হোক সেই দূরত্ব। O কে কেন্দ্র করে OC কে ব্যাসার্দ্ধ নিয়ে একটি বৃত্ত অঙ্কন করুন। O′ এর ভিতর দিয়ে রেলপথের উপর একটি লম্ব আঁকুন। লম্বটি D বিন্দুতে বৃত্তের সঙ্গে মিলিত হোক। OD এর উপরে এমন একটি বিন্দু



Y নিন যাতে OY এবং OX সমান হয় (রেলপথের X বিন্দুতে বজ্রাঘাত হয়েছে)। রেলপথের উপর YM লম্ব আঁকুন এবং OD এর উপর OS লম্ব আঁকুন। YM এবং OS S বিন্দুতে মিলিত হোক। DO′ এবং OS কে বাড়িয়ে R বিন্দুতে মিলিত করা হোক। X এবং C এর ভিতর দিয়ে রেলপথের উপর লম্ব আঁকুন। OSকে বাড়িয়ে দিন। লম্ব দুইটি বাড়িয়ে দেয়া OS এর সঙ্গে Q এবং Z বিন্দুতে মিলিত হোক। তাহলে O′ এর বিচারে O′ থেকে বজ্রপাতের দূরত্ব (O এর মাপন অনুসারে) RQ। প্রাচীন ধারণা

অনুসারে দূরত্ব হওয়া উচিত ছিল O X। যেমন O ভাবছে যাত্রারম্ভ থেকে বজ্রপাত পর্যন্ত কালে আলোক OC দূরত্ব অতিক্রম করত। O' ভাবছে এই অতিক্রান্ত সময় এবং আলোকের SZ দূরত্ব (O এর মাপন অনুসারে) অতিক্রম করার সময় একই। O এর মাপনানুযায়ী অন্তর পাওয়া গিয়েছে OC এর উপর অঙ্কিত সমচতুর্ভূর্জ (square) থেকে OX এর উপর অঙ্কিত সমচতুর্ভূর্জ বিয়োগ করে। O' এর মাপনানুযায়ী অন্তর পাওয়া গিয়েছে SZ এর উপর অঙ্কিত সমচতুর্ভূর্জ থেকে RQ এর উপর অঙ্কিত সমচতুর্ভূর্জ বিয়োগ করে। সামান্য প্রাথমিক জ্যামিতি থেকে বোঝা যায় এ দুটি সমান।

উপরের গঠনক্রিয়ার অঙ্গীভূত (embodied) বীজগণিত সঙ্কেত নিম্নরূপ : O এর দৃষ্টিভঙ্গি থেকে রেলপথ বরাবর X দূরত্বে এবং যাত্রা শুরু করার পর (যখন O' ছিল O এতে) T কাল বাদে একটি ঘটনা ঘটুক। O' এর দৃষ্টিভঙ্গিতে রেলপথ বরাবর X' দূরত্বে, যাত্রারম্ভের পর T' কাল বাদে একই ঘটনা ঘটুক।

আলোকের বেগ হোক C এবং O সাপেক্ষ O' এর বেগ হোক V। স্থাপন করুন—

$$\beta = \frac{c}{\sqrt{c^2 - v^2}}$$

তাহলে

$$x' = \beta (x - vt)$$
$$t' = \beta \left(t \frac{vx}{c^2} \right)$$

এটাই লোরেন্‌জ রূপান্তর। এ থেকেই এ অধ্যায়ের সব কিছু উপপাদন সম্ভব।

সপ্তম অধ্যায়

স্থান-কাল অন্তর (Intervals in space-time)

এতক্ষণ আমরা বিচার করেছি বিশিষ্ট অপেক্ষবাদ। এ তত্ত্ব সম্পূর্ণ সমাধান করেছে নির্দিষ্ট নিশ্চিত বিশেষ একটি সমস্যা : দুটি বস্তুপিণ্ড যখন পরস্পর সাপেক্ষ সমরূপ আপেক্ষিক গতিসম্পন্ন তখন সাধারণ গতি-বিদ্যা সংশ্লিষ্ট কিংবা বিদ্যুৎ ও চুম্বক সংশ্লিষ্ট পদার্থবিদ্যার সমস্তবিধি দুটি বস্তুপিণ্ডেই নির্ভুলভাবে অভিন্ন—পরীক্ষামূলক এই তথ্যের কারণ। এ ক্ষেত্রে 'সমরূপ, (uniform) গতির অর্থ সুষম (constant) ঋজুরেখ গতি। কিন্তু বিশিষ্ট তত্ত্ব একটি সমস্যার সমাধান করার সঙ্গে সঙ্গেই অন্য সমস্যার আভাস দেখা দিল। দুটি বস্তুপিণ্ডের গতি যদি সমরূপ না হয়? উদাহরণ : ধরুন একটি বস্তুপিণ্ড পৃথিবী এবং অন্যটি পতনশীল প্রস্তর। প্রস্তরের গতি ত্বরিত (accelerated) অর্থাৎ এর পতনের গতি নিয়ত বর্দ্ধমান। বিশিষ্ট অপেক্ষবাদে এমন কিছু নেই যার সাহায্যে আমরা বলতে পারি পাথরে অবস্থিত পর্যবেক্ষক এবং পৃথিবীতে অবস্থিত পর্যবেক্ষক সাপেক্ষ ভৌত পরিঘটনার বিধিগুলি অভিন্ন হবে। ব্যাপারটা আরও বেশী জটিল এইজন্য যে, বিস্তৃত অর্থে পৃথিবীটাই একটি পতন-শীল বস্তুপিণ্ড : প্রতিমুহূর্তেই এর সূর্যের অভিমুখে ত্বরিত গতি রয়েছে। এই গতির ফলেই পৃথিবী ঋজুরেখায় না গিয়ে সূর্যের চারপাশে আবর্তিত হয়। পৃথিবীভিত্তিক পরীক্ষা থেকে আমাদের পদার্থবিদ্যার জ্ঞান আহরিত সেইজন্য যে তত্ত্বে অনুমান করা হয় পর্যবেক্ষকের কোনো ত্বরণ নেই সে তত্ত্ব আমাদের সুতৃপ্ত করতে পারে না। ব্যাপক অপেক্ষবাদ এই বাধা দূর করেছে এবং এ তত্ত্ব পর্যবেক্ষকের ঋজু, বঙ্কিম, সমরূপ কিংবা ত্বরিত যে কোনোরকম গতিই অনুমোদন করে। এই বাধা দূর করতে গিয়ে আইনস্টাইন তাঁর নূতন মহাকর্ষীয় বিধিসৃষ্টির দিকে অগ্রসর হয়েছেন। সে বিধি সম্পর্কে আলোচনাও আমরা অচিরে করব। কাজটা ছিল

---

১) শুধু দ্রুতির (speed) বৃদ্ধিই নয়। গতি কিংবা অভিমুখের যে কোনো পরিবর্তনকেও ত্বরণ (acceleration) বলা হয়। একমাত্র স্থির দ্রুতিতে ঋজুরেখ গতিকেই অত্বরিত (unaccelerated) গতি বলা হয়।

অসাধারণ শক্ত। এ কাজে তাঁর দশ বছর লেগেছে। বিশিষ্ট অপেক্ষবাদের শুরু ১৯05 সালে, আর ১৯১৫ সালে শুরু হয়েছে ব্যাপক অপেক্ষবাদ।

সমরূপ গতির তুলনায় ত্বরিত গতি বিচার অনেক বেশী কঠিন। আমাদের সবার অভিজ্ঞতাতেই এ তথ্য স্বতঃপ্রতীয়মান। স্থির গতিতে চলমান একটি রেলগাড়ীতে যাবার সময় জানলা দিয়ে বাইরে না তাকানো পর্যন্ত গতি বোঝা যায় না। কিন্তু হঠাৎ ব্রেক কষলে আপনি সামনের দিকে হুমড়ি খেয়ে পড়েন। তখন বাইরের দিকে না তাকিয়েও আপনি বুঝতে পারেন একটা কিছু ঘটছে। লিফটেও তেমনি। যতক্ষণ পর্যন্ত লিফ্‌টটা সমরূপে চলমান থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত ব্যাপারটা মনে হয় স্বাভাবিক কিন্তু শুরুর সময় আর থামবার সময় পেটের ভিতরটা যেন কেমন করে ওঠে। [দ্রুততর হওয়া এবং ধীরতর হওয়া এই দু ক্ষেত্রেই আমরা গতিকে 'ত্বরিত' (accelerated) বলি। ধীরতর হবার সময় ত্বরণ অপরা (negative)] জাহাজের কেবিনে একটা ওজন পরিত্যাগ করার ক্ষেত্রেও একই তথ্য প্রযোজ্য। যতক্ষণ পর্যন্ত জাহাজের গতি সমরূপ ততক্ষণ পর্যন্ত কেবিন সাপেক্ষ ওজনটার আচরণ এমন হবে যেন জাহাজটা স্থিরভাবে রয়েছে। ওজনটা যদি ছাতের মাঝখান থেকে পড়তে শুরু করে তাহলে সেটা পড়বে ঠিক মেঝের মাঝখানে। কিন্তু ত্বরণ থাকলে সবটাই বদলে যায়। জাহাজের গতি যদি দ্রুত বাড়তে থাকে তাহলে কেবিনের পর্যবেক্ষকের মনে হবে ওজনটা বক্রগতিতে পড়ছে; বক্রতার অভিমুখ জাহাজের পিছন দিকে। জাহাজের গতি যদি দ্রুত হ্রাস পেতে থাকে তাহলে বক্রতার অভিমুখ হবে জাহাজের সামনের দিকে। এ সব তথ্যই পরিচিত। এই জন্যই গ্যালিলিও এবং নিউটন ত্বরিতগতির নিজস্ব চরিত্রকে সমরূপ গতির চাইতে সম্পূর্ণ পৃথক বলে বিচার করেছিলেন। কিন্তু গতিকে আপেক্ষিক না ভেবে পরম (absolute) ভাবলেই শুধুমাত্র এ পার্থক্য রক্ষা করা যায়। সমস্ত গতিই যদি আপেক্ষিক হয় তাহলে পৃথিবী সাপেক্ষ লিফ্‌টটা যে রকম ত্বরিত, লিফ্‌ট সাপেক্ষ পৃথিবীটাও তেমনি ত্বরিত। তবুও মাটিতে যারা রয়েছে লিফট্‌টা উপরে উঠবার সময় তাদের পেটে কোনো অনুভূতি হয়না। আমদের সমস্যাটা কত কঠিন এ তথ্য তার একটা দৃষ্টান্ত। আসলে আধুনিক যুগের খুব কম পদার্থবিদ্যাবিদই

পরম গতিতে বিশ্বাস করতেন, কিন্তু এ বিষয়ে নিউটনের বিশ্বাস গাণিতিক পদার্থবিদ্যার প্রযুক্তির অঙ্গীভূত ছিল। এবং এ অনুমান থেকে মুক্ত একটি প্রযুক্তিবিদ্যা পেতে হলে প্রয়োজন ছিল একটা পদ্ধতিগত বিপ্লব। এই বিপ্লব সুসম্পন্ন হয়েছে আইনস্টাইনের ব্যাপক অপেক্ষবাদে।

আইনস্টাইন যে নূতন ধারণাগুলি উপস্থিত করেছিলেন সেগুলির ব্যাখ্যা কোথা থেকে শুরু করব সেটা অনেকখানি নির্ভর করে আমাদের ইচ্ছার উপর, কিন্তু আমাদের পক্ষে বোধহয় সবচাইতে ভাল হবে 'অন্তর' (interval) সম্পর্কীয় কল্পন দিয়ে শুরু করা। এ কল্পন বিশিষ্ট অপেক্ষবাদে যেভাবে উপস্থাপিত হয়েছে সেটা আসলে স্থানিক এবং কালিক দূরত্ব সম্পর্কীয় চিরায়ত চিন্তনের সাধারণীকরণ, কিন্তু এ সাধারণীকরণের আরও বিস্তার প্রয়োজন। যাই হোক—প্রথম আমাদের দরকার খানিকটা ইতিহাস ব্যাখ্যা করা। সেইজন্য আমাদের প্রয়োজন অতীতে পিথাগোরাস (pythagyras) পর্যন্ত যাওয়া।

ইতিহাসের বহু চরিত্রের মত পিথাগোরাস নামে কোনো লোকের অস্তিত্ব হয়ত ছিল না। স্ত্রীই হোন আর পুরুষই হোন পিথাগোরাস একটি অর্ধ পৌরাণিক চরিত্র। তিনি গণিতশাস্ত্র এবং পৌরোহিত্যবিদ্যা এক অনিশ্চিত অনুপাতে মিশিয়েছিলেন। যাই হোক—আমি অনুমান করব পিথাগোরাস নামক ব্যক্তির অস্তিত্ব ছিল এবং তাঁর নামে প্রচলিত উপপাদ্য ঐ নামের কেউ আবিষ্কার করেছিলেন। পিথাগোরাস মোটামুটি কনফুসিয়াস এবং বুদ্ধের সমসাময়িক। তিনি একটি ধর্মসম্প্রদায় স্থাপন করেছিলেন। সে সম্প্রদায়ের ধারণা ছিল সিম খাওয়া মহাপাপ। তাছাড়া তিনি একটি গাণিতিক গোষ্ঠী স্থাপন করেছিলেন। সমকোণী ত্রিভুজে ছিল তাদের বিশেষ আকর্ষণ। পিথাগোরাসের উপপাদ্য-এর (ইউক্লিডের ৪৭ তম প্রতিজ্ঞা) বক্তব্য : একটি সমকোণী ত্রিভুজের দুটি ক্ষুদ্রতর বাহুর বর্গের যোগফল সমকোণের বিপরীত বাহুর বর্গের তুল্য (equal—সমান)। সমগ্র গণিতশাস্ত্রে কোনো প্রতিজ্ঞার (proposition) ইতিহাসই এরকম গৌরবান্বিত নয়। তরুণ বয়সে আমরা সবাই এ প্রতিজ্ঞা 'প্রমাণ' করতে শিখেছি। সে 'প্রমাণ' কিছুই 'প্রমাণ' করেনি সে কথা সত্য। প্রমাণের একমাত্র পথ পরীক্ষা। তাছাড়া ঘটনা হল, প্রতিজ্ঞাটা সম্পূর্ণ সত্য নয়—আসন্ন (approximate) সত্য মাত্র। কিন্তু সম্পূর্ণ জ্যামিতি এবং

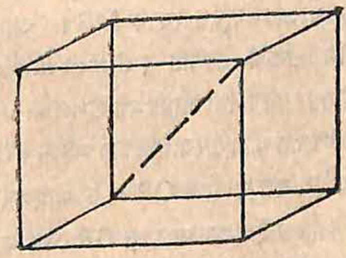
পরবর্তীকালে পদার্থবিদ্যা, পারস্পরিক সাধারণীকরণের সাহায্যে এই প্রতিজ্ঞা থেকে আহরণ করা হয়েছে। এগুলির একটি হল ব্যাপক অপেক্ষবাদ।

যতদূর সম্ভব পিথাগোরাসের উপপাদ্য স্বতঃত মিশরীয়দের কার্যক্ষেত্রে চালিত একটি নিয়মের (rule of thumb) সাধারণীকরণ। মিশরে বহুদিন ধরে জানা ছিল : যে ত্রিভূজের বাহু দৈর্ঘ্যে ৩, ৪ এবং ৫ একক সে ত্রিভূজ সমকোণী। মিশরীয়রা ব্যবহারিক কার্যক্ষেত্র মাপার জন্য এই জ্ঞান প্রয়োগ করতেন। ত্রিভূজের বাহুগুলি যদি ৩, ৪ এবং ৫ ইঞ্চি হয় তাহলে সে-গুলির উপরের বর্গের বর্গফল হবে যথাক্রমে ৯, ১৬ এবং ২৫ বর্গইঞ্চি এবং ৯ এবং ১৬ যোগ দিলে হয় ২৫। লিখবার সময় তিনের তিনগুণ $৩^২$, চারের চারগুণ ৪^2, পাঁচের পাঁচগুণ ৫^2, সুতরাং আমরা পাই :

$$৩^2 + ৪^2 = ৫^2$$

অনুমান করা হয় :—যে ত্রিভুজের বাহুগুলি ৩, ৪ এবং ৫—সে ত্রিভুজে একটি সমকোণ থাকে এ তথ্য পিথাগোরাস মিশরীয়দের কাছ থেকে শিখেছিলেন এবং তারপর ব্যাপারটা লক্ষ্য করেছিলেন। পিথাগোরাস দেখলেন এ তথ্যের সাধারণীকরণ সম্ভব এবং এইভাবে এলেন তাঁর বিখ্যাত উপপাদ্যে : একটি সমকোণী ত্রিভুজে, সমকোণের বিপরীত বাহুর উপরে গঠিত সমচতুর্ভুজ অন্য দু'টি বাহুর উপরে গঠিত সমচতুর্ভুজের যোগফলের সমান।

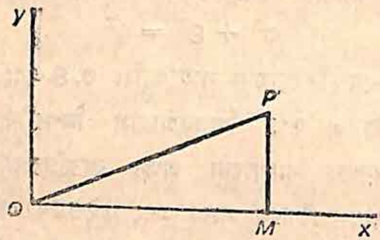
ত্রিমাত্রিকও ব্যাপারটা একই : যদি একটি সমকোণী কঠিন ঘনক বিচার করেন তাহলে কর্ণের (Diagonal) উপরের সমচতুর্ভুজ (চিত্রের বিচ্ছিন্ন রেখা) এবং তিনটি পার্শ্বের উপরের সমচতুর্ভুজের যোগফল সমান।



এ ব্যাপারে প্রাচীনেরা এই পর্যন্ত পেঁছেছিলেন।

এর পরের গুরুত্বপূর্ণ ধাপ এসেছে দেকার্তের (Descartes) কাছ থেকে।

পিথাগোরাসের উপপাদ্যকে তিনি তাঁর বৈশ্লেষিক জ্যামিতিক পদ্ধতির ভিত্তি করেছিলেন। ধরুন আপনি সুসম্বন্ধভাবে (systematically) একটি সমতলের সর্বস্থানের মানচিত্র আঁকতে চান। আমরা ধরে নেব জায়গাটা এত ছোট যে পৃথিবীর বর্তুলাকৃতি অগ্রাহ্য করা সম্ভব। আমরা অনুমান করব আপনি সমতলের মাঝখানে বাস করেন। একটি জায়গার অবস্থানের বিবরণ দেবার সহজতম একটি উপায় হল এই কথা বলা : আমার বাড়ী থেকে প্রথমে পূর্ব দিকে এতটা দূরত্ব যাবেন তারপর যাবেন উত্তরে এতটা দূরত্ব। (কিংবা প্রথম ক্ষেত্রে এটা হতে পারে পশ্চিম এবং দ্বিতীয় ক্ষেত্রে হতে পারে দক্ষিণ।) এইভাবে জায়গার অবস্থান আপনি নির্ভুলভাবে জানতে পারছেন। আমেরিকার আয়তক্ষেত্রাকার (rectangular) শহরগুলিতে এই পদ্ধতি গ্রহণ করাই



স্বাভাবিক : নিউ ইয়র্কে আপনাকে বলবে : এই কটা ব্লক (block) পূর্বে (কিংবা পশ্চিমে) যান তারপর উত্তরে (কিংবা দক্ষিণে) যান এই কটা ব্লক। পূর্বে আপনার যতটা দূরত্ব যেতে হচ্ছে তার নাম x এবং উত্তরে যতটা দূরত্ব আপনাকে যেতে হচ্ছে তার নাম y। (আপনার যদি পশ্চিমে যেতে হয় তাহলে x অপরা (negative) আর যদি দক্ষিণে যেতে হয় তাহলে y অপরা)। 'O' হোক আপনার আরম্ভ বিন্দু (উৎপত্তি) পূর্বদিকে যাওয়া দূরত্ব হোক OM এবং উত্তর দিকে যাওয়া দূরত্ব হোক MP। আপনি যখন 'P'-এতে পৌঁছেছেন তখন আপনি প্রত্যক্ষ রেখায় (direct lines) আপনার বাড়ী থেকে কত দূরে? এর উত্তর দেয় পিথাগোরাসের উপপাদ্য। OP-এর উপরের বর্গ MP এবং OM-এর উপরের বর্গের যোগফলের সমান। OM যদি চার মাইল হয় এবং MP যদি তিন মাইল হয় তাহলে OP পাঁচ মাইল। OM যদি বারো মাইল হয় এবং MP যদি পাঁচ মাইল হয় তাহলে OP তের মাইল। তার কারণ ১২^2 … ৫^2 … ১৩^2। সুতরাং আপনি যদি দেকার্তের মানচিত্রাঙ্কন পদ্ধতি গ্রহণ করেন তাহলে স্থান থেকে স্থানান্তরে দূরত্ব নির্দ্ধারণের জন্য পিথাগোরাসের

উপপাদ্য অপরিহার্য। ত্রিমাত্রিকে (in three dimensions) ব্যাপারটা একেবারেই এক রকম। আপনি যদি শুধুমাত্র সমতলে স্থান স্থির না করে, উপরে আবদ্ধ বেলুনের অবস্থান নির্দিষ্ট করতে চান তাহলে আপনাকে তৃতীয় একটি রাশি যোগ করতে হবে : অর্থাৎ বেলুন যে উচ্চতায় থাকবে। উচ্চতা যদি z হয়, বেলুন থেকে o এর প্রত্যক্ষ (direct) দূরত্ব যদি r হয় তাহলে আপনি পাবেন—

$$r^2 = x^2 + y^2 + z^2$$

x, y এবং z জানা থাকলে এ থেকে আপনি r গণনা করতে পারবেন। উদাহরণ : আপনার যদি বেলুনের কাছে যেতে বারো মাইল পূর্বদিকে যাবার পর চার মাইল উত্তরে গিয়ে তিন মাইল উপরে যেতে হয় তাহলে বেলুন থেকে ঋজু রেখায় আপনার দূরত্ব হবে তেরো মাইল। কারণ : ১২×১২=১৪৪, ৪×৪=১৬, ৩×৩=৯, ১৪৪+১৬+৯=১৬৯=১৩×১৩।

কিন্তু ধরুন ভূ-পৃষ্ঠের সামান্য অংশ না নিয়ে আপনি সম্পূর্ণ পৃথিবীর মানচিত্র আঁকবার কথা ভাবছেন। ভূ-পৃষ্ঠের সামান্য অংশকে সমতল ভাবা যেতে পারে। কিন্তু সমতল কাগজে পৃথিবীর নির্ভুল মানচিত্র আঁকা অসম্ভব। সবটাই মানক (scale) অনুসারে করা যায় এই জন্য একটা গোলক (globe) নির্ভুল হতে পারে কিন্তু সমতল মানচিত্র নির্ভুল হতে পারে না। ব্যবহারিক অসুবিধার কথা আমি বলছি না আমি বলছি তাত্ত্বিক দিক দিয়ে ব্যাপারটা অসম্ভব। উদাহরণ : গ্রীণউইচ মধ্যরেখার (Meridian of Greenwich) উত্তরাংশ এবং পশ্চিম দ্রাঘিমার নবতিতম মধ্যরেখা আর অন্তর্বর্তী বিষুবরেখার অংশ মিলিয়ে একটি ত্রিভুজ সৃষ্টি করে। এই ত্রিভুজের প্রত্যেকটি বাহু সমান এবং কোণগুলির প্রত্যেকটিই এক একটি সমকোণ। একটি সমতলে এ ধরণের ত্রিভুজ অসম্ভব। অন্যদিকে আবার সমতলে একটি বর্গক্ষেত্র (square) সৃষ্টি সম্ভব কিন্তু গোলকের উপর সম্ভব নয়। অনুমান করা যাক পৃথিবীপৃষ্ঠে আপনি চেষ্টা করছেন : পশ্চিমে একশ' মাইল গেলেন, তারপর উত্তরে গেলেন একশ' মাইল, পূর্বদিকে একশ' মাইল তারপর, এবং তারপর গেলেন একশ' মাইল দক্ষিণে। আপনি ভাবতে পারেন এর ফলে একটি বর্গক্ষেত্র (square) তৈরী হবে। আসলে কিন্তু তা হবে না। কারণ যাত্রাশেষে আপনি আরম্ভ বিন্দুতে পেঁছুবেন না। সময় থাকলে এই পরীক্ষার সাহায্যে আপনি নিজেকে বিশ্বাস করাতে পারেন ; সময় না থাকলে আপনি সহজেই বুঝতে পারেন—এইরকমই হবার কথা। আপনি

যখন মেরুর নিকটতর তখন একশ' মাইল যেতে বিষুবরেখার নিকটতর অবস্থার তুলনায় আপনাকে অনেক বেশী দ্রাঘিমা (more longitude) অতিক্রম করতে হবে। সুতরাং একশ' মাইল পূর্বদিকে গেলে (আপনার অবস্থান যদি উত্তর গোলার্দ্ধে হয়) আপনি যে বিন্দুতে পেঁছুবেন সে বিন্দু যাত্রারম্ভ বিন্দুর তুলনায় অনেক বেশী পূর্বদিকে ; এরপর আপনি যখন সঠিক দক্ষিণে হাঁটছেন তখন আপনার অবস্থান আরম্ভ বিন্দুর তুলনায় আরো পূর্বদিকে এবং যাত্রা যেখানে শেষ করবেন সে স্থান আপনার আরম্ভ বিন্দু নয়। আর একটি উদাহরণ : অনুমান করা যাক আপনি শুরু করছেন গ্রীনউইচ মধ্যরেখার চার হাজার মাইল পূর্বদিকে বিষুবরেখার উপরে। তারপর আপনি চললেন গ্রীনউইচের ভিতর দিয়ে ঐ মধ্যরেখা বরাবর উত্তরদিকে চার হাজার মাইল এবং শেটল্যান্ড দ্বীপপুঞ্জের কাছাকাছি গেলেন তারপর আপনি গেলেন পূর্বদিকে চার হাজার মাইল। এবং সেখান থেকে গেলেন দক্ষিণে চার হাজার মাইল। এর ফলে আপনি বিষুবরেখার যে বিন্দুতে পেঁছুবেন সে বিন্দু আপনার যাত্রারম্ভ বিন্দু থেকে আরো চার হাজার মাইল পূর্বদিকে।

আসলে এতক্ষণ পর্যন্ত আমরা যা বলেছি সেটা ঠিক ন্যায্য কথা নয়। তার কারণ একমাত্র বিষুবরেখার উপরে ছাড়া কোথাও একস্থান থেকে সঠিক পূর্ব-দিকে অন্যস্থানে যাওয়ার হ্রস্বতম পথ সঠিক পূর্বমুখী নয়। নিউইয়র্ক থেকে লিসবন প্রায় সঠিক পূর্বদিকে। জাহাজে (ধরুন) নিউইয়র্ক থেকে লিসবন যেতে গেলে জাহাজটা যাত্রা শুরু করে খানিকটা উত্তর দিকে গিয়ে। জাহাজটা চলে "বৃহৎ বৃত্তে" (great circle) অর্থাৎ এমন বৃত্ত পৃথিবীর কেন্দ্রই যার নিজস্ব কেন্দ্র। এটাই ভূ-পৃষ্ঠে অঙ্কনসাধ্য ঋজুরেখার নিকটতম। বিষুবরেখা তথা দ্রাঘিমার মধ্যরেখাগুলি বৃহৎ বৃত্ত কিন্তু অক্ষাংশের (latitude) অন্য সমান্তরালগুলি নয়। সুতরাং আমাদের অনুমাস করা উচিত ছিল শেটল্যান্ড দ্বীপপুঞ্জে পেঁছানোর সময় আপনার চার হাজার মাইল ভ্রমণ করা হয়েছে তবে সঠিক পূর্বদিকে নয় আপনি ভ্রমণ করেছেন এমন একটি বৃহৎ বৃত্ত বরাবর যে বৃত্ত আপনাকে শেটল্যান্ড দ্বীপপুঞ্জের সঠিক পূর্বদিকে নিয়ে এসেছে। এ তথ্য কিন্তু আমাদের এই সিদ্ধান্তকেই দৃঢ়তর করে : আপনি আগের তুলনায় আপনার প্রারম্ভ বিন্দুর চাইতে আরও বেশী পূর্বদিকে যাত্রা শেষ করবেন।

সমতলের উপরের জ্যামিতি এবং গোলকের উপরের জ্যামিতিতে পার্থক্য কি? আপনি পৃথিবীর উপর যদি একটি ত্রিভুজ তৈরী করেন এবং তার

বাহুগুলি যদি বৃহৎ বৃত্ত হয় তাহলে আপনি দেখতে পাবেন ত্রিভুজের কোণগুলির যোগফল দুই সমকোণ নয়। যোগফল তার চাইতে কিছু বেশী। দুই সমকোণের চাইতে আধিক্যের পরিমাণ ত্রিভুজের আকারের আনুপাতিক। ঘাসের উপর সুতো দিয়ে বানানো ত্রিভুজ কিংবা ঐরকম ছোট একটি ত্রিভুজে, এমন কি, পরস্পর দৃশ্যমান তিনটি জাহাজ দিয়ে তৈরী ত্রিভুজের কোণগুলি যোগ দিলেও যোগফল দুই সমকোণের বেশী হবে। কিন্তু সে আধিক্য এত কম যে পার্থক্যটা আপনি ধরতে পারবেন না। কিন্তু আপনি যদি বিষুব-রেখা, গ্রীনউইচ মধ্যরেখা এবং নবতিতম মধ্যরেখা দিয়ে ত্রিভুজ তৈরী করেন তাহলে কোণগুলির যোগফল হবে তিন সমকোণ। আপনি এমন ত্রিভুজও পেতে পারেন যার যোগফল হতে পারে ছয় সমকোণ পর্যন্ত যা কিছু। এগুলি আপনি ভূ-পৃষ্ঠে মাপনের সাহায্যেই আবিষ্কার করতে পারেন তার জন্য পৃথিবী বহির্ভূত স্থানে (space) অবস্থিত অন্য কিছু বিচার করার প্রয়োজন নেই।

গোলক পৃষ্ঠের দূরত্বের ব্যাপারে পিথাগোরাসের উপপাদ্যও বিফল হবে। পৃথিবীতে আবদ্ধ পথিকের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দুটি স্থানের দূরত্ব হল তাদের বৃহৎবৃত্তদূরত্ব অর্থাৎ ভূ-পৃষ্ঠ ত্যাগ না করা পর্যন্ত ক্ষুদ্রতম দূরত্ব এটাই। অনুমান করা যাক বৃহৎ বৃত্তগুলির এমন তিনটি টুকরো আপনি নিয়েছেন যা দিয়ে একটা ত্রিভূজ বানানো সম্ভব। আরো অনুমান করা যাক তাদের ভিতরে একটি অন্য একটি সাপেক্ষ সমকোণে অবস্থিত। নিশ্চিতভাবে বলতে হলে একটা হোক বিষুবরেখা আর অন্যটি হোক গ্রীনউইচ মধ্যরেখার বিষুবরেখা থেকে উত্তরগামী একটি অংশ। অনুমান করা যাক আপনি বিষুবরেখা বরাবর তিন হাজার মাইল গিয়েছেন তারপর সঠিক উত্তরে গিয়েছেন চার হাজার মাইল তাহলে একটি বৃহৎ বৃত্ত বরাবর দূরত্ব হিসাব করলে আপনি আরম্ভ বিন্দু থেকে কতদূরে থাকবেন? আগে আমরা দেখেছি এরোপ্লেনে থাকলে আপনার দূরত্ব হবে পাঁচ হাজার মাইল। আসলে কিন্তু আপনার বৃহৎ বৃত্ত দূরত্ব এর চাইতে অনেক কম হবে। গোলকপৃষ্ঠে একটি সমকোণী ত্রিভুজে সমকোণের বিপরীত বাহুর উপরের বর্গ অন্য দুটি বাহুর উপরের বর্গের যোগফলের চাইতে কম।

গোলক পৃষ্ঠের জ্যামিতি এবং সমতলের জ্যামিতির ভিতরে এই পার্থক্য-গুলি স্বকীয় (intrinsic) অর্থাৎ যে পৃষ্ঠে (surface) আপনি বসবাস করেন সেই পৃষ্ঠ গোলক তুল্য না সমতল তুল্য, জ্যামিতির এই পার্থক্যগুলি

সে তথ্য আবিষ্কার করার ক্ষমতা আপনাকে দান করে। তার জন্য পৃষ্ঠ বহির্ভূত কিছু বিচারের প্রয়োজন হয় না। এই বিচারগুলি পরের গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপের পথিকৃৎ। এ কাজ করেছিলেন গাউস (Gauss)। তাঁর গৌরবময় কর্মজীবন দেড়শ' বছর আগেকার। গাউস তল (surface) সম্পর্কীয় তত্ত্বে মনোনিবেশ করেছিলেন। তিনি দেখিয়েছিলেন স্বতঃত বিভিন্ন তলগুলি মাপনের সাহায্যে এবং তলের বাইরে না যেয়ে এ তত্ত্বের বিকাশ কি করে সম্ভব। স্থানে একটি বিন্দুর অবস্থান স্থির করার জন্য আমাদের তিনটি মাপন প্রয়োজন কিন্তু পৃষ্ঠতলে (surface) একটি বিন্দুর অবস্থান স্থির করার জন্য আমাদের প্রয়োজন দুটি। উদাহরণ : অক্ষাংশ এবং দ্রাঘিমা জানা থাকলে পৃথিবীর পৃষ্ঠতলে একটি বিন্দুর অবস্থান স্থির করা যায়।

গাউস দেখেছিলেন, মাপনের যে পদ্ধতিই আপনি গ্রহণ করুন না কেন, এবং তলের চরিত্র যাই হোক না কেন, দুটি বিন্দুর অন্তর্বর্তী দূরত্ব মাপন সম্ভব। অবশ্য সে দূরত্ব যদি খুব বেশী না হয় এবং বিন্দুগুলির অবস্থান নির্দেশক রাশিগুলি যদি জানা থাকে। দূরত্বের সঙ্কেত পিথাগোরাসের সঙ্কেতের সাধারণীকরণ। এ সঙ্কেত আপনাকে বলবে : যে মাপনরাশিগুলি বিন্দুগুলির অবস্থান নির্দেশক সেগুলির পার্থক্যের বর্গের বাগ্বিধিতে দূরত্বের বর্গ এবং বলবে এই দুটি রাশির গুণফল। এই সঙ্কেত জানা থাকলে আপনি তলের স্বকীয় ধর্মের সবটাই আবিষ্কার করতে পারেন অর্থাৎ জানতে পারবেন সেই ধর্মগুলি যে ধর্ম তলবহির্ভূত কোনো বিন্দুর সঙ্গে তার সম্পর্কের উপর নির্ভরশীল নয়। উদাহরণ : আপনি আবিষ্কার করতে পারবেন একটি ত্রিভূজের কোণগুলির যোগফলের সমষ্টি দুই সমকোণ কিংবা বেশী কিংবা কম অথবা কোনো ক্ষেত্রে কম কোনো ক্ষেত্রে বেশী কিনা।

কিন্তু যখন আমরা 'ত্রিভুজের' কথা বলি তখন আমরা কি বোঝাতে চাইছি সেটা ব্যাখ্যা করতেই হবে। কারণ অধিকাংশ তলেই কোনো ঋজুরেখা নেই। একটি গোলোকের বেলায় আমরা ঋজুরেখার বদলে বৃহৎ বৃত্ত প্রতিস্থাপন করব। বৃহৎ বৃত্তই ঋজুরেখার নিকটতম। এমনিতে ঋজুরেখার পরিবর্তে আমরা গ্রহণ করব সেই সমস্ত রেখা যে রেখা স্থান থেকে স্থানান্তরের হ্রস্বতম পথ। এই জাতীয় রেখার নাম ধরাকৃতি (Geodesics)। বৃহৎ বৃত্তই (great circles) ভূ-পৃষ্ঠের ধরাকৃতি। আপনি যদি পৃষ্ঠ (surface) ত্যাগ করতে অসমর্থ হন তাহলে এক বিন্দু থেকে অন্য বিন্দুতে যাবার

হ্রস্বতম পথ এগুলিই। একটি পৃষ্ঠের নিজস্ব (intrinsic) জ্যামিতিতে এগুলি ঋজুরেখার স্থান গ্রহণ করে। যখন আমরা প্রশ্ন করি, একটি ত্রিভুজের তিনটি কোণের যোগফল দুই সমকোণ কিনা তখন আমরা এমন ত্রিভুজ বোঝাতে চাই যার বাহুগুলি ধরাকৃতি। এবং যখন আমরা দুটি বিন্দুর অন্তর্বর্তী দূরত্বের কথা বলি তখন আমরা বোঝাতে চাই ধরাকৃতি বরাবর দূরত্ব।

আমাদের সাধারণীকরণের পরের ধাপ একটু কঠিন : সে ধাপ হল অনিউক্লিডীয় জ্যামিতিতে উত্তরণ (transition)। আমরা এমন বিশ্বে বাস করি যেখানে স্থান ত্রিমাত্রিক (three dimensions)। স্থান সম্পর্কে আমাদের অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানের ভিত্তি স্বল্প দূরত্ব এবং ক্ষুদ্র কোণ মাপন। (স্বল্প দূরত্ব বলতে আমি বোঝাতে চাই সেই দূরত্বকে যে দূরত্ব জ্যোতির্বিজ্ঞানে ব্যবহৃত দূরত্বের তুলনায় স্বল্প। এই অর্থে পৃথিবীর সমস্ত দূরত্বই স্বল্প।) আগে ভাবা হোত স্থান ইউক্লিডীয় : এ তথ্য পূর্বত সিদ্ধ (a priori)। উদাহরণ : একটি ত্রিভূজের কোণগুলির যোগফল দুই সমকোণ। কিন্তু বোঝা গেল যুক্তি দিয়ে এ তথ্য প্রমাণ করা যায় না। প্রয়োজনে এ তথ্য জানতে হবে মাপনের ফলরূপে। আইনস্টাইনের আগে চিন্তা করা হোত প্রাপ্তিযোগ্য নির্ভুলতা সাপেক্ষ মাপন ইউক্লিডীয় জ্যামিতির সত্যতা প্রমাণ করে। এরকম চিন্তা এখন অচল। যাকে বলা যেতে পারে স্বাভাবিক কৌশল (natural artifice) তার সাহায্যে পৃথিবীর মত একটি ক্ষুদ্র এলাকার সর্বত্র ইউক্লিডীয় জ্যামিতিকে সত্য মনে করানো যেতে পারে। কিন্তু মহাকর্ষ ব্যাখ্যা করতে যেয়ে আইনস্টাইন এই দৃষ্টিভঙ্গিতে পৌঁছুলেন যে পদার্থ যেখানে রয়েছে সেখানকার বিরাট বিরাট অঞ্চলে স্থানকে ইউক্লিডীয় ভাবা চলে না। এর কারণ জানার প্রয়োজন আমাদের এর পরে হবে। এখন আমাদের আলোচ্য বিষয় গাউসীয় গবেষণার সাধারণীকরণের ফলে অনিউক্লিডীয় জ্যামিতি সৃষ্টির পদ্ধতি।

উদাহরণ : গোলক পৃষ্ঠে যে পরিস্থিতি আমরা দেখতে পাই ত্রিমাত্রিক স্থানে সেই একই পরিস্থিতি না পাবার কোনো কারণ নেই। এমন হতে পারে, ত্রিভূজের তিনটি কোণের যোগফল সবসময়ই দুই সমকোণের বেশী হবে এবং বৃদ্ধিটা হবে সবসময়ই ত্রিভূজের আকারের আনুপাতিক। এমন হতে পারে, গোলকপৃষ্ঠ সম্পর্কে আমাদের যে সঙ্কেত রয়েছে তার অনুরূপ কোনো সঙ্কেতের সাহায্যে দুটি বিন্দুর দূরত্ব প্রকাশিত হবে। এরকম ঘটে কিনা

সেটা আবিষ্কৃত হতে পারে শুধুমাত্র যথাযথ মাপনের সাহায্যে। তবে সেক্ষেত্রে দুটির স্থলে তিনটি বড় সংখ্যা জড়িত থাকবে। এ জাতীয় সম্ভাবনার সংখ্যা অনন্ত।

রীম্যানের (Riemann) "জ্যামিতির পিছনে যে প্রকল্প রয়েছে—সেই সম্পর্কে" (১৮৫৪)—নামক গবেষণামূলক প্রবন্ধে যুক্তির এই ধারা বিকাশলাভ করেছিল। এ প্রবন্ধে তিনি তল সম্পর্কীয় গাউসের গবেষণাকে নানা ধরণের ত্রিমাত্রিক স্থান বিষয়ে প্রয়োগ করেছিলেন। তিনি দেখিয়েছিলেন, এক রকমের একটা স্থান বিষয়ে মূলগত সমস্ত বৈশিষ্ট্যই ক্ষুদ্র দূরত্ব সম্পর্কীয় সঙ্কেত থেকে আহরণ করা সম্ভব। তিনি মনে করতেন : তিনটি অভিমুখের যে তিনটি ক্ষুদ্র দূরত্ব আপনাকে একটি বিন্দু থেকে স্বল্প দূরত্বে অবস্থিত অন্য বিন্দুতে পৌঁছে দেবে সেই দূরত্বগুলির সাহায্যে বিন্দু দুটির অন্তর্বর্তী দূরত্ব গণনা করা সম্ভব। উদাহরণ : যদি আপনার জানা থাকে একটি বিন্দু থেকে প্রথমে পূর্বদিকে একটি বিশেষ দূরত্ব অতিক্রম করবার পর উত্তরদিকে একটি বিশেষ দূরত্ব অতিক্রম করে অন্তিমে শূন্যে ঋজুভাবে একটি বিশেষ দূরত্বে গেলে অন্য একটি বিন্দুতে পৌঁছাতে পারবেন তাহলে আপনার একটি বিন্দু থেকে অন্য বিন্দুর দূরত্ব গণনা করার সামর্থ্য থাকা উচিৎ। এ গণনার নিয়ম হবে পিথাগোরাসের উপপাদ্যের বিস্তার (extension) অর্থাৎ দূরত্বের উপাদানগুলির (component distances) বর্গের গুণিতকগুলি (multiples) যোগ করে এবং সম্ভবত তাদের গুণফলগুলির গুণিতকগুলিকে সঙ্গে নিয়ে আপনি প্রয়োজনীয় দূরত্বের বর্গ পেতে পারেন। সঙ্কেতের কতকগুলি বৈশিষ্ট্য থেকে আপনি বলতে পারেন কি ধরনের স্থান নিয়ে আপনাকে কাজ করতে হবে। বিন্দুগুলির অবস্থান নির্ণয় করার জন্য আপনি কোন বিশেষ পদ্ধতি গ্রহণ করেছেন তার উপরে এই বৈশিষ্ট্যগুলি নির্ভর করে না।

অপেক্ষবাদের জন্য আমাদের যা দরকার সেটা পেতে হলে আমাদের আর একটি সাধারণীকরণ প্রয়োজন : বিন্দুগুলির অন্তর্বর্তী দূরত্বের স্থলে আমাদের প্রতিস্থাপন করতে হবে ঘটনাগুলির 'অন্তর' (interval)। এ হল স্থান-কালের (space-time) পথিকৃৎ। বিশিষ্ট অপেক্ষবাদে আমরা আগেই দেখেছি ঘটনাগুলির অন্তর্বর্তী কালে আলোক যে দূরত্ব অতিক্রম করবে তার বর্গফল (square) থেকে ঘটনাগুলির দূরত্বের বর্গফল (square) বিয়োগ করলে অন্তরের (interval) বর্গফল পাওয়া যায়। ব্যাপক অপেক্ষবাদে অন্তরের এই বিশেষ অবয়ব আমরা

অনুমান করি না। সুরুতে দূরত্ব বিষয়ে রীম্যান যা ব্যবহার করেছিলেন সেইরকম একটা সাধারণ অবয়ব আমরা অনুমান করি। তাছাড়া, আইনস্টাইন রীম্যানের মত শুধুমাত্র নিকটবর্তী (neighbouring) ঘটনাবলী সম্পর্কেই সঙ্কেতটা (assumed) অনুমান করেছিলেন, অর্থাৎ অনুমান করেছিলেন সেই ঘটনাগুলি সম্পর্কে যেগুলির অন্তর ক্ষুদ্র। এই প্রাথমিক মাননাগুলি অতিক্রম করে যা ঘটে সেগুলি নির্ভর করে বস্তুপিণ্ডগুলির বাস্তব গতি পর্যবেক্ষণের উপর। সে পদ্ধতি আমরা ব্যাখ্যা করব এর পরের অধ্যায়গুলিতে।

এতক্ষণ পর্যন্ত যে পদ্ধতির বিবরণ আমরা দিয়েছি এবার আমরা সেগুলির সংক্ষিপ্তসার করতে পারি এবং সেগুলি আবার বলতে পারি। ত্রিমাত্রিকে, একটি স্থির বিন্দু (আরম্ভ—origin) সাপেক্ষ একটি বিন্দুর অবস্থান নির্ণয় করা যায় তিনটি রাশি আরোপ করে (co-ordinate—স্থাণাঙ্ক)। উদাহরণ : আপনার গৃহসাপেক্ষ একটি বেলুনের অবস্থান নির্ণয় করা যায়—যদি আপনি জানেন সঠিক পূর্বে একটি বিশেষ দূরত্বে যাবার পর উত্তরে আর একটি বিশেষ দূরত্ব অতিক্রম করে ঋজুভাবে সঠিক উর্দ্ধে আর একটি বিশেষ দূরত্ব অতিক্রম করলে আপনি সেই বেলুনে পৌঁছাবেন। এ ক্ষেত্রের মত যেখানে পরস্পর সমকোণ সম্পর্কিত তিনটি দূরত্ব রয়েছে এবং যেক্ষেত্রে আরম্ভ থেকে পরস্পরা-ক্রমে দূরত্বগুলি অতিক্রম করলে আপনি আলোচ্য বিন্দুতে পৌঁছে যাবেন সেক্ষেত্রে তিনটি স্থাণাঙ্কের বর্গফল যোগ করলে প্রত্যক্ষ দূরত্বের বর্গফল পাওয়া যাবে। স্থান ইউক্লিডীয় কিংবা অনিউক্লিডীয় যাই হোক না কেন সর্বক্ষেত্রেই এটা পাওয়া যায়, আরোপনযোগ্য একটি বিশেষ নিয়ম অনুসারে বর্গফল-গুলির গুণিতক এবং স্থানাঙ্কগুলির নিয়ম অনুসারে বর্গফলগুলির গুণিতক এবং স্থানাঙ্কগুলির গুণফল যোগের সাহায্যে। স্থানাঙ্কগুলি একটি বিন্দুর অবস্থান নির্দেশ করার মত যে কোনো রাশিসমষ্টি হতে পারে তবে সন্নিকট বিন্দুগুলির স্থানাঙ্কও সন্নিকট রাশিসমষ্টিই হতে হবে। ব্যাপক অপেক্ষবাদে কালের জন্য আমরা একটি চতুর্থ স্থাণাঙ্ক আরোপ করি। আমাদের সঙ্কেতে স্থানিক দূরত্বের বদলে আমরা পাই 'অন্তর'। তাছাড়া শুধুমাত্র স্বল্প দূরত্বের ক্ষেত্রেই আমরা সঙ্কেতের ভ্রমহীনতা মাননা করি।

এবার আমরা আইনস্টাইনের মহাকর্ষীয় তত্ত্ব আলোচনা করার মত অবস্থায় পৌঁছেছি।

অষ্টম অধ্যায়

আইনস্টাইনের মহাকর্ষীয় বিধি

আইনস্টাইনের বিধি আলোচনার আগে, যৌক্তিক ভিত্তি বিচারে নিউটনের মহাকর্ষীয় বিধি যে সম্পূর্ণ নির্ভুল হতে পারে না সে বিষয়ে আমাদের নিঃসন্দেহ হওয়া ভাল।

নিউটন বলেছেন পদার্থের যে কোনো দুটি কণার ভিতরে একটি বল (force) রয়েছে। এই বল ভর দুটির গুণফলের আনুপাতিক (proportional) এবং তাদের দূরত্বের বর্গের বিষমানুপাতিক (inversely proportional)। অর্থাৎ ভরের প্রশ্ন আপাতত অগ্রাহ্য করলে, বস্তুকণা দুটি এক মাইল দূরত্বে থাকলে তাদের ভিতরে যে বিশেষ আকর্ষণ থাকবে, দূরত্ব দু মাইল হলে আকর্ষণ হবে তার এক চতুর্থাংশ। যখন তারা তিন মাইল দূরত্বে তখন সেটা হবে ন' ভাগের একভাগ……এই রকম। দূরত্বের বৃদ্ধির তুলনায় আকর্ষণের হ্রাস অনেক দ্রুত। নিউটন যখন দূরত্বের কথা বলেছেন তখন অবশ্যই তিনি একটি নির্দিষ্ট কালে দূরত্ব বোঝাতে চেয়েছেন। তিনি ভেবেছিলেন কাল বিষয়ে কোনো দ্ব্যর্থ থাকতে পারে না। কিন্তু আমরা দেখেছি এ ধারণা ভুল। একজন পর্যবেক্ষক পৃথিবীতে এবং সূর্যে যে মুহূর্তকে অভিন্ন ভাববেন অন্য একজন সেটাকে ভাববেন দুটি ভিন্ন মুহূর্ত। সুতরাং "একটি বিশেষ মুহূর্তের দূরত্ব" এক ব্যক্তিনিষ্ঠ কল্পন, এ কল্পনের মহাজাগতিক বিধিতে প্রবেশের অধিকার সামান্যই। আমরা অবশ্য গ্রীনউইচ পর্যবেক্ষণাগারের মাপন অনুসারে কাল মাপব একথা বলে আমাদের বিধিকে দ্ব্যর্থবোধহীন করতে পারি। কিন্তু পৃথিবীর আকস্মিক পরিস্থিতি এত গুরুত্বের সঙ্গে গ্রহণযোগ্য, এ তথ্য বিশ্বাস করা আমাদের পক্ষে কঠিন। দূরত্বের মাপও বিভিন্ন পর্যবেক্ষক সাপেক্ষ পরিবর্তিত হবে। সুতরাং মহাকর্ষীয় বিধির নিউটনীয় অবয়ব একেবারে নির্ভুল এ কথা মানতে আমরা রাজি নই। তার কারণ একই রকম বিধিসম্মত বহু রীতির ভিতরে যেটি আমরা গ্রহণ করব ফলের পার্থক্য হবে সেই অনুসারে। খুনীর খুনের অপরাধ যদি নির্ভর করে সম্ভাব্য অপরাধীর পরিচয় তার নামে না পদবীতে তাহলে ব্যাপারটা যেরকম অযৌক্তিক হবে মহাকর্ষীয় বিধির নিউটনীয় বিধির অবয়বও সেইরকমই অযৌক্তিক। দূরত্ব মাইলে মাপা হোক কিংবা কিলোমিটারে

মাপা হোক ভৌত বিধিগুলির অভিন্ন হতেই হবে এ তথ্য স্বতঃপ্রতীয়মান এবং মূলগতভাবে একই নীতির যা বিস্তার সেটাই আমাদের বিবেচ্য।

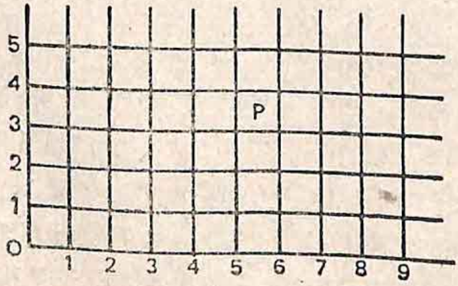
বিশিষ্ট অপেক্ষবাদ যা মেনে নেয় আমাদের মাপন তার চাইতেও বেশী রীতিগত (conventional)। তাছাড়া প্রতিটি মাপনই ভৌত পদার্থের সাহায্যে করা একটি ভৌত পদ্ধতি। তার ফল নিশ্চয়ই হবে একটি পরীক্ষালব্ধ উপাত্ত। কিন্তু যে সরল অর্থ তার উপর আমরা আরোপ করি সে উপাত্তের ব্যাখ্যা অত সরল নাও হতে পারে। সুতরাং কোনো কিছু কি করে মাপতে হয় সেটা আমরা জানি, সুরুতে এ ঘোষণা আমরা করব না। আমরা ধরে নিচ্ছি অন্তর নামক একটি ভৌত রাশি রয়েছে, সে রাশি এমন দুটি ঘটনার সম্পর্ক প্রকাশ করে যে ঘটনা দুটির পারস্পরিক বিচ্ছিন্নতা অত্যন্ত বেশী নয়। কিন্তু সেটা মাপতে জানি এ মাননা আমরা আগে থেকে করছি না। তবে এর আগের অধ্যায়ে যেরকম বলা হয়েছে পিথাগোরাসের উপপাদ্যের সেরকম কোনো একটি সাধারণীকরণ থেকে এটা পাওয়া যায় শুধুমাত্র এইটুকু আমরা মানছি।

তবে আমরা কিন্তু ঘটনাগুলির একটি ক্রম অনুমান করি (assume order) এবং অনুমান করি এ ক্রম চারমাত্রিক। অর্থাৎ আমরা অনুমান করছি : একটি ঘটনা তৃতীয় একটির তুলনায় অন্য একটির নিকটতর এ কথার অর্থ আমরা জানি সুতরাং নির্ভুল মাপনের আগে একটি ঘটনার সান্নিধ্য (neighbourhood) সম্পর্কে আমরা বলতে পারি। তাছাড়া আমরা অনুমান করছি স্থান-কালে একটি ঘটনার অবস্থান আরোপ করতে হলে চারটি রাশি (স্থানাংক) প্রয়োজন। যথা : আগে উল্লেখ করা বিমানে বিস্ফোরণের ব্যাপারে প্রয়োজন অক্ষাংশ, দ্রাঘিমা, উচ্চতা এবং কাল। কিন্তু এই স্থানাংকগুলি কি করে আরোপ করা হল সে সম্পর্কে কোনো মাননা আমরা করছি না। শুধুমাত্র আমরা মানছি সান্নিধ্যের ঘটনাগুলি সম্পর্কে সান্নিধ্যের স্থানাঙ্কগুলি আরোপ করা হয়।

স্থানাঙ্ক নামক এই সংখ্যাগুলি আরোপের পদ্ধতি সম্পূর্ণ যাদৃচ্ছিকও নয় আবার সযত্ন মাপনের ফলও নয়। এর অবস্থান মাঝামাঝি। আপনি যখন অবিচ্ছিন্ন গতিতে চলেছেন তখন আপনার স্থানাংকগুলি অবশ্যই কখনো হঠাৎ লাফিয়ে পরিবর্তিত হবে না। আমেরিকাতে দেখা যায় (ধরে নেওয়া যাক) চতুর্দশ রাস্তা এবং পঞ্চদশ রাস্তার সব বাড়ীগুলির নম্বর ১৪০০ থেকে ১৫০০ এর ভিতরে হবার সম্ভাবনা আবার পঞ্চদশ এবং ষোড়শ রাস্তার ভিতরকার নম্বর হবার সম্ভাবনা ১৫০০, ১৬০০ ; এমনকি চৌদ্দ শতকের সমস্ত সংখ্যা যদি ব্যবহৃত

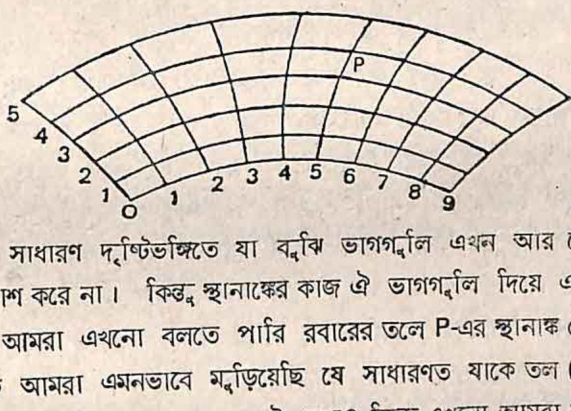
না হয়ে থাকে তাহলেও। আমাদের কাজ এভাবে হবে না কারণ একটি ব্লক থেকে পরের ব্লকে যাবার সময় হঠাৎ লাফ দিতে হয়। আবার কালিক স্থানাংক আমরা এইভাবে আরোপ করতে পারি : পরপর দুটি স্মিথ নামক শিশুর জন্মের মধ্যবর্তী কাল বিচার করুন। ইতিহাসে জ্ঞাত ৩০০০ এবং ৩০০১তম স্মিথের জন্মের মধ্যবর্তী সময়ে সংঘটিত একটি ঘটনার স্থানাংক অবস্থান করবে ৩০০০ থেকে ৩০০১-এর ভিতরে। বছরের যে অংশ ৩০০০তম স্মিথের জন্মের পর গত হয়েছে সেটাই হবে স্থানাঙ্কের ভগ্নাংশ। (স্মিথ পরিবারে পরপর দুটো জন্মের মধ্যবর্তী সময় পুরো এক বছর কখনোই হতে পারে না এ তথ্য স্বতঃপ্রতীয়মান।) স্থানাঙ্ক আরোপের এই পদ্ধতি নির্ভুল নিশ্চিত কিন্তু আমাদের উদ্দেশ্য সাধনের উপযুক্ত নয়। কারণ একটি স্মিথের জন্মের ঠিক আগে এবং ঠিক পরে ঘটনাগুলির মাঝে অকস্মাৎ উল্লম্ফন ঘটবে। সুতরাং অবিচ্ছিন্ন যাত্রায় আপনার স্থানাঙ্ক অবিচ্ছিন্ন হবে না। অনুমান করা হচ্ছে অবিচ্ছিন্ন যাত্রা কাকে বলে সেটা মাপন নিরপেক্ষভাবে আমাদের জানা আছে। যখন স্থান-কালে আপনার অবস্থান অবিচ্ছিন্নভাবে পরিবর্তিত হয় তখন চারটি স্থানাঙ্কের প্রতিটি অবশ্যই অবিচ্ছিন্নভাবে পরিবর্তিত হয়। স্থানাঙ্কগুলির একটি, দুটি কিংবা তিনটির কোনো পরিবর্তন না হতে পারে কিন্তু যে পরিবর্তন হবে সেটা হতে হবে মসৃণ—কোনো আকস্মিক উল্লম্ফন থাকতে পারবে না। স্থানাঙ্ক আরোপের ব্যাপারে অননুমোদনীয় কি রয়েছে সেটা এইভাবে ব্যাখ্যা করা হল।

আপনার স্থানাঙ্কগুলির ভিতরে কোন কোন পরিবর্তন বিধিসঙ্গত সে ব্যাখ্যা করার জন্য অনুমান করা যাক আপনি রবারের একটি বড় টুকরো নিয়েছেন। সেটাকে টেনে লম্বা করা হয়নি এরকম অবস্থায় রবারটির উপরে ছোট ছোট বর্গ-ক্ষেত্র আঁকুন। বর্গক্ষেত্রগুলির (square) সবদিকই লম্বায় এক ইঞ্চির দশ ভাগের



একভাগ। বর্গগুলির কোণে কোণে একটা করে খুব ছোট পিন লাগান। এই পিনগুলির যে কোনো একটির স্থানাঙ্কগুলির দুটি আমরা নির্ধারণ করতে পারি : একটি নির্দিষ্ট পিন থেকে ডান দিকে যেয়ে উল্লিখিত পিনের ঠিক নিচু অবধি যেতে আমরা যে কটি পিন অতিক্রম করি তার সংখ্যা এবং উপর দিকে ঐ পিন পর্যন্ত যেতে যে কটি পিন অতিক্রম করি তার সংখ্যা। চিত্রে O হোক আমাদের প্রারম্ভিক পিন এবং যে পিনের স্থানাঙ্ক আমরা আরোপ করতে চাই সেটা হোক P। তাহলে P পঞ্চম সার (column) এবং তৃতীয় পঙ্‌ক্তি (row)। সুতরাং, রবারের তলে (plane) ও-র স্থানাঙ্ক হবে ৫ এবং ৩।

এবার রবারটা আপনি টেনে যত খুশী লম্বা করুন আর পাক দিন। পিনগুলি এবার দ্বিতীয় চিত্রে যেরকম আছে সেইরকম আকার নিক।



আমাদের সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গিতে যা বুঝি ভাগগুলি এখন আর সেই অর্থে দূরত্ব প্রকাশ করে না। কিন্তু স্থানাঙ্কের কাজ ঐ ভাগগুলি দিয়ে একই রকম চলবে। আমরা এখনো বলতে পারি রবারের তলে P-এর স্থানাঙ্ক ৫ এবং ৩। রবারটাকে আমরা এমনভাবে মুড়িয়েছি যে সাধারণত যাকে তল (plane) বলা হয় রবারটা আর সেরকম নেই তবুও কিন্তু এখনো আমরা রবারটিকে একটি তল বলে ভাবতে পারি। এইরকম অবিচ্ছিন্ন বিকৃতিতে কিছু এসে যায় না।

আর একটি উদাহরণ : আমাদের স্থানাঙ্ক নির্দ্ধারণের জন্য লৌহদণ্ডের পরিবর্তে একটি জ্যান্ত ইল মাছ* ব্যবহার করা যাক। মাছটা সবসময়ই তার দেহ মোচড়ায়। সেই মুহূর্তে মাছটা যে আকারই ধারণ করুক না কেন, স্থানাঙ্কের দৃষ্টিভঙ্গিতে লেজ থেকে মাথা পর্যন্ত দূরত্বকে এক একক হিসাবে গণনা করা হবে। ঈলটা, অবিচ্ছিন্ন তার গা মোচড়ানোও অবিচ্ছিন্ন

*ফুট নোট : Eel—ঈল লম্বা সাপের মত দেখতে একরকম মাছ।

সুতরাং স্থানাঙ্ক আরোপের পদ্ধতির জন্য একে আমাদের দূরত্বের একক হিসাবে গ্রহণ করা যেতে পারে। স্থানাঙ্ক আরোপের পদ্ধতির জন্য প্রয়োজন অবিচ্ছিন্নতা। এ পদ্ধতির অন্যান্য অংশ শুধুমাত্র রীতিগত ব্যাপার। সুতরাং জীবন্ত ঈল আর ইস্পাতদণ্ড একই রকম কাজ করবে।

আমরা স্বভাবতই ভাবতে পারি সত্যিকারের সতর্ক মাপনের জন্য জীবন্ত ঈলের চাইতে ইস্পাতদণ্ড ব্যবহার করা ভাল। এটা ঠিক নয়—তার কারণ এ নয় যে ইস্পাতদণ্ড যা বলে ভাবা হোত ঈলও সে কথা বলে—কারণ হল ঈলের যে বক্তব্য স্বতঃপ্রতীয়মান ইস্পাতদণ্ড তার চেইতে বেশী কিছু বলে না। ব্যাপারটা আসলে এ নয় যে ঈল সত্যিই অনমনীয় আসলে ইস্পাতদণ্ডও গা মোচড়ায়। আমাদের দৃষ্টিতে যেমন মনে হয় ঈলটা গা মোচড়ায় তেমনি গতির সম্ভাব্য একটি অবস্থায় স্থিত একজন পর্যবেক্ষকের মনে হবে ঈল অনমনীয় এবং ইস্পাতদণ্ড গা মোচড়ায় (wriggle)। আমাদের এবং ঐ পর্যবেক্ষকের চাইতে পৃথকভাবে চলমান প্রত্যেকেরই মনে হবে ঈল এবং দণ্ড দুটোই গা মোচড়ায়। এবং একজন পর্যবেক্ষক সঠিক এবং অন্য পর্যবেক্ষক ভুল একথা বলার কোনো উপায় নেই। এই সমস্ত ক্ষেত্রে যা দেখা যায় সেটা পর্যবেক্ষিত ভৌত পদ্ধতির উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল নয়। সেটা পর্যবেক্ষকের দৃষ্টিভঙ্গির উপরও নির্ভরশীল। দূরত্ব এবং কাল মাপন মাপিত বস্তুর ধর্ম প্রত্যক্ষভাবে প্রকাশ করে না প্রকাশ করে বস্তুর সঙ্গে মাপকের সম্পর্ক। সুতরাং ভৌত জগৎ সম্পর্কে পর্যবেক্ষণ যা বলতে পারে সেটা এতদিন পর্যন্ত আমরা যা বিশ্বাস করেছি তার চাইতে অনেক বেশী বিমূর্ত।

প্রাচীন গ্রীক আমল থেকে স্কুলে যে জ্যামিতি পড়ানো হয় তার পৃথক বিজ্ঞান হিসাবে অস্তিত্ব আর রইল না, সেটা মিশে গেল পদার্থবিদ্যার সঙ্গে। এ তথ্য বোঝার গুরুত্ব রয়েছে। প্রাথমিক জ্যামিতির দুটি মূলগত ধারণা ছিল ঋজুরেখা এবং বৃত্ত। আপনার কাছে যেটাকে মনে হয় একটা ঋজুদণ্ড, যার অংশগুলির অস্তিত্ব বর্তমানে রয়েছে, আর একজনের কাছে সেটা মনে হতে পারে একটা রকেটের উড়ন অর্থাৎ এমন ধরণের একটি বক্ররেখা যার অংশগুলি ক্রমান্বয়ে অস্তিত্বে উপনীত হচ্ছে। বৃত্ত নির্ভরশীল দূরত্ব মাপনের উপর—কারণ বৃত্ত আসলে কেন্দ্র থেকে বিশেষ একটি সমদূরত্বে অবস্থিত সমস্ত বিন্দুর সমষ্টি। আমরা দেখেছি দূরত্ব মাপন একটি ব্যক্তি-

নিষ্ঠ ব্যাপার। সেটা নির্ভর করে পর্যবেক্ষক কিভাবে চলমান তার উপর। মিচেলসন মর্লির বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা বৃত্তের বস্তুনিষ্ঠ সত্যতার অভাব প্রদর্শন করেছে। এক অর্থে এই পরীক্ষা সম্পূর্ণ অপেক্ষবাদের আরম্ভবিন্দু। আমাদের মাপনের জন্য প্রয়োজনীয় অনমনীয় বস্তুপিণ্ড শুধুমাত্র কয়েকজন পর্যবেক্ষক সাপেক্ষই অনমনীয়, অন্য পর্যবেক্ষক সাপেক্ষ তাদের মাত্রা (dimensions) অবিচ্ছিন্নভাবে পরিবর্তিত হতে থাকবে। শুধুমাত্র আমাদের পৃথিবীবদ্ধ বেয়ারা (obstinate) কল্পনার জন্যই আমাদের পক্ষে জ্যামিতিকে পদার্থ-বিদ্যা থেকে বিচ্ছিন্ন মনে করা সম্ভব হয়েছে।

সেইজন্যই শুরু থেকে আমরা আমাদের স্থানাঙ্কগুলিকে (co-ordinates) কোনো ভৌত গুরুত্ব দান করার ঝামেলায় থাকি না। আগে পদার্থবিদ্যায় ব্যবহৃত স্থানাঙ্কগুলিকে সযত্নে মাপা দূরত্ব বলে ভাবা হোত। এখন আমরা বুঝতে পারছি এই প্রাথমিক প্রযত্ন পরিত্যক্ত হয়েছে। যত্নের প্রয়োজন পরের একটি ধাপে। আমাদের স্থানাঙ্কগুলি এখন একাধিক ঘটনার পঞ্জী গঠনের একটি নিয়মানুগত পদ্ধতি ছাড়া বিশেষ কিছু নয়। গণিত শাস্ত্রের টেন্সর পদ্ধতি (tensor—প্রদিশ) বিরাট শক্তিশালী এক সাধনী। এর সাহায্যে আপাত-দৃষ্ট অযত্নে আরোপিত স্থানাঙ্কগুলিকে আমরা এমন কার্যকরভাবে ব্যবহার করতে পারি যেন মনে হবে ঐ স্থানাঙ্কের জন্য সূক্ষ্ম এবং নির্ভুল মাপনের সমস্ত সাধনীই ব্যবহার করা হয়েছে। শুরুতে এলোমেলোভাবে কাজ করার সুবিধা এই যে আমরা অজানা (surreptitious) ভৌত অনুমান এড়িয়ে যেতে পারি। প্রথমদিকে যদি ধারণা থাকে যে আমাদের স্থানাঙ্কগুলির কোনো ভৌত গুরুত্ব রয়েছে তাহলে এই অজানা অনুমান এড়ানোর সম্ভাবনা অল্প।

পর্যবেক্ষণ করা সমস্ত ভৌত পরিঘটনা সম্পর্কে অজ্ঞতা নিয়ে অগ্রসর হবার চেষ্টা করার কোনো প্রয়োজন আমাদের নেই। কিছু কিছু জিনিষ আমরা জানি। আমরা জানি একটি বিশেষ পদ্ধতিতে স্থানাঙ্কগুলি নির্বাচন করা হলে প্রাচীন নিউটনীয় পদার্থবিদ্যা প্রায় নির্ভুল। আমরা জানি উপযুক্ত স্থানাঙ্ক সাপেক্ষ বিশিষ্ট অপেক্ষবাদ নির্ভুলতার আর নিকটতর। এই সমস্ত তথ্য থেকে আমরা আমাদের নূতন স্থানাঙ্কগুলি সম্পর্কে কয়েকটি জিনিষ আহরণ করতে পারি। এগুলিই যৌক্তিক (অবরোহী) আহরণের সাহায্যে নূতন তত্ত্বের স্বীকার্যরূপে প্রতিভাত হয়।

এই জাতীয় স্বীকার্যরূপে আমরা গ্রহণ করি :

(১) সমীপবর্তী ঘটনাবলীর অন্তর্বর্তী অন্তর (interval), দূরত্ব সম্পর্কে রীম্যান যেরকম ব্যবহার করেছিলেন সেই রকম সাধারণ অবয়ব গ্রহণ করে।

(২) যথোপযুক্ত (sufficiently) ক্ষুদ্র, হাল্কা এবং প্রতিসম (symmetrical) বস্তুপিণ্ডের স্থানকালে যাত্রাপথ ধরাকৃতি (geodesie), ব্যতিক্রম হতে পারে শুধুমাত্র বস্তুপিণ্ডটির উপর অমহাকর্ষীয় বলের ক্রিয়ার দরুন।

(৩) আলোকরশ্মির যাত্রাপথ ধরাকৃতি—সেটা এমন যে তার যে কোনো দুটি অংশের অন্তর (interval) শূন্য (zero)।

এই স্বীকার্যগুলির প্রত্যেকটির কিছু ব্যাখ্যা প্রয়োজন।

আমাদের প্রথম স্বীকার্যের প্রয়োজন : দুটি ঘটনা যদি ঘনিষ্ঠরূপে সমীপবর্তী হয় (কিন্তু অন্য রকমটা আবশ্যিক নয়—not necessarily otherwise) তাহলে তাদের ভিতরে একটি অন্তর থাকে। তাদের স্থানাঙ্কের পার্থক্যের সাহায্যে এ অন্তর গণনা করা সম্ভব। গণনার জন্য আগের অধ্যায়ে আলোচিত সঙ্কেতের মত কোনো একটি সঙ্কেত ব্যবহার করা যেতে পারে। অর্থাৎ আমরা স্থানাঙ্কগুলির পার্থক্যের বর্গ এবং গুণফল নিয়ে তাকে যথোপযুক্ত রাশি দিয়ে (suitable amounts) গুণ করি (সাধারণত এগুলি স্থান থেকে স্থানান্তরে পরিবর্তিত হবে) এবং ফলগুলিকে যোগ করি। প্রাপ্ত যোগফল অন্তরের বর্গ। কি রাশি দিয়ে বর্গগুলি এবং গুণফলগুলিকে গুণ দিতে হবে সেটা আমরা আগে থাকতে অনুমান করি না। সেটা আবিষ্কার করা হবে ভৌত পরিঘটনা পর্যবেক্ষণ করে। কিন্তু আমরা জানি স্থান-কালের যে কোনো ক্ষুদ্র অঞ্চলে আমরা এমনভাবে স্থানাঙ্ক নির্বাচন করতে পারি যে আমরা বিশিষ্ট অপেক্ষবাদে যেরকম পেয়েছি অন্তর প্রায় নির্ভুলভাবে সেই বিশেষ অবয়ব গ্রহণ করে। তার কারণ ব্যাপারটা যে এইরকমই হবে গণিত শাস্ত্রের সাহায্যে সেটা বোঝা যায়। সীমিত অঞ্চলে বিশিষ্ট অপেক্ষবাদ প্রয়োগের জন্য অঞ্চলটি মহাকর্ষবিহীন হবার কোনো প্রয়োজন নেই। সমগ্র অঞ্চলে মহাকর্ষের তীব্রতা যদি কার্যত এক হয় তাহলেই চলবে। এর সাহায্যে আমরা যে কোনো ক্ষুদ্র অঞ্চলে বিশিষ্ট অপেক্ষবাদ প্রয়োগের ক্ষমতা লাভ করি। এটা কত ক্ষুদ্র হবে সেটা নির্ভর করে সন্নিহিত অঞ্চলের উপর। ভূ-পৃষ্ঠে এটা এমন ছোট হতে হবে যাতে পৃথিবীর বক্রতা অগ্রাহ্য করা যায়। গ্রহান্তর্বর্তী স্থানে এটা এমন ছোট হতে হবে যাতে সমগ্র অঞ্চলে সূর্য এবং গ্রহগুলির আকর্ষণ অবধারণীয়ভাবে অপারিবর্তিত থাকে (sensibly

constant)। তারকাগুলির অন্তর্বর্তী স্থানে এটা হতে পারে বিরাট। ধরুন—দুটি তারকার দূরত্বের অর্ধেক। এবং এতেও মাপনযোগ্য ভুল হবে না।

অর্থাৎ মহাকর্ষপ্রদায়ী পদার্থ (gravitating matter) থেকে বহুদূরে আমরা এমনভাবে স্থানাঙ্ক নির্বাচন করতে পারি যাতে প্রায় ইউক্লিডীয় স্থান পাওয়া যায়। আসলে 'সেখানে বিশিষ্ট অপেক্ষবাদ প্রযোজ্য' এই কথাই এখানে অন্যভাবে বলা হল। যদিও পদার্থের সান্নিধ্যে অতি ক্ষুদ্র অঞ্চলে আমরা স্থানকে প্রায় ইউক্লিডীয় করতে পারি তবুও যে অঞ্চলে মহাকর্ষ অবধারণীয়রূপে পরিবর্তিত হয় সে অঞ্চলের সম্পূর্ণ এলাকায় সেটা পারি না। যদি পারি তাহলে দ্বিতীয় স্বীকার্যে যে দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ করা হয়েছে অন্ততপক্ষে সে দৃষ্টিভঙ্গি আমাদের পরিত্যাগ করতে হবে। স্বীকার্যটি হল: মহাকর্ষীয় বলাধীন চলমান বস্তুপিণ্ডগুলি শুধুমাত্র ধরাকৃতি পথে চলে।

আমরা দেখেছি ধরাকৃতিই পৃষ্ঠতলে এক বিন্দু থেকে অন্য বিন্দুতে অঙ্কিত হ্রস্বতম রেখা। উদাহরণ: পৃথিবী পৃষ্ঠে ধরাকৃতিগুলি বৃহৎ বৃত্ত। স্থান-কাল ক্ষেত্রে গণিত একই কিন্তু বাচনিক ব্যাখ্যা একটু অন্যরকম হতে হবে। ব্যাপক অপেক্ষবাদে শুধুমাত্র সন্নিহিত ঘটনাগুলিরই নির্দিষ্ট নিশ্চিত অন্তর রয়েছে। এ অন্তর একটি থেকে অন্যটিতে যাবার গতিপথনিরপেক্ষ। দূরস্থিত ঘটনাগুলির অন্তর নির্ভর করে যাত্রাপথের উপর। যাত্রাপথকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত করে তার অন্তরগুলি যোগ করে দূরস্থিত ঘটনাগুলির অন্তর গণনা করা হয়। অন্তর যদি স্থানানুরূপ হয় তাহলে একটি বস্তুপিণ্ড এক ঘটনা থেকে অন্য ঘটনায় যেতে পারে না। সুতরাং বস্তুপিণ্ডগুলি কিভাবে চলে সেই বিচার করার সময় আমরা আবদ্ধ থাকি কালানুরূপ অন্তরে। সন্নিহিত ঘটনাগুলি যখন কালানুরূপ তখন মনে হবে পর্যবেক্ষকদের একটি ঘটনা থেকে অন্য ঘটনায় যাবার অন্তর্বর্তী কালই তাদের অন্তর। সুতরাং যাঁরা একটি ঘটনা থেকে অন্য ঘটনায় ভ্রাম্যমান তাঁদের বিচারে তাঁদের নিজেদের ঘড়িতে নির্দিষ্ট ভ্রমণকালই হবে দুটি ঘটনার সম্পূর্ণ অন্তর। কোনো কোনো পথে এই কাল হবে দীর্ঘতর আবার কোনো কোনো পথে হবে হ্রস্বতর। তাঁদের চলার গতি যত মন্থর হবে, ভ্রমণকালও তাঁদের কাছে ততই দীর্ঘ মনে হবে। এটাকে মামুলী বক্তব্য ভাবা কোনোক্রমেই উচিৎ নয়। আমি একথা বলছি না যে আপনি যদি লণ্ডন থেকে এডিনবরা যান তাহলে আপনার গতি মন্থরতর হলে আপনার সময় বেশী লাগবে। আমি

যা বলছি সেটা তার চাইতেও অনেক বেশী অদ্ভূত। আমি বলছি : আপনি যদি সকাল দশটায় লণ্ডন ছাড়েন এবং সন্ধ্যা সাড়ে ছটা—গ্রীণউইচ সময়ে এডিনবরা পেঁছান তাহলে আপনার গতি যত মন্থর হবে সময়ও তত বেশী লাগবে—অবশ্য আপনি যদি নিজের ঘড়িতে কাল মাপেন। এ বক্তব্য সত্যিই বেশ পৃথক। পৃথিবীতে স্থিত কোনো ব্যক্তির দৃষ্টিতে আপনার ভ্রমণকাল সাড়ে আট ঘণ্টা। কিন্তু আপনি যদি সৌর-জগতে ভ্রাম্যমাণ একটি আলোকরশ্মি হতেন, যদি সকাল দশটায় লণ্ডন থেকে যাত্রা শুরু করতেন, যদি বৃহস্পতি শনি ইত্যাদি থেকে প্রতিফলিত হতে হতে, শেষ পর্যন্ত প্রতিফলিত হয়ে এডিনবরায় পেঁছুতেন সন্ধ্যা সাড়ে ছটায় তাহলে আপনার বিচারে এই ভ্রমণে একেবারে কোনো সময়ই লাগত না। আর আপনি যদি কোনো ঘোরাপথে যেতেন এবং দ্রুততর ভ্রমণের ফলে যদি আপনি ঠিক সময়ে পেঁছুতেন তাহলে আপনার গতিপথ যত দীর্ঘ হোত, আপনার বিচারে—সময়ও তত কম লাগত। আপনার গতি আলোকের গতির যত নিকটতর হোত কাল-সংক্ষেপও অবিচ্ছিন্নভাবে সেই অনুপাতে হোত। এখন আমি বলছি : একটি বস্তুপিণ্ড যখন ভ্রমণ করে তখন তাকে নিজের উপর ছেড়ে দিলে সে সেই গতিপথই নির্বাচন করবে যে পথে দুটি পর্যায় (stage) অতিক্রম করতে সম্ভাব্য দীর্ঘতম কাল লাগবে। সে যদি একটি ঘটনা থেকে অন্য ঘটনায় অন্য কোনো পথে ভ্রমণ করত তাহলে তার নিজস্ব ঘড়ির মাপ অনুসারে সময় লাগত কম। এ কথার অর্থ : বস্তুপিণ্ডগুলিকে তাদের নিজের উপর ছেড়ে দিলে তাদের চলার গতি হবে যত মন্থর সম্ভব। এটা এক ধরনের মহাজাগতিক আলস্য বিধি (law of cosmic laziness)। এ তথ্যের গাণিতিক প্রকাশ হল : তাদের ভ্রমণপথ ধরাকৃতি। এ ক্ষেত্রে ভ্রমণের দুটি ঘটনার মোট অন্তর যে কোনো বিকল্প ভ্রমণ পথের চাইতে বেশী। (এটা বৃহত্তর—ক্ষুদ্রতর নয়—এই ব্যাপারটার কারণ হল : যে ধরনের অন্তর আমরা বিচার করছি তার সাদৃশ্য দূরত্বের চাইতে কালের সঙ্গেই বেশী)। উদাহরণ : লোকে যদি পৃথিবীর বাইরে গিয়ে কিছুকাল ভ্রমণ করে আবার ফিরে আসতে পারত তাহলে তাদের গমণকাল এবং প্রত্যাবর্তন কালের মধ্যবর্তীকাল পৃথিবীবাসীদের তুলনায় যাত্রীদের ঘড়িতে কম হোত। সূর্য প্রদক্ষিণ করার সময় পৃথিবী তার যাত্রাপথে সেই পথই নির্বাচন করে যে পথের যে কোনো অংশ পরিভ্রমণ করতে তার নিজস্ব ঘড়ির অন্যপথে চলমান ঘড়ির

তুলনায় বেশী সময় লাগবে। বস্তুপিণ্ডগুলিকে তাদের নিজেদের উপর ছেড়ে দিলে তারা স্থান-কালে ধরাকৃতিতে চলমান হয়—এ কথার অর্থ এটাই।

স্থান-কালকে ইউক্লিডীয় বলে মাননা করা হয় না : এ তথ্য স্মরণে রাখা গুরুত্বপূর্ণ। ধরাকৃতিগুলি সাপেক্ষ এর ক্রিয়া হল : স্থান-কাল একটি গ্রাম্য পাহাড়ী এলাকার মত। একখণ্ড পদার্থের সান্নিধ্যে যেন একটি স্থান-কালের পাহাড় রয়েছে। শীর্ষে না পৌঁছানো পর্যন্ত পাহাড়টা ক্রমশ দুরারোহ হতে থাকে—অনেকটা বোতলের গলার মত। এটা শেষ হয় একটি খাড়া গিরিচূড়ায়। এর আগে মহাজাগতিক আলস্যবিধির উল্লেখ করা হয়েছে। এই বিধি অনুসারে পাহাড়ের সান্নিধ্যে কোনো বস্তুপিণ্ড এলে সেটা ঋজুভাবে শিখরে যেতে চেষ্টা করবে না,—চেষ্টা করবে ঘুরে যেতে। মহাকর্ষ সম্পর্কে আইনস্টাইনের দৃষ্টিভঙ্গির সারমর্ম এটাই। একটি বস্তুপিণ্ড যা করে তার কারণ তার নিজ সান্নিধ্যের স্থান-কালের চরিত্র। দূরস্থিত একটি বস্তুপিণ্ড থেকে উৎসারিত রহস্যজনক কোনো বল তার কারণ নয়।

একটি উপমার সাহায্যে ব্যাপারটাকে সহজ করা যাবে। ধরুন একটা বিরাট সমতলে (plain) এক অন্ধকার রাতে হাতে লণ্ঠন নিয়ে কয়েকজন লোক নানাদিকে ঘোরাফেরা করছিল। আরও অনুমান করুন সমতলের এক অংশে একটি পাহাড় ছিল আর পাহাড়ের মাথায় ছিল একটি জ্বলজ্বলে আলোকসঙ্কেত। যেমন বিবরণ দেওয়া হয়েছে আমাদের পাহাড়টা হতে হবে সেইরকম অর্থাৎ যত উপরে যাওয়া যায় তত দুরারোহ এবং শেষে একটা খাড়া গিরিশিখর। আমি অনুমান করব সমতলে বিন্দু বিন্দু কয়েকটা গ্রাম ছড়ানো রয়েছে এবং হাতে লণ্ঠন নিয়ে লোকেরা গ্রামের দিকে এবং গ্রাম থেকে এদিক-ওদিক ঘোরাফেরা করছে। এক গ্রাম থেকে অন্য গ্রামে যাবার সহজতম রাস্তায় পথ তৈরী হয়েছে। পাহাড়ের উপর খুব বেশী দূর উঠা এড়াবার জন্য সবকটা পথই কিন্তু কম-বেশী বাঁকা (curved)। গিরি-শিখরের কাছাকাছি জায়গায় গিরিশিখর থেকে খানিকটা দূরের তুলনায় পথগুলির বক্রতা অনেক বেশী। এখন ধরুন একটা বেলুনে চড়ে খুব উঁচু থেকে যতটা সম্ভব ভাল করে এই জিনিষগুলি আপনি দেখছেন—জমিটা আপনি দেখতে পাচ্ছেন না—দেখছেন শুধু লণ্ঠনগুলি আর আলোকসঙ্কেত। একটা পাহাড় রয়েছে কিংবা আলোকসঙ্কেতটা রয়েছে পাহাড়ের উপর এসমস্ত তথ্য আপনি জানতে পারবেন না। আপনি দেখতে পাবেন লোকে

আলোকসঙ্কেতের কাছে এলে ঋজুপথ থেকে বাইরের দিকে সরে যায়। আপনার ভাবা স্বাভাবিক যে, এর কারণ ঐ আলোকসঙ্কেত। আপনি ভাবতে পারেন ওটা খুব গরম, লোকে পুড়ে যাবার ভয় পাচ্ছে। কিন্তু আপনি যদি দিনের আলোক পর্যন্ত অপেক্ষা করেন তাহলে আপনি পাহাড়টা দেখতে পাবেন, বুঝতে পারবেন আলোকসঙ্কেতটা শুধু পর্বতশিখরটা নির্দেশ করছে—হাতে লণ্ঠন নিয়ে যারা ঘুরছে তাদের উপর কোনো প্রভাবই ওর নেই।

এই উপমার আলোকসঙ্কেতটা সূর্যের প্রতিরূপ, হাতে লণ্ঠন লোকেরা প্রতিরূপ গ্রহ এবং ধূমকেতুর। পথ প্রতিরূপ কক্ষপথের (orbit) আর দিবালোকের আবির্ভাব প্রতিরূপ আইনস্টাইনের আবির্ভাবের। আইনস্টাইন বলছেন সূর্য স্থানে অবস্থিত নয়—সূর্যের অবস্থান স্থান-কালে। (পাঠককে আমার পরামর্শ : এ তত্ত্বের মানসচিত্র সৃষ্টি করতে যাবেন না কারণ সেটা অসম্ভব)। প্রতিটি বস্তুপিণ্ড প্রতি মুহূর্তে সহজতম পথ অনুসরণ করতে চেষ্টা করে—কিন্তু পর্বতের অস্তিত্বের জন্য সহজতম পথটি ঋজুরেখা নয়। মোরগ যেমন নিজের বিষ্ঠার ঢিবির ওপর বসে থাকে তেমনি প্রতিটি বস্তুখণ্ডই তার নিজস্ব ক্ষুদ্র পাহাড়ের শিখরে অবস্থান করে। যাকে আমরা বড় বস্তুখণ্ড বলি সেটা একটা বড় পাহাড়ের শিখর। পাহাড়টাই আমাদের জানা ; শিখরের বস্তুখণ্ড অনুমান করা হয় সুবিধার জন্য। এ অনুমানের হয়ত কোনো প্রয়োজন নেই, শুধু পাহাড়েই আমাদের কাজ চলতে পারে। লড়ুয়া মোরগটা যেমন, আয়নায় দেখা যে মোরগটাকে দেখে মেজাজ বিগড়ে যায়—সেটার সঙ্গে লড়তে পারে না তেমনি আমরাও আর কারো পাহাড়ে চড়তে পারি না।

আইনস্টাইনের মহাকর্ষীয় বিধির শুধুমাত্র গুণীয় (qualitative) বিবরণ আমি দিয়েছি। আমি নিজেকে যে পরিমাণ গণিত ব্যবহারের অনুমতি দিয়েছি তার চাইতে বেশী পরিমাণ গণিত ব্যবহার না করে মাত্রিক (quantitative) বিবরণ দেওয়া অসম্ভব। সব চাইতে আকর্ষণীয় ব্যাপার হল এ বিধি আর দূরস্থিত ক্রিয়ার উপর নির্ভরশীল নয়। গ্রহগুলির উপর সূর্য কোনো বলই প্রয়োগ করে না। ঠিক যেমন জ্যামিতি পদার্থবিদ্যায় পরিণত হয়েছে তেমনি এক অর্থে পদার্থবিদ্যা পরিণত হয়েছে জ্যামিতিতে। মহাকর্ষীয় বিধি পরিণত হয়েছে এই জ্যামিতিক বিধিতে : প্রতিটি বস্তুপিণ্ড স্থান থেকে স্থানান্তরে গমণের জন্য সহজতম পন্থা অনুসরণ করে কিন্তু পথে যে সমস্ত

পর্বত এবং উপত্যকার সঙ্গে সাক্ষাৎকার হয় সেগুলি বস্তুপিণ্ডটির গতিপথকে প্রভাবিত করে।

আমরা অনুমান করে চলেছি যে বিচার্য বস্তুপিণ্ডটির উপর শুধুমাত্র মহাকর্ষীয় বলগুলিই ক্রিয়া করে। এখন আমাদের বিচার্য মহাকর্ষীয় বিধি। বিদ্যুৎ চুম্বকীয় বল কিংবা ঊনপারমাণবিক (subatomic) কণামধ্যস্থ বল আমাদের বিচার্য নয়। এই সমস্ত বলগুলিকেই ব্যাপক অপেক্ষবাদের কাঠামোর ভিতরে নিয়ে আসবার অনেক চেষ্টা হয়েছে। এ প্রচেষ্টা আইনস্টাইন নিজে করেছেন। তাছাড়া করেছেন ওয়েইল (Weyl), কালুজা (Kaluza), ক্লাইন (Klein) ইত্যাদি আরও অনেকে। কিন্তু এই প্রচেষ্টাগুলির কোনোটাই সম্পূর্ণ সন্তোষজনক হয়নি। আপাতত আমরা এ গবেষণা অগ্রাহ্য করতে পারি। কারণ সমগ্রভাবে কোনো গ্রহের উপরই বিদ্যুৎ চুম্বকীয় কিংবা ঊনপারমাণবিক বলগুলির উপলব্ধিযোগ্য কোনো ক্রিয়া নেই। তাদের গতির কারণ বোঝার জন্য শুধুমাত্র মহাকর্ষই বিচার করতে হবে। এ অধ্যায়ে আমাদের এই তথ্যই বিচার্য।

আমাদের তৃতীয় স্বীকার্য : ভ্রাম্যমাণ আলোকরশ্মির যে কোনো দুটি অংশের মধ্যবর্তী অন্তর শূন্য (zero)। এই স্বীকার্যের একটি সুবিধা এই যে, "শুধুমাত্র স্বল্প দূরত্বের জন্য"—একথা বলার কোনো প্রয়োজন নেই। অন্তরের প্রতিটি ক্ষুদ্র অংশই যদি শূন্য হয় তাহলে তাদের যোগফলও হবে শূন্য সুতরাং সেই আলোকরশ্মির দূরস্থিত অংশগুলিরও অন্তর শূন্য হবে। এই স্বীকার্য অনুসারে আলোকরশ্মির গতিপথও ধরাকৃতি। সুতরাং এখন স্থান-কালে ধরাকৃতি আবিষ্কারের দুটি প্রয়োগজ (empirical) পদ্ধতি আমাদের রয়েছে : আলোকরশ্মি এবং অবাধে চলমান বস্তুপিণ্ড। অবাধে চলমান বস্তুপিণ্ডগুলির ভিতরে রয়েছে সেগুলি, যেগুলি সামগ্রিক রূপে উপলব্ধিযোগ্য ভাবে বিদ্যুৎচুম্বকীয় বল কিংবা ঊনপারমাণবিক বলের প্রভাবাধীন নয়। অর্থাৎ সূর্য, তারকা, গ্রহ এবং উপগ্রহ এবং ভূপৃষ্ঠে পতনশীল বস্তুপিণ্ড—বিশেষ করে যখন শূন্যের ভিতর দিয়ে পড়ছে তখন। আপনি যখন পৃথিবীতে দাঁড়িয়ে তখন আপনি বিদ্যুৎচুম্বকীয় বলের প্রভাবাধীন : আপনার পায়ের সান্নিধ্যের ইলেক্ট্রন প্রোটনগুলি আপনার পায়ের উপর একটি বিকর্ষণ বল প্রয়োগ করছে।

এই বল পৃথিবীর মহাকর্ষকে পরাস্ত করার পক্ষে পর্যাপ্ত। এই বলই আপনাকে পৃথিবীর ভিতর দিয়ে পড়ে যেতে বাধা দেয়। পৃথিবীকে দেখতে ঘন (solid) হলেও আসলে তার অধিকাংশই শূন্যস্থান।

নবম অধ্যায়

আইনস্টাইনের মহাকর্ষীয় বিধির প্রমাণ

নিউটনের মহাকর্ষীয় বিধির স্থলে আইনস্টাইনের মহাকর্ষীয় বিধি গ্রহণ করার কারণ অংশত প্রয়োগজ (empirical) এবং অংশত যৌক্তিক (logical)। আমরা শুরু করব প্রথমটা দিয়ে।

গ্রহ এবং তাদের উপগ্রহগুলির কক্ষ গণনায় প্রয়োগ করলে নূতন মহাকর্ষীয় বিধি এবং পুরানো মহাকর্ষীয় বিধির ফলশ্রুতি প্রায় একই। তা না হলে নূতন বিধি সত্য হতে পারত না, তার কারণ, দেখা গিয়েছে প্রাচীন বিধি থেকে আহরিত ফলাফল পর্যবেক্ষণের সাহায্যে প্রায় নির্ভুলভাবে প্রমানিত হয়েছে। আইনস্টাইনের নূতন বিধি প্রকাশিত হয় ১৯১৫ সালে। প্রাচীন বিধির তুলনায় তাঁর নূতন বিধি যে ভাল সেটা দেখানোর জন্য তখন তিনি পরীক্ষালব্ধ একটি তথ্যই উপস্থিত করতে পারতেন। সেটা হল : বুধ (Mercury) গ্রহের অনুসূরের (perihelion) গতি।

অন্যান্য গ্রহের মত বুধগ্রহও উপবৃত্তাকারপথে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে। সূর্য থাক উপবৃত্তের একটি নাভিতে (focus ফোকাস)। এই কক্ষের কোনো কোনো বিন্দুতে সূর্য কক্ষের অন্য বিন্দুর তুলনায় নিকটতর। যে বিন্দুতে গ্রহটি সূর্যের নিকটতম সেই বিন্দুর নাম অনুসূর (perihelion) পর্যবেক্ষণে দেখা গিয়েছিল সূর্যের নিকটতম হবার একটি ঘটনা থেকে ঐরকম পরের ঘটনায় যেতে বুধগ্রহ ঠিক নির্ভুল ভাবে সূর্যকে একবার প্রদক্ষিণ করে না, করে তার চাইতে একটু বেশী। এই গরমিল অতি সামান্য। এক শতাব্দীতে এর পরিমাণ বিয়াল্লিশ সেকেণ্ডের একটি কোণ। এক শতাব্দীতে বুধগ্রহ সূর্য প্রদক্ষিণ করে চারশ বারের চাইতে একটু বেশী। সুতরাং তাকে একটি অনুসূর থেকে অন্য অনুসূরে যেতে একটি আবর্তনের চাইতে ১/১০ সেকেণ্ড কোণ বেশী পরিভ্রমণ করতে হবে। নিউটনীয় তত্ত্বের সঙ্গে অতি সামান্য এই গরমিল জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের ধাঁধাঁয় ফেলত। অন্য গ্রহগুলির প্রভাবের অভিক্রিয়ার একটি হিসাব ছিল কিন্তু এই প্রভাবকে হিসাবের ভিতরে নিয়েও সেই সামান্য গরমিল অবশিষ্ট থেকে যায়। নূতন তত্ত্ব নির্ভুলভাবে সেই সামান্য গরমিলের হিসাব মিলিয়ে দিয়েছে। অন্য গ্রহগুলির ক্ষেত্রেও এই ধরণের অভিক্রিয়া রয়েছে কিন্তু সেটা আরও

অল্প। তাছাড়া এখনো সেগুলি নিশ্চিতভাবে পর্যবেক্ষণ করা হয়নি। প্রথমে বুধ গ্রহের গতির অনুসূরঅভিক্রিয়াই ছিল পুরানো তত্ত্বের তুলনায় নূতন তত্ত্বের একমাত্র পরীক্ষালব্ধ সাফল্য।

দ্বিতীয় সাফল্য ছিল আরও বেশী চাঞ্চল্যকর। প্রাচীন মত অনুসারে, শূন্যস্থানে আলোকের সব সময়ই ঋজুরেখায় ভ্রমণ করা উচিৎ। পদার্থকণা দিয়ে গঠিত না হওয়ার দরুণ আলোকের মহাকর্ষ দিয়ে প্রভাবিত না হওয়াই উচিৎ। প্রাচীন চিন্তাধারার সঙ্গে কোনো বিশেষ বিরোধিতা না করেও কিন্তু একথা মেনে নেওয়া যেত যে সূর্যের পাশ দিয়ে যাবার সময় আলোক পদার্থকণা দিয়ে গঠিত বস্তুর মত ঋজুপথ থেকে বিচ্যুত হতে পারে। নূতন তত্ত্ব অনুসারে কিন্তু আলোকের বিচ্যুতি এর দ্বিগুণ হতে হবে, অর্থাৎ একটি তারকার আলো যদি সূর্যের খুব কাছ দিয়ে যায় তাহলে তারকা থেকে বহির্গত আলোকরশ্মি পৌনে দুই সেকেণ্ডের একটু কম পরিমাণ কোণের বাঁক সৃষ্টি করবে। প্রাচীনপন্থীরা এর অর্ধেক পরিমাণ মানতে রাজী ছিলেন। অসুবিধা হল, সূর্যের সঙ্গে সমরেখায় অবস্থিত তারকাগুলি শুধুমাত্র পূর্ণগ্রহণের সময়ই দেখা যায়। এমনকি তখনো সূর্যের কাছাকাছি যথেষ্ট উজ্জ্বল তারকা না থাকতে পারে। এডিংটন (Eddington) দেখালেন এদিক থেকে বছরের সবচাইতে ভাল দিন ২৯শে মে। কারণ ঐ তারিখে সূর্যের কাছাকাছি অনেকগুলি উজ্জ্বল তারকা থাকে। এক অবিশ্বাস্য সৌভাগ্যের ফলে ১৯১৯ সালের ২৯শে মে সূর্যের পূর্ণগ্রহণ ছিল। দুটি ব্রিটিশ অভিযান এই গ্রহণের সময় সূর্যের নিকটবর্তী তারকাগুলির ফটো তোলে। ফটো নূতন তত্ত্বের সত্যতা প্রমাণ করে। এর ফলে সে সময় বিরাট উত্তেজনা সৃষ্টি হয় তবে পর্যবেক্ষণে অনেক ভুলের উৎস থাকতে পারত এবং পরীক্ষাফল দ্বন্দ্বের সম্পূর্ণ মীমাংসা করেছে একথা বলা যায় না। পরবর্তী গ্রহণ পর্যবেক্ষণে তত্ত্বের ভবিষ্যৎবাণীর অর্ধেক থেকে দ্বিগুণ পর্যন্ত ফল পাওয়া গিয়েছে।

তবে ইদানীং আবিষ্কৃত হয়েছে কোয়াসার নামক একরকম তারকাজাতীয় শক্তিশালী বেতার তরঙ্গের উৎসগুলির ভিতরে কতগুলি থেকে নির্গত তরঙ্গ সূর্যের বেশ কাছ দিয়ে যায়। বছরের কোনো কোনো সময় ব্যাপারটা পৃথিবী থেকে দেখা যায়। নূতন তত্ত্বে আলোকের বিচ্যুতি সম্পর্কীয় ভবিষ্যদ্বাণী বেতার তরঙ্গের বিচ্যুতি সম্পর্কেও সমভাবে প্রযোজ্য। মাইল

কুড়ি কিংবা তার কাছাকাছি দূরত্বে দুটি কিংবা বেশী সংখ্যক বেতার দূরবীক্ষণ (রেডিও টেলিস্কোপ) যন্ত্র ব্যবহার করে অতি নির্ভুলভাবে বিচ্যুতি মাপা সম্ভব। পরীক্ষা ফলের সঙ্গে নূতন তত্ত্বের ভবিষ্যদ্বাণীর ঘনিষ্ঠ ঐক্য রয়েছে।

নূতন তত্ত্বের তৃতীয় পরীক্ষামূলক ভবিষ্যদ্বাণীর সত্যতাও খুব নির্ভুলভাবে প্রমাণিত হয়েছে। অবশ্য আইনস্টাইন পরীক্ষাটা প্রথমে যেভাবে করার প্রস্তাব করেছিলেন এখন আর সেভাবে পরীক্ষা করা হয় না। আলোচ্য অভিক্রিয়া (effect) ব্যাখ্যা করার আগে কয়েকটি প্রাথমিক ব্যাখ্যা প্রয়োজন। একটি মৌলিক পদার্থ তাপদীপ্ত হলে তার বর্ণালীতে নানারকম রেখা থাকে—তাপদীপ্ত মৌলিক পদার্থ থেকে নির্গত আলোকের বর্ণালী নানা রঙের রেখা দিয়ে গঠিত। সেগুলিকে ত্রিপার্শ্ব (prism) কাচ দিয়ে পৃথক করা যায়। মৌলিক পদার্থটি পৃথিবী, সূর্য কিংবা তারকা যেখানেই থাকুক না কেন বর্ণালী তার একই থাকে (ঘনিষ্ঠ আসন্নতা পর্যন্ত—to a close approximation)। প্রতিটি রেখাই একটি নির্দিষ্ট রঙের এবং তার তরঙ্গ দৈর্ঘ্যও নির্দিষ্ট। দীর্ঘতর তরঙ্গ দৈর্ঘ্যগুলি থাকে বর্ণালীর লাল প্রান্তের দিকে, হ্রস্বতরগুলি থাকে বেগুনি প্রান্তের দিকে। আপনি যখন বাতাসের বিপক্ষে চলেছেন তখন সমুদ্রের ঢেউগুলি দ্রুততর আসে। ঠিক তেমনি আপনার এবং আলোকের উৎসের ভিতরে দূরত্ব যখন কমতে থাকে আপাতদৃষ্ট তরঙ্গ দৈর্ঘ্য তখন বাড়তে থাকে। এর সাহায্যে আমরা বুঝতে পারি তারকাগুলি আমাদের নিকটতর হচ্ছে না, আমাদের কাছ থেকে দূরতর হচ্ছে। দূরত্ব যদি কমতে থাকে তাহলে একটি মৌলিক পদার্থের বর্ণালীর সমস্ত রেখাগুলিই বেগুনির দিকে একটু সরে যাবে। দূরত্ব যদি বাড়তে থাকে তাহলে সরবে লালের দিকে। শব্দের ক্ষেত্রে একই রকম অভিক্রিয়া আপনি যে কোনো দিন লক্ষ্য করতে পারেন। আপনি যদি একটি স্টেশনে দাঁড়িয়ে থাকেন এবং হুইসল দিতে দিতে একটা এক্সপ্রেস ট্রেন আসে তাহলে ট্রেনটি আপনার কাছ থেকে চলে যাওয়ার সময়ের স্বরের তুলনায় ট্রেনটি যখন আপনার দিকে আসছে তখনকার স্বর অনেক বেশী তীক্ষ্ন (shrill) মনে হবে। অনেকে হয়তো ভাবেন স্বরের সত্যিই কোনো পরিবর্তন হয়েছে। আসলে কিন্তু শ্রুতির পরিবর্তনের কারণ ট্রেনটা প্রথমে আপনার দিকে আসছিল তারপরে আপনার কাছ থেকে দূরে সরে যাচ্ছিল। গাড়ীর ভিতরের লোকের ক্ষেত্রে কিন্তু

স্বরের কোনো পরিবর্তন হয়নি। যে সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছিল এটা সে অভিক্রিয়া নয়। নূতন তত্ত্ব অনুসারে একটি পরমাণু যেখানেই থাকুক না কেন তার অভ্যন্তরে সংঘটিত যে কোনো পর্যাবৃত্তক্রিয়া (periodic process) একই কাল 'অন্তর' (interval) স্থায়ী। কিন্তু এক জায়গার কাল অন্তর অন্য জায়গার একই কাল অন্তরের নির্ভুল অনুরূপ হয় না। তার কারণ : যে স্থান-কাল মহাকর্ষ গঠন করে তার 'পাহাড়ী' (hilly) চরিত্র।

তত্ত্বের ভবিষ্যদ্বাণী : ভূমিতলে অবস্থিত একটি পরমাণুর ভিতরে সংঘটিত একটি পর্যাবৃত্ত (periodic process) ক্রিয়ার হার (rate) খুব উচু একটা বাড়ীর ছাতে অবস্থিত একই পরমাণুর ভিতরে সংঘটিত একই পর্যাবৃত্ত ক্রিয়ার হারের চাইতে একটু মন্থরতর (slightly slower rate)। আলোক-রশ্মি উৎসর্জন (emission) আসলে একটি পর্যাবৃত্ত ক্রিয়া। এ ক্রিয়া যদি মন্থরতর হয় তাহলে দুটি তরঙ্গ শীর্ষের (wave crest) মধ্যবর্তী স্থান অধিকতর হওয়া অনুমোদিত হবে সুতরাং দীর্ঘতর তরঙ্গ দৈর্ঘ্য সম্পন্ন আলোক উৎপাদিত হবে। অতএব আলোক যখন ভূমিতল থেকে বাড়ীর ছাতে প্রেরিত হয় তখন বাড়ীর ছাতে অবস্থিত পর্যবেক্ষকদের মনে হবে সেই আলোকের বর্ণালীর একটি বিশেষ রেখা, আলোকটি যদি তাদের নিজেদের তল থেকে প্রেরিত হয় তাহলে তার বর্ণালীর ঐ রেখার তুলনায়, বর্ণালীর লাল প্রান্তের নিকটতর।

আইনস্টাইনের ভবিষ্যদ্বাণী সূর্যে অবস্থিত পরমাণুগুলি থেকে উৎসারিত আলোক তরঙ্গের সঙ্গে পৃথিবীতে অবস্থিত পরমাণুগুলি থেকে উৎসারিত আলোক তরঙ্গের তুলনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। ভূ-পৃষ্ঠের মহাকর্ষীয় ক্ষেত্রের তুলনায় সূর্যপৃষ্ঠের মহাকর্ষীয় ক্ষেত্র অত্যন্ত শক্তিশালী। সুতরাং ভূমিতল এবং ছাতের ক্ষেত্রে তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের পার্থক্যের তুলনায় এ ক্ষেত্রে তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের পার্থক্য বৃহত্তর কিন্তু সূর্যালোকে মাপনের অসুবিধা এত বেশী যে মাপন ফল সিদ্ধান্তমূলক হয়নি। তারকার আলোক মাপনের ক্ষেত্রেও ব্যাপারটা একই। সে ক্ষেত্রেও একই অভিক্রিয়া হওয়া উচিৎ। প্রথম ভবিষ্যদবাণীর সময় পার্থিব (terrestrial) মাপন অসম্ভব ছিল। কিন্তু গত পঁচিশ বছরে আবিষ্কৃত নূতন পদ্ধতিগুলির সাহায্যে অতীব নির্ভুলভাবে জানা তরঙ্গ দৈর্ঘ্য সম্পন্ন আলোক সঙ্কেত প্রেরণ সম্ভব হয়েছে এবং যে অভিক্রিয়া সম্পর্কে

ভবিষ্যদ্‌বাণী করা হয়েছিল সে অভিক্রিয়া বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার সাহায্যে নির্ভুলভাবে প্রামাণিত হয়েছে।

নূতন মহাকর্ষীয় বিধি এবং প্রাচীন বিধির ভিতরে আরো অনেক পার্থক্য রয়েছে। তার অনেকগুলির সত্যতা বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার সাহায্যে নির্ভুলভাবে প্রমাণিত হয়েছে। এর ভিতরে সবচাইতে নির্ভুল হল 'কাল বিলম্বী' (time delay) অভিক্রিয়া। এ সম্পর্কে ভবিষ্যদ্‌বাণী ১৯৬৪ সালের আগে করা হয়নি। অর্থাৎ নূতন তত্ত্ব উপস্থাপনের প্রায় পঞ্চাশ বছর পর এই তত্ত্ব উপস্থাপিত হয়েছে।

এর কারণ বোধ হয় : আলোচ্য কাল বিলম্ব এক সেকেন্ডের দশলক্ষ ভাগের কয়েক শত অংশ মাত্র (few hundred millionth of a second)। তার বেশী নয়—এবং এত ক্ষুদ্র কাল মাপন সম্ভব হয়েছে সম্প্রতি। ভবিষ্যদ্‌বাণীটি হল : নিকটে যখন মহাকর্ষীয় পাহাড় নেই তখনকার তুলনায় মহাকর্ষীয় পাহাড় যখন রয়েছে তখন একটি নির্বাচিত স্থান থেকে অন্য নির্বাচিত স্থানে যেতে একটি আলোক সঙ্কেতের সময় বেশী লাগবে। রাডার (radar) সঙ্কেত সম্পর্কেও এ ভবিষ্যদ্‌বাণী সমভাবে প্রযোজ্য। এই পরীক্ষাগুলিতে পৃথিবী থেকে একটি রাডার সঙ্কেত অন্য একটি গ্রহ কিংবা একটি কৃত্রিম উপগ্রহে পাঠানো হয় এবং সঙ্কেতগুলি প্রতিফলিত হয়ে পৃথিবীতে ফিরে আসে। প্রতিফলকটি (reflecting agent) যখন সূর্যের দূরতর পার্শ্বে অবস্থিত মাপন তখনই করা হয়। এক্ষেত্রে সূর্য মহাকর্ষীয় পাহাড়ের ভূমিকা পালন করে। পরীক্ষা ফল অতি নির্ভুলভাবে ভবিষ্যদ্‌বাণীর সত্যতা পালন করে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে ভুলের পরিমাণ এক সহস্রাংশের চাইতেও কম।

মহাকাশে বস্তুপিণ্ডগুলির গতি সম্পর্কে যে সমস্ত ক্ষেত্রে নূতন তত্ত্ব এবং পুরাতন তত্ত্বে মতভেদ হয় সেই সমস্ত ক্ষেত্রে নূতন তত্ত্বই নির্ভুল ফল প্রদান করে। জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের এ তথ্য বিশ্বাস করাতে প্রাগুক্ত বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাগুলিই যথেষ্ট। নূতন তত্ত্বের সপক্ষে পরীক্ষা মূলক ভিত্তি যদি নিঃসঙ্গও হোত, তাহলেও সে ভিত্তি হোত প্রামাণ্য। নূতন বিধি নির্ভুল সত্যের প্রতিরূপ হোক কিংবা না হোক, প্রাচীন বিধির তুলনায় যে নূতন বিধি সত্যের নিকটতর সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। অথচ প্রাচীন বিধিতে ভুল ছিল অতীব সামান্য।

প্রথমে যে কারণগুলি ছিল নূতন বিধি আবিষ্কারের পথিকৃৎ সেগুলি কিন্তু এত বিস্তৃত ছিল না। এমন কি বুধগ্রহের অনুসূর সম্পর্কীয় যে ফলশ্রুতি সেটাও আহরণ করা সম্ভব ছিল শুধুমাত্র তত্ত্বটি সম্পূর্ণ হবার পর এবং পূর্বেকার পর্যবেক্ষণের সাহায্যেই বুধগ্রহ সম্পর্কীয় তথ্য প্রমাণ করা যেত। তবুও এ তথ্য কোনোক্রমেই এরকম একটি তত্ত্ব আবিষ্কারের প্রাথমিক কারণের কোনো অংশ হতে পারে না। এ কারণগুলির চরিত্র ছিল আরও বিমূর্ত এবং যৌক্তিক। এ কথা আমি বলছি না যে এগুলি ছিল পূর্বতঃ সিদ্ধ (a priori) কল্পনা অর্থাৎ প্রাচীনকালের দার্শনিকরা যা করতেন সেই রকম। আমি বলতে চাইছি : এগুলি আহরণ করা হয়েছিল ভৌত অভিজ্ঞতার কয়েকটি সাধারণ চরিত্র থেকে। সেগুলি থেকেই বোঝা গিয়েছিল যে প্রাচীন বিধি নিশ্চয়ই ভুল এবং নূতন বিধির মত কিছু একটা প্রতিস্থাপন করতেই হবে।

আগের অধ্যায়গুলিতে আমরা দেখেছি গতির আপেক্ষিকতা সম্পর্কীয় যুক্তিগুলি চূড়ান্ত সিদ্ধান্তকারী (quite conclusive)। দৈনন্দিন জীবনে যখন আমরা বলি একটা কিছু চলছে তখন আমরা বোঝাতে চাই সেটা চলছে পৃথিবী সাপেক্ষ। গ্রহগুলির গতি বিচারের সময় আমরা ভাবি সেগুলি চলছে সূর্যসাপেক্ষ কিংবা সৌরতন্ত্রের ভরের কেন্দ্র সাপেক্ষ। যখন আমরা বলি সৌরতন্ত্র নিজেই চলমান তখন আমরা বোঝাতে চাই—এটা চলছে তারকাপুঞ্জ সাপেক্ষ। এমন কোনো ভৌত ঘটনা নেই যার নাম দেওয়া যেতে পারে পরমগতি (absolute motion)। সুতরাং ভৌতবিধির বিচার্য হতে হবে আপেক্ষিক গতি। কারণ একমাত্র সেইরকম গতিই বাস্তবে ঘটে।

এখন আমরা গতির আপেক্ষিকতাকে এই পরীক্ষামূলক তথ্যের সঙ্গে মিলিয়ে গ্রহণ করতে চাইছি : দুটি বস্তুপিণ্ড যেভাবেই চলমান হোক না কেন আলোকের বেগ একটি সাপেক্ষ যা অন্যটি সাপেক্ষও তাই। ঐ তথ্যই দূরত্ব এবং কালের আপেক্ষিকতার পথিকৃৎ। এ তথ্যই আবার দেখিয়ে দেয় : এমন কোনো বস্তুনিষ্ঠ ভৌত ঘটনা নেই যাকে বলা যায় একটি নির্দিষ্ট সময়ে দুটি বস্তুপিণ্ডের অন্তর্বর্তী দূরত্ব। কারণ কাল এবং দূরত্ব দুটোই নির্ভর করে পর্যবেক্ষকের উপর। সুতরাং প্রাচীন মহাকর্ষীয় বিধি যৌক্তিক বিচারে গ্রাহ্য নয়। কারণ এ বিধি "একটি নির্দিষ্ট কালে দূরত্ব" ব্যবহার করে।

এ থেকে বোঝা যায়—আমরা প্রাচীন বিধি নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে পারি

না। কিন্তু তার জায়গায় কি প্রতিস্থাপন করতে হবে সেটা বোঝা যায় না। এখানে কয়েকটি বিষয় এসে পড়ে। প্রথমত আমাদের রয়েছে "মহাকর্ষীয় ভর এবং জড়ত্বীয় ভরের সমতা"। এর অর্থ হল : একটি বস্তুপিণ্ডের প্রতি একটি নির্দিষ্ট বল* প্রয়োগ করলে সেটা যদি হাল্কা হয় তাহলে তাকে যতটা ত্বরণ দান করা সম্ভব ভারী হলে সেটাকে ততটা ত্বরণ আপনি দান করতে পারেন না। একটি বিশেষ ত্বরণ দান করতে যে পরিমাণ বল প্রয়োজন হয় সেটাই একটি বস্তুপিণ্ডের জড়ত্বীয় ভরের মাপ (measure)। ভূ-পৃষ্ঠের একটি নির্দিষ্ট বিন্দুতে 'ভর' (mass) এবং 'ওজন' (weight) আনু-পাতিক। দাঁড়িপাল্লা দিয়ে যেটা মাপা হয় সেটা ঠিক ওজন নয় সেটা আসলে ভর। ওজনের সংজ্ঞা : একটি বস্তুপিণ্ডকে পৃথিবী যে বল দিয়ে আকর্ষণ করে সেটাই ওজন। এ বল বিষুবরেখাতে যতটা, মেরু প্রদেশে তার চাইতে বেশী। তার কারণ বিষুবরেখাতে পৃথিবীর আবর্তন একটি "অপকেন্দ্রীক (centrifugal)" বল সৃষ্টি করে। সেই বল আংশিকভাবে মহাকর্ষের বিরোধী। অতি উচ্চে কিংবা অতি গভীর খনির তলদেশের তুলনায় ভূ-পৃষ্ঠে পৃথিবীর আকর্ষণী বল বৃহত্তর। দাঁড়িপাল্লায় কিন্তু এই পরিবর্তনগুলি বোঝা যায় না কারণ ওজন করার বাটখারা এবং যে বস্তুপিণ্ড ওজন করা হবে দুইয়ের উপরই এই পরিবর্তনগুলি সমান ক্রিয়া করে। তবে স্প্রিং-এর ওজন কল ব্যবহার করলে পরিবর্তনগুলি বোঝা যায়। ওজনের এই সমস্ত পরি-বর্তনের সময় ভরের কোনো পরিবর্তন হয় না।

মহাকর্ষীয় ভরের সংজ্ঞা ভিন্ন। এর অর্থ দুরকম হতে পারে। আমরা অর্থ করতে পারি—

(১) মহাকর্ষের তীব্রতা যেখানে জানা আছে সেখানে একটি বস্তুপিণ্ডের প্রতিক্রিয়ার ধরন—উদাহরণ : ভূ-পৃষ্ঠে কিংবা সূর্য-পৃষ্ঠে।

---

*ফুটনোট : আগেই দেখানো হয়েছে নূতন তত্ত্বে "মহাকর্ষীয় বল"-কে আর গতিবিদ্যার (dynamics) মৌল কল্পনরূপে বিচার করা হয় না—একে ব্যবহার করা হয় বলার সুবিধার জন্য। ঠিক যেমন আমরা 'সূর্যোদয়' 'সূর্যাস্ত' শব্দ ব্যবহার করি "মহাকর্ষীয় বল"-ও তেমনি ব্যবহার করা যেতে পারে। অবশ্য আমাদের বুঝতে হবে আমরা কি বলতে চাইছি। অনেক সময় বল শব্দটি এড়ানোর জন্য অত্যন্ত ঘোরানো অনেক কথা ব্যবহার করতে হয়।

(২) বস্তুপিণ্ডটি যে মহাকর্ষীয় বল সৃষ্টি করে তার তীব্রতা—উদাহরণ : পৃথিবীর তুলনায় সূর্য বেশী শক্তিশালী মহাকর্ষীয় বল সৃষ্টি করে। পুরানো তত্ত্ব বলে : দুটি বস্তুপিণ্ডের অন্তর্বর্তী মহাকর্ষীয় বল তাদের ভরের গুণফলের আনুপাতিক। এইবার বিচার করা যাক—একই বস্তুপিণ্ডের (ধরুন—সূর্য) প্রতি বিভিন্ন বস্তুপিণ্ডের আকর্ষণ। এক্ষেত্রে বিভিন্ন বস্তুপিণ্ড যে বল দ্বারা আকর্ষিত হয় সে বল তাদের ভরের আনুপাতিক। সুতরাং সেই বলগুলি সবার ভিতরে নির্ভুলভাবে একই ত্বরণ সৃষ্টি করে। অতএব আমরা যদি 'মহাকর্ষীয় ভর' বাক্যে বোঝাতে চাই প্রথম অর্থ (১) অর্থাৎ মহাকর্ষ সাপেক্ষ একটি বস্তুপিণ্ডের প্রতিক্রিয়া তাহলে আমরা দেখতে পাই "জড়ত্বীয় এবং মহাকর্ষীয় ভরের সমতা"। কথাটা শুনতে ভয়াবহ হলেও এর অর্থটা হল : একটি নির্দিষ্ট মহাকর্ষীয় পরিস্থিতিতে সমস্ত বস্তুপিণ্ডের আচরণ নির্ভুলভাবে এক। ভূ-পৃষ্ঠ সাপেক্ষ গ্যালিলিও-র প্রধান আবিষ্কারগুলির ভিতরে এই আবিষ্কারটিও ছিল। এরিস্তোতল ভাবতেন হাল্কা বস্তুপিণ্ডের তুলনায় ভারী বস্তুপিণ্ডের পতন হয় দ্রুততর। গ্যালিলিও দেখিয়েছিলেন বাতাসের বাধা না থাকলে এ তথ্য সত্য নয়। শূন্যস্থানে একটি পালক এক ডেলা সীসার মতই তাড়াতাড়ি পড়ে। গ্রহপুঞ্জ সম্পর্কে অনুরূপ তথ্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন নিউটন। সূর্য থেকে একটি নির্দিষ্ট দূরত্বে অবস্থিত একটি ধূমকেতু এবং একটি গ্রহের দূরত্ব এক হলেও সূর্যের অভিমুখে তারা একই রকম ত্বরণ অনুভব করবে। অথচ ধূমকেতুর ভর অত্যন্ত কম। সুতরাং একটি বস্তুপিণ্ডকে মহাকর্ষ কিভাবে প্রভাবান্বিত করে সেটা নির্ভর করে তার অবস্থানের উপর, কোনোক্রমেই বস্তুপিণ্ডের ধর্মের (nature) উপর নির্ভর করে না। এ থেকে মনে হয় মহাকর্ষীয় অভিক্রিয়া অঞ্চলের চরিত্রের (characteristic of the locality)। আইনস্টাইন এই মতই প্রতিষ্ঠা করে গিয়েছেন।

দ্বিতীয় অর্থে (২) মহাকর্ষীয় ভর বিষয়ে অর্থাৎ একটি বস্তুপিণ্ড যে বল উৎপন্ন করে তার তীব্রতা সম্পর্কে নূতন তত্ত্বের ভবিষ্যদ্বাণী : প্রথম অর্থে মহাকর্ষীয় ভর এবং দ্বিতীয় অর্থে মহাকর্ষীয় ভর অভিন্ন। এ ভবিষ্যদ্বাণীর সত্যতা প্রমাণ করে এরকম একটি বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা অন্তত করা হয়েছে।

যদি একটি সান্নিধ্যের বৈশিষ্ট্য (characteristic of a neighbourhood)

হতে হয় তাহলে মহাকর্ষীয় বিধির কি রকম হওয়া আবশ্যিক (must be) সে সম্পর্কে আমাদের আর একটি ইঙ্গিত রয়েছে। কারণ, সান্নিধ্যের বৈশিষ্ট্য হতে পারে এ রকম অনুমান করার যুক্তি আমরা দেখেছি। এটা এমন একটা বিধিতে প্রকাশ করা উচিৎ যে বিধি আমরা অন্য রকম স্থানাঙ্ক গ্রহণ করলেও অপরিবর্তিত থাকে। আমরা আগেই দেখেছি—শুরু থেকে আমরা কখনোই আমাদের স্থানাঙ্কগুলির কোনো ভৌত গুরুত্ব আছে একথা মনে করব না, স্থানাঙ্কগুলি স্থান-কালের বিভিন্ন অংশের সুসম্বন্ধ নামকরণের পদ্ধতিমাত্র। এগুলি শুধুমাত্র রীতিরক্ষা করে (conventional)। সেইজন্য এগুলি কোনো ভৌতবিধির অংশ হতে পারে না। একথা বলার অর্থ যদি এক গুচ্ছ (set) স্থানাঙ্ক সাপেক্ষ একটি বিধি নির্ভুলভাবে প্রকাশ করে থাকি তাহলে অন্য একগুচ্ছ স্থানাঙ্ক সাপেক্ষও একই সঙ্কেতের (formula) সাহায্যে সে বিধিকে অবশ্যই প্রকাশিত হতে হবে। কিংবা আরও নির্ভুলভাবে বলা যায় : বিধিটিকে প্রকাশ করে এমন একটি সঙ্কেত অবশ্যই আবিষ্কার করা সম্ভব হতে হবে যে স্থানাঙ্কের পরিবর্তন আমরা যে ভাবেই করি না কেন সে সঙ্কেত অপরিবর্তিত থাকবে। সে রকম সঙ্কেত নিয়ে কাজকর্ম করার দায়িত্ব টেন্সর সম্পর্কীয় তত্ত্বের (theory of tensors)। টেন্সর তত্ত্ব দেখিয়েছে : সম্ভাব্য মহাকর্ষীয় বিধিরূপে এমন একটি সঙ্কেত রয়েছে যে সঙ্কেতকে অন্য সঙ্কেতগুলির চাইতে বেশী উপযুক্ত মনে হয়। পরীক্ষা করলে দেখা যায় এই সম্ভাব্যতাই সঠিক ফল দান করে। পরীক্ষামূলক সত্যতা নির্দ্ধারণের প্রশ্ন আসে এখানেই। যদি দেখা যেত যে নূতন বিধির অভিজ্ঞতার সঙ্গে ঐক্য নেই তাহলেও কিন্তু আমরা পুরানো বিধিতে ফিরে যেতে পারতাম না। যুক্তি আমাদের এমন একটি বিধি খুঁজে বার করতে বাধ্য করত—যে বিধিতে গতি, দূরত্ব এবং কালের আপেক্ষিকতা গ্রথিত। এ বিধি প্রকাশিত হোত টেন্সরের বাগ্বিধিতে। গণিত ছাড়া টেন্সর তত্ত্ব ব্যাখ্যা করা অসম্ভব। গণিত যিনি জানেন না তাঁকে এই জ্ঞান নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হবে যে এটা প্রযুক্তির এমন একটি পদ্ধতি যার সাহায্যে আমরা আমাদের মাপন এবং বিধি থেকে রীতিগত উপাদান বাদ দিতে পারি এবং এইভাবে এমন সমস্ত ভৌতবিধিকে পেতে পারি যে বিধি পর্যবেক্ষকের দৃষ্টিভঙ্গির অধীন নয়। এই পদ্ধতির সবচাইতে চমৎকার উদাহরণ আইনস্টাইনের মহাকর্ষীয় বিধি।

দশম অধ্যায়

ভর, ভরবেগ (Momentum) শক্তি (Energy) এবং ক্রিয়া (Action)

পরিমাণগত নির্ভুলতার চেষ্টা যেমন কষ্টসাধ্য তেমনি গুরুত্বপূর্ণ। ভৌত মাপন করা হয় অসাধারণ নির্ভুলতার সঙ্গে। মাপন ক্রিয়ায় কম যত্ন নেওয়া হলে যে সূক্ষ্ম ভুলগুলি অপেক্ষবাদের পরীক্ষামূলক উপাত্ত সেগুলি কখনোই প্রকাশিত হোত না। অপেক্ষবাদের আগে গাণিতিক পদার্থবিদ্যা যে কল্পনগুলি ব্যবহার করতো সেগুলিকে মনে করা হোত ভৌত মাপনের মতই নির্ভুল কিন্তু পরে দেখা গেল সেগুলি যৌক্তিক দোষদুষ্ট। এই দোষ প্রকাশ পেয়েছে গণনার ভিত্তিতে যা আশা করা গিয়েছিল তা থেকে সামান্য বিচ্যুতিতে। এই অধ্যায়ে আমি দেখাতে চাই অপেক্ষবাদের আগেকার পদার্থবিদ্যার মৌল ধারণাগুলি কিভাবে প্রভাবিত হয়েছে এবং সে ধারণাগুলির ভিতরে কি পরিবর্তন আনতে হয়েছে।

ভর সম্পর্কে এর আগে আমরা বলেছি। আমাদের দৈনন্দিন জীবন যাত্রার ক্ষেত্রে ভর এবং ওজন একই। আউন্স, গ্রাম ইত্যাদি ওজন করার সাধারণ বাটখারাগুলি আসলে ভরের মাপ। কিন্তু নির্ভুল মাপন শুরু করার সঙ্গে সঙ্গেই আমরা ভর এবং ওজনের পার্থক্য মানতে বাধ্য হই। ওজন করার দুটি পদ্ধতি সাধারণত ব্যবহার করা হয়—দাঁড়িপাল্লা আর স্প্রিং-এর ওজন-কল। ভ্রমণে যাওয়ার সময় আপনার মালপত্র চাপানো হয় স্প্রিং-এর উপরে, দাঁড়িপাল্লায় নয়। ওজনের চাপে স্প্রিং খানিকটা নেমে যায়—আর সেটা দেখানো হয় ডায়ালের (dial—মুখপট্ট) সূঁচ দিয়ে। আপনার ওজন দেখবার জন্য যে স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র আছে তাতেও একই পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়। স্প্রিং-এর ওজনকল দেখায় ওজন কিন্তু দাঁড়িপাল্লা দেখায় ভর। যতক্ষণ আপনি পৃথিবীর একই অংশে রয়েছেন ততক্ষণ এ পার্থক্যে কিছু এসে যায় না। কিন্তু আপনি যদি বিভিন্ন স্থানে দুই ধরনের দুটি ওজনকল ব্যবহার করেন এবং সেগুলি যদি নির্ভুল হয় তাহলে দেখবেন তাদের মাপনফল সব সময় এক হয় না। দাঁড়িপাল্লার মাপনফল সব জায়গায়ই এক হবে কিন্তু স্প্রিং-এর ওজনকলে তা হবে না। অর্থাৎ আপনার কাছে যদি দাঁড়িপাল্লার ওজনে দশ পাউন্ড সীসা থাকে তাহলে দাঁড়িপাল্লায় ওজন করলে পৃথিবীর

যে কোনো জায়গায়ই তার ওজন দশ পাউণ্ড হবে। কিন্তু লণ্ডনে যদি ওজন স্প্রিং-এর কলে দশ পাউণ্ড হয় তাহলে উত্তর মেরুতে ওজন হবে বেশী, বিষুবরেখায় হবে কম, বিমানে উচুতে উঠলে হবে কম আর কয়লা খনির তলায়ও কম হবে—অবশ্য ঐ সমস্ত জায়গায় যদি একই স্প্রিং-এর কলে ওজন করা হয়। আসলে দুটি যন্ত্র—দুটি একেবারেই ভিন্ন পরিমাণ (quantity) মাপে। দাঁড়িপাল্লা যা মাপে তাকে বলা হয় [এখন আমরা যে পরিমার্জনা (refinement) বিচার করব সেটা বাদ দিলে] পদার্থের পরিমাণ। এক পাউণ্ড সীসা আর এক পাউণ্ড পালকে একই পরিমাণ পদার্থ রয়েছে। প্রমাণ 'ওজন' আসলে প্রমাণ 'ভর'। দাঁড়িপাল্লার অন্য দিকটায় যে কোনো বস্তু চাপিয়ে দিয়ে সেই বস্তুর ভর এগুলি দিয়ে মাপা হয়। ওজন কিন্তু এমন একটি ধর্ম যার কারণ পৃথিবীর মহাকর্ষ। এটা হল সেই পরিমাণ বল যা দিয়ে পৃথিবী একটি বস্তুপিণ্ডকে আকর্ষণ করে। স্থান থেকে স্থানান্তরে এই বলের পরিবর্তন হয়। প্রথমত পৃথিবীর বাইরে যে কোনো জায়গায় এই বল পৃথিবীর কেন্দ্র থেকে তার দূরত্বের বর্গের ব্যস্তপরিবর্তী (varies inversely)। সুতরাং বেশী উচুতে এ বল কম। দ্বিতীয়ত, আপনি যখন কয়লা খনির তলায় যান পৃথিবীর খানিকটা অংশ থাকে আপনার উপরে এবং পদার্থকে নিচে আকর্ষণ না করে উপরে আকর্ষণ করে ফলে নিচের দিকে মোট আকর্ষণ ভূ-পৃষ্ঠের তুলনায় কম। তৃতীয়ত, পৃথিবীর আবর্তনের দরুন সৃষ্টি হয় 'অপকেন্দ্র' বল (centrifugal force)—সে বল মহাকর্ষের বিরুদ্ধে ক্রিয়া করে। অপকেন্দ্র বল সবচাইতে বেশী বিষুবরেখায় কারণ আবর্তনের ফলে সেখানেই বেগ সবচাইতে বেশী। মেরু প্রদেশে এ বলের অস্তিত্ব নেই কারণ মেরুগুলি আবর্তনের অক্ষে অবস্থিত। এই সমস্ত কারণে একটি বস্তুপিণ্ডকে যে বল দিয়ে পৃথিবী আকর্ষণ করে সে বল এক এক জায়গায় এক এক রকম। এবং এ পার্থক্য মাপনযোগ্য। স্প্রিং-এর মাপন যন্ত্র এই বলই মাপে। এই জন্যই স্প্রিং-এর যন্ত্রের মাপনফল এক এক জায়গায় এক এক রকম। দাঁড়িপাল্লায় যে বস্তুপিণ্ড ওজন করা হবে সেটা এবং প্রমাণ বাটখারা একই রকম পরিবর্তিত হয়। সুতরাং দাঁড়িপাল্লার ক্ষেত্রে মাপন ফল সর্বত্রই সমান কিন্তু এই মাপনফল ওজন নয় আসলে এটা ভর। একটি প্রমাণ ওজনের ভর সর্বত্রই এক কিন্তু ওজন সর্বত্র এক নয়। আসলে এটা ভরের একক (unit) ওজনের নয়। একটি

বিশেষ বস্তুপিণ্ডের ভর অপরিবর্তী (invariable)। তাত্ত্বিক উদ্দেশ্যে ভরের গুরুত্ব ওজনের চাইতে অনেক বেশী। পরিস্থিতি অনুসারে ওজনের পরিবর্তন হয়। শুরুতে ভরকে "পদার্থের পরিমাণ" বলে ভাবা যেতে পারে। পরে আমরা দেখব এ দৃষ্টিভঙ্গিও সম্পূর্ণ নির্ভুল নয় কিন্তু পরবর্তী পরিমার্জন (refinements) শুরু করার জন্য শুরুতে এই অর্থে আমাদের কাজ চলতে পারে।

তাত্ত্বিক উদ্দেশ্যে ভরের সংজ্ঞা নির্ধারিত হয় একটি নির্দিষ্ট ত্বরণ সৃষ্টি করতে যে পরিমাণ বল প্রয়োজন হয় তাই দিয়ে : একটি বস্তুপিণ্ডের ভর যত বেশী হবে একটি নির্দিষ্ট কালে তার বেগের একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ পরিবর্তন আনতে তার তত বেশী বলের প্রয়োজন হবে। একটি হ্রস্ব রেলগাড়ীর তুলনায় একটি দীর্ঘ রেলগাড়ীর প্রথম আধ মিনিটে ঘণ্টায় দশ মাইল বেগ লাভ করতে অনেক বেশী শক্তিশালী ইঞ্জিন প্রয়োজন হবে। কিংবা আমাদের এমন পরিস্থিতি হতে পারে যেখানে বিভিন্ন বস্তুপিণ্ড সাপেক্ষ বল অভিন্ন। সেক্ষেত্রে আমরা সেগুলিতে উৎপন্ন ত্বরণ মেপে তাদের ভরের পারস্পরিক অনুপাত বলতে পারি : ভর যত বেশী, ত্বরণ তত কম। এই পদ্ধতির দৃষ্টান্ত হিসাবে আমরা অপেক্ষবাদের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ একটি উদাহরণ দিতে পারি। তেজস্ক্রিয় বস্তুপিণ্ডগুলি থেকে বিরাট বেগে ইলেক্ট্রন নির্গত হয়। জলীয় বাষ্পের ভিতর দিয়ে চালালে সেগুলি যাত্রাপথে মেঘ সৃষ্টি করে। এইভাবে আমরা তাদের যাত্রাপথ পর্যবেক্ষণ করতে পারি। একই সময় আমরা তাদের উপর জানিত বৈদ্যুতিক আর চৌম্বক বল প্রয়োগ করতে পারি এবং এই বলগুলির দ্বারা তারা ঋজুরেখা ছেড়ে কতটা বক্র হয়—সেটা পর্যবেক্ষণ করতে পারি। এইভাবে তাদের ভরের তুলনা করা সম্ভব হয়। নিশ্চল পর্যবেক্ষকের মাপন অনুসারে তাদের গতি যত দ্রুততর ভরও তাদের তত বৃহত্তর। এছাড়া অন্যভাবে জানা আছে গতির অভিক্রিয়া বাদ দিলে সমস্ত ইলেক্ট্রনের ভরই এক।

অপেক্ষবাদ আবিষ্কারের আগে এ সমস্তই জানা ছিল কিন্তু অপেক্ষবাদ দেখিয়েছে চিরায়ত কল্পনে ভরের উপর যে নির্দিষ্ট নিশ্চিত অর্থ আরোপ করা হয়েছিল সত্যিই সে নিশ্চিতি তার ছিল না। ভরকে ভাবা হোত 'পদার্থের পরিমাণ' এবং মনে করা হোত ভর একেবারেই অপরিবর্তী (quite invariable)। এখন কিন্তু দেখা গেল দৈর্ঘ্য এবং কালের মত

ভরও পর্যবেক্ষকনির্ভর (relative to the observer) এবং ঠিক একই অনুপাতে গতির দ্বারা পরিবর্তিত হয়। এরও কিন্তু প্রতিকার আছে, আমরা সঠিক ভর ঠিক করতে পারি। সেটা হবে বস্তুপিণ্ডের সঙ্গে সঙ্গতি-সম্পন্ন পর্যবেক্ষকের মাপন অনুসারে। দৈর্ঘ্য এবং কালের ক্ষেত্রে যেরকম, সেই একই অনুপাত নিয়ে মাপিত বল থেকে সহজেই এ অনুমিতি হয়েছিল (was easily inferred)।

কিন্তু আরও একটি অদ্ভুত ব্যাপার রয়েছে : এই সংশোধনের পরও কিন্তু আমরা এমন কোনো রাশি পাই না যেটা একই বস্তুপিণ্ড সম্পর্কে সর্বকালে অভিন্ন। একটি বস্তুপিণ্ড যখন শক্তি শোষণ করে—উদাহরণ : তপ্ততর হয়ে—তখন তার 'সঠিক ভর' (proper mass) সামান্য বৃদ্ধি পায়। এ বৃদ্ধি অতি সামান্য। এটা মাপা হয় শক্তির বৃদ্ধিকে আলোকের বেগের বর্গ দিয়ে ভাগ করে। অন্যদিকে আবার একটি বস্তুপিণ্ড শক্তি পরিত্যাগ করলে তার ভর হ্রাস পায়। এ বিষয়ে সবচাইতে উল্লেখযোগ্য ব্যাপার হল : চারটি হাইড্রোজেন পরমাণু সংযুক্ত হয়ে একটি হিলিয়াম পরমাণু গঠন করে কিন্তু তাদের ভর হাইড্রোজেন পরমাণুর ওজনের চারগুণের চাইতে কম। এই পরিঘটনার ব্যবহারিক গুরুত্ব সবচাইতে বেশী। মনে হয় তারকার অভ্যন্তরে এই ব্যাপারটা ঘটে। তার ফলশ্রুতি—শক্তি—সে শক্তি আমরা দেখতে পাই তারকার আলোকরূপে। সূর্যের ক্ষেত্রে এই শক্তিই পার্থিব জীবনকে ধারণ করে। পার্থিব পরীক্ষাগারেও এ ক্রিয়া সম্ভব। তার ফলে আলোক এবং তাপরূপে বিরাট পরিমাণ শক্তি মুক্ত হয়। এইভাবেই সম্ভব হয় হাইড্রোজেন বোমা তৈরী। কার্যত এই বোমার আকার এবং ধ্বংস করার ক্ষমতা সীমাহীন। সাধারণ পারমাণবিক বোমা ক্রিয়া করে ইউরেনিয়াম বিঘটনের (disintegration) সাহায্যে। এ বোমার একটি স্বাভাবিক সীমা রয়েছে। এক জায়গায় খুব বেশী ইউরেনিয়াম জমা করলে বিস্ফোরিত হবার জন্য অপেক্ষা না করে বোমাটি নিজে নিজেই বিস্ফোরিত হতে পারে। সেইজন্য একটি বিশেষ বৃহত্তম আকারের চাইতে বড় ইউরেনিয়াম বোমা বানানো সম্ভব নয়। কিন্তু একটা হাইড্রোজেন বোমাতে আমাদের যতটা ইচ্ছা ততোটা হাইড্রোজেন থাকতে পারে, কারণ হাইড্রোজেন নিজে নিজে বিস্ফোরিত হয় না। শুধুমাত্র যখন সাধারণ ইউরেনিয়াম বোমার সাহায্যে হাইড্রোজেনে বিস্ফোরণ ঘটানো হয় তখনই হাইড্রোজেন সংযুক্ত

হয়ে শক্তি মুক্ত করে। তার কারণ শুধুমাত্র অত্যন্ত উচ্চতাপেই সংযুক্তি সম্ভব।

আর একটি সুবিধা আছে : এই গ্রহে (পৃথিবীতে) ইউরেনিয়ামের সরবরাহ সীমিত সুতরাং ভয় হতে পারে মনুষ্যজাতি ধ্বংস হবার আগেই ইউরেনিয়াম শেষ হয়ে যেতে পারে। কিন্তু হাইড্রোজেনের সরবরাহ কার্যত সীমাহীন এবং এ হাইড্রোজেন ব্যবহার করা যায়। সুতরাং মনুষ্যজাতি নিজেকে ধ্বংস করবে এ আশা করার যথেষ্ট কারণ আছে। ফলে যে সমস্ত কম হিংস্র জীবের বাঁচার সম্ভাবনা তাদের বিরাট সুবিধা হবে।

কিন্তু এবার কম খুশীর খবরে ফিরে আসবার সময় হয়েছে।

আমাদের তাহলে দুরকম ভর রয়েছে। তার একটিও পুরানো আদর্শের সঙ্গে মেলে না। আলোচ্য বস্তুপিণ্ড সাপেক্ষ গতিশীল একজন পর্যবেক্ষকের মাপা ভর একটি আপেক্ষিক রাশি। বস্তুপিণ্ডের ধর্ম হিসাবে তার কোনো ভৌত গুরুত্ব নেই। 'আসল ভর' (proper mass) বস্তুপিণ্ডের পর্যবেক্ষক নিরপেক্ষ একটি অকৃত্রিম ধর্ম। এটাও কিন্তু যথাযথ অপরিবর্তী (strictly constant) নয়। শীঘ্রই আমরা দেখব ভর সম্পর্কিত ধারণা শক্তি সম্পর্কিত ধারণার অঙ্গীভূত হয়ে যায়। বলতে গেলে একটি বস্তুপিণ্ড বহির্বিশ্বে প্রদর্শিত শক্তির বৈপরীত্যে তার নিজের অভ্যন্তরে যে শক্তি ব্যয় করে, ভর তারই প্রতিরূপ।

ভরের নিত্যতা (conservation), ভরবেগের নিত্যতা এবং শক্তির নিত্যতা ছিল চিরায়ত বলবিদ্যার মহান নীতি। এইবার বিচার করা যাক ভরবেগের নিত্যতা।

বিশেষ অভিমুখে একটি বস্তুপিণ্ডের ভরবেগ হল সেই অভিমুখে তার বেগ এবং তার ভরের গুণফল। সুতরাং ধীর গতিতে চলমান একটি ভারী বস্তুপিণ্ড এবং দ্রুতগতিতে চলমান একটি হাল্কা বস্তুপিণ্ডের ভরবেগ একই হতে পারে। একাধিক বস্তুপিণ্ডের ভিতরে যখন যে কোনোরকম পারস্পারিক প্রতিক্রিয়া হয়, যেমন সংঘর্ষ কিংবা পারস্পারিক মহাকর্ষ, তখন যে কোনো অভিমুখে সবগুলি বস্তুপিণ্ডের মোট ভরবেগ একই থাকে। অবশ্য যতক্ষণ পর্যন্ত বহিরাগত কোনো প্রভাব এর ভিতরে প্রবেশ না করে। অপেক্ষবাদেও এই বিধির সত্যতা স্বীকৃত। বিভিন্ন পর্যবেক্ষক সাপেক্ষ ভর ভিন্ন ভিন্ন হবে কিন্তু পার্থক্য হবে বেগেরও। এই দুটি পার্থক্য পরস্পরকে অক্রিয় (neutra-lise) করে দেয়। ফলশ্রুতি : নীতিটির সত্যতা থেকে যায়।

একটি বস্তুপিণ্ডের ভরবেগ বিভিন্ন অভিমুখে বিভিন্ন। একটি বস্তুপিণ্ডের একটি নির্দিষ্ট দিকে গতিবেগের (পর্যবেক্ষকের মাপা) সঙ্গে তার ভরকে (পর্যবেক্ষকের মাপা) গুণ দিয়ে সাধারণত তার ভরবেগ মাপা হয়। বিশেষ অভিমুখে, এক একক কালে অতিক্রম করা দূরত্বকে বেগ বলে। ধরুন এর বদলে আমরা গ্রহণ করলাম বস্তুপিণ্ডটি এক একক অন্তর চলাকালে ঐ অভিমুখে অতিক্রান্ত দূরত্ব। [সাধারণ ক্ষেত্রে এ পরিবর্তন অতি সামান্য। কারণ বেগ আলোর বেগের চাইতে অনেক কম হলে অতিক্রান্ত কাল (lapse of time) এবং অন্তর প্রায় সমান] আর অনুমান করা যাক পর্যবেক্ষকের মাপা ভরের বদলে আমরা 'সঠিক ভর' (proper mass) বিচার করছি। এই দুটি পরিবর্তনের ফলে একই অনুপাতে বেগ বাড়ে এবং ভর কমে। সুতরাং ভরবেগ একই থাকে। কিন্তু পর্যবেক্ষক অনুসারে পরিবর্তী রাশিগুলির স্থলে প্রতিস্থাপিত হয়েছে পর্যবেক্ষক নিরপেক্ষ স্থিরীকৃত রাশি—অবশ্য সেই নির্দিষ্ট অভিমুখে বস্তুপিণ্ড যে দূরত্ব অতিক্রম করেছে সেটা বাদে।

যখন আমরা কালের স্থলে স্থান-কাল উপস্থাপন করি তখন দেখতে পাই মাপিত ভর (আসল ভরের বৈপরীত্যে), নির্দিষ্ট অভিমুখে ভরবেগের মত একই ধরণের একটি রাশি। একে বলা যেতে পারে কালাভিমুখী ভরবেগ। অচর ভরকে (invariant mass)এক একক অন্তর অতিক্রম করার সময় অতিক্রান্ত কাল দিয়ে গুণ করে মাপিত ভর পাওয়া যায়। একই অচর ভরকে একক অন্তর ভ্রমণে অতিক্রান্ত দূরত্ব (in the given direction এই নির্দিষ্ট অভিমুখে) দিয়ে গুণ করলে ভরবেগ পাওয়া যায়। স্থান-কালের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে এগুলি স্বাভাবিক ভাবেই সমগোত্রীয় (belong together)।

যদিও, একটি বস্তুপিণ্ডের মাপিত ভর নির্ভর করে বস্তুপিণ্ডটি সাপেক্ষ পর্যবেক্ষক কিভাবে চলমান তার উপর, তবুও এই রাশিটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। মাপিত ভরের নিত্যতা এবং শক্তির নিত্যতা অভিন্ন। ব্যাপারটা বিস্ময়কর মনে হতে পারে কারণ প্রথম দৃষ্টিতে শক্তি এবং ভর বস্তু হিসাবে খুবই পৃথক। কিন্তু দেখা গিয়েছে মাপিত ভর এবং শক্তি একই জিনিষ। কি করে এটা হয় সে ব্যাখ্যা সহজ নয় কিন্তু আমরা চেষ্টা করব।

সাধারণের ভাষায় 'ভর' এবং 'শক্তি' কোনো ক্রমেই এক অর্থ বহন করে

না। আমাদের কাছে 'ভর' শব্দটা জড়িত চেয়ারে বসা একটি মোটা লোক সম্পর্কীয় ধারণার সঙ্গে আর 'শক্তি' শব্দ জড়িত ছিপছিপে, চটপটে, উৎসাহী একটি লোক সম্পর্কিত ধারণার সঙ্গে। সাধারণ ভাষায় 'ভর' জড়িত জড়ত্বের সঙ্গে কিন্তু জড়ত্ব সম্পর্কে সাধারণ ভাষার দৃষ্টিভঙ্গি একপেশে (one sided)। সাধারণ ভাষায় এর অর্থের ভিতরে চলা শুরু করতে দেরী হওয়া রয়েছে কিন্তু থামতে দেরী হওয়া নেই অথচ জড়ত্বের সঙ্গে থামতে দেরী হওয়াও জড়িত।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে বিরাট গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল 'শক্তির নিত্যতা' অথবা 'বলের স্থায়িত্বের' উপর (persistence of force)। হার্বার্ট স্পেন্সারের পছন্দ ছিল শেষেরটা। শক্তির রূপ নানারকম হওয়ার দরুন এ নীতি সরল ভাবে বলা সহজ নয় তবে এর সারার্থ হল : শক্তি রূপান্তরিত হতে পারে কিন্তু ধ্বংসও হতে পারে না, সৃষ্টও হতে পারে না, শুধু মাত্র রূপান্তরিত হতে পারে। জুলের (joule) 'তাপের যান্ত্রিক তুল্যাংক' (mechanical equivalent of heat) আবিষ্কারের মাধ্যমে এই নীতি প্রতিষ্ঠা লাভ করে। এই আবিষ্কারে দেখা গিয়েছিল যে—একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ তাপ উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় কার্য এবং একটি নির্দিষ্ট উচ্চতায় একটি নির্দিষ্ট ওজনকে তুলবার জন্য প্রয়োজনীয় কার্যের ভিতরে একটি অচর (constant) অনুপাত রয়েছে। আসলে যান্ত্রিক ব্যবস্থা অনুসারে দুটির ভিতরে যে কোনো একটির উদ্দেশ্যে একই ধরণের কার্য ব্যবহার করা সম্ভব। যখন দেখা গেল তাপের উপাদান অণুগুলির গতি, তখন তাপ যে অন্য শক্তির সদৃশ এ তথ্য স্বাভাবিক মনে হয়েছিল। মোটামুটি বলতে গেলে একটি বিশেষ পরিমাণ তত্ত্বের সাহায্যে শক্তির সমস্ত রূপকেই পরিণত করা হয়েছিল দুটোতে। সেগুলির নাম ছিল যথাক্রমে স্থৈতিক শক্তি (potential energy) এবং গতীয় শক্তি (kinetic energy)। তাদের সংজ্ঞা ছিল নিম্নরূপ :

একটি বস্তুকণার ভরের অর্ধেকের সঙ্গে বেগের বর্গের গুণফল সেই বস্তুকণার গতীয় শক্তি। কয়েকটি বস্তুকণার গতীয় শক্তি বিচ্ছিন্নভাবে প্রতিটি বস্তুকণার গতীয় শক্তির যোগফলের সমান।

স্থৈতিক শক্তির সংজ্ঞা আরও শক্ত। শুধুমাত্র বল প্রয়োগের সাহায্যে যাকে রক্ষা করা যায় সেই রকম যে কোনো তাতির অবস্থা (state of strain)

স্থৈতিক শক্তির প্রতিরূপ। সহজতম উদাহরণ : একটি ওজনকে যদি একটি উচ্চতায় উঠিয়ে ঝুলিয়ে রাখা হয় তাহলে তার স্থৈতিক শক্তি রয়েছে। তার কারণ ছেড়ে দিলে সেটা পড়ে যাবে। যে উচ্চতায় তোলা হয়েছিল সেই দূরত্ব দিয়ে পড়বার সময় ওজনটি যে গতীয় শক্তি লাভ করবে এর স্থৈতিক শক্তি তার সমান। সেইরকম : একটি ধূমকেতু অত্যন্ত উৎকেন্দ্রিক একটি কক্ষে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করার সময়, সূর্য থেকে যখন দূরে তখনকার তুলনায় সূর্যের যখন কাছে তখন দ্রুততর চলে। অর্থাৎ ধূমকেতুটি যখন সূর্যের নিকটতর তখন তার গতীয় শক্তি অনেক বেশী। অন্যদিকে : সূর্য থেকে যখন দূরতম তখন ওর স্থৈতিক শক্তি সবচাইতে বেশী। তার কারণ ধূমকেতুটির অবস্থা তখন উচুতে তোলা পাথরটির মত। কোনো সংঘর্ষ না হলে কিংবা ধূমকেতুটি থেকে খানিকটা পদার্থ বিচ্ছিন্ন না হলে তার গতীয় শক্তি এবং তার স্থৈতিক শক্তির যোগফল অচর (constant)। এক অবস্থান থেকে অন্য অবস্থানে যাওয়ার সময়কার স্থৈতিক শক্তির পরিবর্তন আমরা নির্ভুলভাবে নির্ধারণ করতে পারি কিন্তু এ শক্তির মোট পরিমাণ খানিকটা যাদৃচ্ছিক। তার কারণ : শূন্য স্তর (zero level) আমরা স্থির করতে পারি নিজেদের ইচ্ছামত। উদাহরণ : আমাদের পাথরটি ভূপৃষ্ঠে পতনের সময় কিম্বা একটি কুপ দিয়ে পৃথিবীর কেন্দ্রে পতনের সময় কিম্বা আরোপিত যে কোনো স্বল্পতর দূরত্বে পতনের সময় যে গতীয় শক্তি সংগ্রহ করবে আমরা মনে করতে পারি সেটাই তার স্থৈতিক শক্তি। আমাদের সিদ্ধান্তে যতক্ষণ আমরা অচল ততক্ষণ পর্য্যন্ত কোনটা আমরা গ্রহণ করছি তাতে কিছু এসে যায় না। আমরা করছি একটা লাভ ক্ষতির হিসাব সুতরাং কি পরিমাণ সম্পদ নিয়ে শুরু করেছি তাতে কিছু এসে যায় না।

নির্দিষ্ট একগুচ্ছ বস্তুপিণ্ডের গতীয় শক্তি এবং স্থিতীয় শক্তি দুটোই ভিন্ন পর্যবেক্ষক সাপেক্ষ ভিন্ন হবে। চিরায়ত গতিবিদ্যা অনুসারে পর্যবেক্ষকের গতির অবস্থা অনুসারে গতীয় শক্তির পার্থক্য হোত কিন্তু পার্থক্য জ্ঞাপক রাশিটা হোত অচর। স্থিতীয় শক্তির কোনো পার্থক্য হোত না। সুতরাং সংশিলষ্ট পর্যবেক্ষকরা নিজেরা ঋজুরেখায় সমবেগে চলমান এই অনুমান করলে কিংবা তা না হলে, এইভাবে চলমান কোনো বস্তুপিণ্ডকে তাদের গতি আরোপ করতে পারেন এই অনুমান করলে প্রতিটি পর্যবেক্ষক সাপেক্ষই মোট শক্তি

ছিল অচর (constant)। কিন্তু অপেক্ষবাদের গতিবিদ্যায় ব্যাপারটা আরও জটিল। গতীয় শক্তি এবং স্থৈতিক শক্তি সম্পর্কীয় নিউটনীয় ধারণাকে বিশেষ কোনো অসুবিধা ছাড়াই বিশিষ্ট অপেক্ষবাদের সঙ্গে মানিয়ে নেওয়া যায়। কিন্তু স্থৈতিক শক্তির ধারণাকে ব্যাপক অপেক্ষবাদের সঙ্গে মানিয়ে নিয়ে বিশেষ কিছু সুবিধা হয় না। একক বস্তুপিণ্ডের ক্ষেত্রে ছাড়া অন্য কোনো ক্ষেত্রে স্থৈতিক শক্তিসম্পর্কীয় ধারণার সাধারণীকরণও সম্ভব নয়। সুতরাং সাধারণ নিউটনীয় অর্থে শক্তির নিত্যতা সম্পর্কীয় ধারণার যথার্থতা রক্ষা করা সম্ভব নয়। তার কারণ একটি বস্তুপিণ্ডতন্ত্রের গতীয় এবং স্থৈতিক শক্তি, স্থান-কালের বিস্তৃততর অঞ্চলে আরোপিত সহজাত কল্পন। অষ্টম অধ্যায়ে ব্যাখ্যা করা, স্থানাংক নির্বাচনের অতি বিরাট স্বাধীনতা (latitude) এবং স্থান-কালের পাহাড়ী চরিত্র যুক্তভাবে ব্যাপক অপেক্ষবাদে এই ধরণের কল্পন উপস্থাপনকে অতীব বেমানান করে তোলে। ব্যাপক অপেক্ষবাদে একটি নিত্যতা বিধিরয়েছে কিন্তু এ বিধি নিউটনীয় বলবিদ্যার এবং বিশিষ্ট অপেক্ষবাদের নিত্যতা বিধিগুলির মত অতটা কার্যকর নয়। তার কারণ, এ বিধি স্থানাঙ্ক নির্বাচনের এমন পদ্ধতির উপর নির্ভরশীল যে পদ্ধতি বোঝা খুবই কঠিন। আমরা দেখেছি স্থানাঙ্ক নির্বাচনের স্বাধীনতা ব্যাপক অপেক্ষবাদের একটি নির্দেশক নীতি। এই নীতির সঙ্গে দ্বন্দ্বের জন্যই নিত্যতাবিধি সন্দেহভাজন। এর অর্থ: এতদিন যা ভাবা হোত নিত্যতাবিধির মূলগত গুরুত্ব তার চাইতে কম কিনা অথবা তত্ত্বের গাণিতিক জটিলতার ভিতরে আরও সন্তোষজনক নিত্যতাবিধি এখনো লুকিয়ে আছে কিনা,—এ সমস্যার সমাধান এখনো হয়নি। আপাতত ব্যাপকতত্ত্বে আমাদের শুধুমাত্র একক একটি বস্তুকণার গতীয় শক্তি সম্পর্কীয় কল্পন নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হবে। পরবর্তী বিচারে শুধু এটাই আমাদের প্রয়োজন। এ কথা মনে রাখা উচিৎ যে শক্তির নিত্যতা সম্পর্কে এই সমস্ত অসুবিধা ব্যাপকতত্ত্বেই দেখা যায়, বিশিষ্ট তত্ত্বে নয়। যেখানে মহাকর্ষকে অগ্রাহ্য করা যায় এবং বিশিষ্ট তত্ত্ব প্রয়োগ সম্ভব সেখানেই শক্তির নিত্যতা রক্ষা সম্ভব।

কার্যক্ষেত্রে নিত্যতার অর্থ এবং তত্ত্বক্ষেত্রে নিত্যতার অর্থ ঠিক এক নয়। একটি জিনিষের পরিমাণ যখন যে কোনো এক সময় এবং যে কোনো অন্য সময় একই থাকে তত্ত্বে তখন আমরা বলি রাশিটি (quantity) নিত্য। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে আমরা সারা পৃথিবী পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে

পর্যবেক্ষণ করতে পারিনা সুতরাং আর একটু সহজ কোনো অর্থ আমাদের মেনে নিতে হবে। আমরা বোঝাতে চাই : একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলে পরিমাণজ্ঞাপক রাশিটির যদি পরিবর্তন হয়, তাহলে তার কারণ, কিছুটা পরিমাণের সীমান্ত অতিক্রম করা। যদি কোনো জন্ম কিংবা মৃত্যু না হয় তাহলে জনসংখ্যা নিত্য হবে। সে ক্ষেত্রে একটি দেশের জনসংখ্যার পরিবর্তনের কারণ হতে পারে দেশবাসীর বিদেশ গমন কিংবা বিদেশীর সে দেশে আগমন অর্থাৎ সীমান্ত অতিক্রম করা। আমরা হয়তো চীন কিংবা মধ্য আফ্রিকার নির্ভুল আদম-শুমারী করতে পারিনা সুতরাং আমরা হয়তো পৃথিবীর মোট জনসংখ্যা নির্ধারণ করতে পারি না। কিন্তু যেখানই পরিসংখ্যান সম্ভব সেখানেই যদি দেখা যায় লোকের সীমান্ত অতিক্রমের জন্য যে পরিবর্তন হয় সে পরিবর্তন ছাড়া জনসংখ্যার কোনো পরিবর্তন হয় না তাহলে জনসংখ্যাকে অচর মনে করা যুক্তিসঙ্গত হবে। আসলে অবশ্য জনসংখ্যা নিত্য নয়। আমার পরিচিত একজন শারীরবিদ (Physiologist) একবার একটা থার্মোসে (thermos) চারটে ইঁদুর রেখেছিলেন। কয়েকঘণ্টা বাদে সেগুলিকে বার করতে গিয়ে তিনি দেখলেন রয়েছে এগারোটা ইঁদুর। কিন্তু ভরের এরকম পরিবর্তন হয় না। শেষকালের ঐ এগারোটা ইঁদুরের ভর শুরুর চারটে ইঁদুরের ভরের চাইতে একটুও বেশী ছিল না।

যে সমস্যার জন্য আমরা শক্তি নিয়ে আলোচনা করছিলাম এ তথ্য আমাদের সেই সমস্যাতেই ফিরিয়ে নিয়ে এল। আমরা বলেছিলাম অপেক্ষবাদে মাপিত ভর এবং শক্তিকে একই বস্তুরূপে বিচার করা হয় এবং দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলাম তার কারণ ব্যাখ্যা করার। এবার সেই ব্যাখ্যা শুরু করার সময় হয়েছে। কিন্তু ষষ্ঠ অধ্যায়ের শেষাংশের মতো এখানেও গণিতে সম্পূর্ণ অজ্ঞ পাঠক এই জায়গাটা বাদ দিয়ে পরবর্তী অনুচ্ছেদ থেকে শুরু করলে ভাল করবেন।

আলোকের বেগকে বেগের একক রূপে গ্রহণ করা যাক। অপেক্ষবাদে এটাই সবসময় সুবিধাজনক। m হোক বস্তুকণাটির সঠিক ভর এবং পর্যবেক্ষক সাপেক্ষ বেগ হোক v।

তাহলে এর মাপিত ভর হবে

$$\frac{m}{\sqrt{1 - v^2}}$$

সাধারণ সঙ্কেত অনুসারে এর গতীয় শক্তি কিন্তু হবে

$$\frac{1}{2} mv^2$$

আমরা আগে দেখেছি শক্তির হিসাব শুধুমাত্র লাভ-ক্ষতির হিসাবের মত। সুতরাং আমরা এর সঙ্গে খুশীমত যে কোনো অচর সংখ্যা যোগ করতে পারি। সুতরাং আমরা বলতে পারি শক্তি

$$m + \frac{1}{2} mv^2$$

v যদি আলোকের বেগের ক্ষুদ্র ভগ্নাংশ হয় তাহলে $m + \frac{1}{2} mv^2$ প্রায় নির্ভুলভাবে

$$\frac{m}{\sqrt{1 - v^2}}$$

এর সমান। সুতরাং বৃহৎ বস্তুপিন্ডগুলির যেরকম বেগ থাকে সেই রকম ক্ষেত্রে দেখা যায় মাপনযোগ্য নির্ভুলতার সীমার ভিতরে শক্তি এবং ভরের পার্থক্য করা সম্ভব নয়। আসলে আমাদের শক্তির সংজ্ঞা পরিবর্তন করা ভাল। সেটা হওয়া উচিৎ—

$$\frac{m}{\sqrt{1 - v^2}}$$

তার কারণ নিত্যতার সদৃশ বিধি সাপেক্ষ এই রাশি সত্য ; এবং বেগ যখন খুব বেশী তখন চিরায়ত সঙ্কেতের তুলনায় এই রাশি শক্তির মাপন অনেক ভালভাবে প্রকাশ করে। সুতরাং চিরায়ত সঙ্কেতকে অবশ্যই আসন্ন ভাবা উচিৎ। নূতন সঙ্কেত তার নির্ভুল রূপ। এইভাবেই শক্তি এবং মাপিত ভর অভিন্ন হয়ে যায়।

এখন আমি কর্ম (action) সম্পর্কীয় ধারণা নিয়ে আলোচনা করছি। সাধারণ মানুষের কাছে এ শব্দ শক্তির চাইতে কম পরিচিত। কিন্তু আপেক্ষিক পদার্থবিদ্যা এবং কোয়াণ্টাম তত্ত্বে এর গুরুত্ব বেড়েছে। (কোয়াণ্টাম হল : অল্প পরিমাণ কর্ম)। শক্তি এবং কালের গুণফল প্রকাশ করার জন্য কর্ম শব্দ ব্যবহার করা হয়। অর্থাৎ একটি তন্ত্রে যদি এক একক শক্তি থাকে তাহলে এক সেকেণ্ডে সে এক একক কর্ম প্রয়োগ করবে। একশ'

সেকেণ্ডে প্রয়োগ করবে একশ' একককর্ম...ইত্যাদি। যে তন্ত্রে একশ' একক শক্তি আছে সে তন্ত্র এক সেকেণ্ডে ১০০ একক কর্ম প্রয়োগ করবে আর ১০০ সেকেণ্ডে প্রয়োগ করবে ১০,০০০ একক কর্ম...ইত্যাদি। সুতরাং অযথাযথভাবে প্রকাশ করলে 'কর্ম' শব্দের অর্থ কতটা কাজ করা হয়েছে তার একটি মাপ। অধিকতর শক্তি প্রকাশ করলে কিংবা দীর্ঘতর কাল কার্য করলে এটা বৃদ্ধি পায়। যেহেতু শক্তি এবং মাপিত ভর অভিন্ন সুতরাং কর্মকে আমরা মাপিত ভর এবং কালের গুণফল রূপেও প্রকাশ করতে পারি। চিরায়ত বলবিদ্যায় যে কোনো অঞ্চলে পদার্থের 'ঘনত্ব' নির্ণয় করা হয় ভরকে আয়তন দিয়ে ভাগ করে। অর্থাৎ একটি ক্ষুদ্র অঞ্চলের ঘনত্ব যদি আপনার জানা থাকে তাহলে ঘনত্বকে ক্ষুদ্র অঞ্চলের আয়তন দিয়ে গুণ করলে আপনি মোট পদার্থের পরিমাণ জানতে পারবেন। আপেক্ষিক বলবিদ্যায় আমরা সব-সময়ই স্থানের জায়গায় স্থান-কাল প্রতিস্থাপন করি। সুতরাং একটি অঞ্চলকে কিছুতেই আর শুধুমাত্র আয়তনরূপে বিচার করা যায় না, বিচার করা হয় কিছুকাল স্থায়ী আয়তনরূপে। একটি ক্ষুদ্র অঞ্চল হবে স্বল্প-কাল স্থায়ী একটি ক্ষুদ্র আয়তন। এর ফলশ্রুতি : ঘনত্ব জানা থাকলে নূতন অর্থে একটি ক্ষুদ্র অঞ্চলে শুধুমাত্র ক্ষুদ্র ভরই রয়েছে তাই নয়, রয়েছে ক্ষুদ্র ভর এবং স্বল্পকালের গুণফল। অর্থাৎ স্বল্প পরিমাণ 'কর্ম'। আপেক্ষিক বলবিদ্যায় 'কর্ম' কেন মূলগত গুরুত্ব লাভ করবে বলে আশা করা যায়—তার ব্যাখ্যা এটাই। আসলে ঘটনাও তাই।

অবাধে চলমান একটি বস্তুকণা একটি ধরাকৃতি অনুগমণ করে (follows a geodesic) এই স্বীকার্যের স্থলে বস্তুকণার 'কর্ম' সম্পর্কীয় তুল্য একটি অনুমান প্রতিস্থাপন করা যায়। এরকম একটি অনুমানের নাম "ন্যূনতম ক্রিয়ার সূত্র" (Principle of Least Action)। এ নীতির বক্তব্য : একটি বস্তুপিণ্ড এক অবস্থা থেকে অন্য অবস্থায় যেতে হলে সেই পথই নির্বাচন করবে যে পথে সামান্য পৃথক অন্য পথের তুলনায় কম কর্ম প্রয়োজন—আবারও মহাজাগতিক আলস্যবিধি (law of cosmic laziness)! ন্যূনতম ক্রিয়ার সূত্রগুলি শুধুমাত্র একক বস্তুপিণ্ডগুলিতেই সীমাবদ্ধ নয়। এমন সমরূপ অনুমান সম্ভব যে অনুমান পর্বত এবং উপত্যকা সমেত সম্পূর্ণ স্থান-কাল বিবরণের পথিকৃৎ অনুমানও। এই নীতিগুলি অপেক্ষবাদ এবং কোয়াণ্টাম তত্ত্বে একটি কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালন

করে। তাছাড়া এই নীতিগুলি বলবিদ্যার শুদ্ধ প্রথানুসারী (formal) অংশগুলি বর্ণনা করার বৃহত্তম ব্যাপ্তিসম্পন্ন উপায় (most comprehensive means)।

একাদশ অধ্যায়

প্রসারমান মহাবিশ্ব

এ পর্যন্ত আমরা প্রধানত পৃথিবী কিংবা সৌরতন্ত্রের সঙ্গে জড়িত পর্যবেক্ষণ এবং পরীক্ষা নিয়ে আলোচনা করছিলাম। শুধুমাত্র মাঝে মাঝে আমাদের তারকার প্রসঙ্গে যেতে হয়েছে। এই অধ্যায়ে আমাদের সীমার বিস্তার হবে দূরতর : আমরা দেখব সম্পূর্ণ মহাবিশ্ব সম্পর্কে অপেক্ষবাদের কি বক্তব্য।

জ্যোতির্বিজ্ঞানের যে সমস্ত পর্যবেক্ষণফল নিয়ে আমরা আলোচনা করব সেগুলি মোটামুটি সুপ্রতিষ্ঠিত বলে বিশ্বাস করা হয়। কিন্তু নূতন প্রযুক্তি নিয়ে আসছে নূতন পর্যবেক্ষণের সম্ভাবনা। ফলে সুপ্রতিষ্ঠিত পর্যবেক্ষণফলগুলি অবিরত সংস্কৃত হচ্ছে। তাছাড়া এই পর্যবেক্ষণফলগুলির তাত্ত্বিক ব্যাখ্যার চরিত্র যথেষ্ট দূরকল্পনাভিত্তিক (speculative)। সুতরাং এ অনুমান করা ঠিক হবে না যে এখন আমরা যে সমস্ত তাত্ত্বিক ব্যাপার পর্যালোচনা করছি তার স্থিরত্ব (solidity) এতক্ষণ পর্যন্ত আমরা যে আলোচনা করেছি তারই মত। সেগুলির উন্নতি অবশ্যই প্রয়োজন। কোনো অপরিবর্তনীয় সত্য কিংবা কোনো চিরস্থায়ী অযৌক্তিক মত (eternal dogma) প্রতিষ্ঠা করা বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য নয়। বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য : পারস্পরিক আসন্নতার (successive approximation) সাহায্যে সত্যের সমীপবর্তী হওয়া। কিন্তু চরম এবং সার্বিক নির্ভুলতা লাভ হয়েছে এ দাবী বিজ্ঞান কোনো স্তরেই করবে না।

মহাবিশ্বের সাধারণ রূপ সম্পর্কে কিছু প্রাথমিক ব্যাখ্যা প্রয়োজন। অত্যন্ত বিরাট মাত্রায় (on a large scale) পদার্থের বণ্টন সম্পর্কে অনেক কিছুই এখন জানা। আমাদের সূর্য বহু মিলিয়ন (১০,০০,০০০— দশ লক্ষ) তারকার একটি তন্ত্রের ভিতরের একটি তারকা। এগুলির নাম ছায়াপথ—বা গ্যালাক্সী (galaxy)। গ্যালাক্সীর আকার একটি বিরাট*

ফুটনোট : *Catherine Wheel—a wheel with spikes projecting from the rim—এমন একটি চাকা যার পরিধির বেড় থেকে সূচীমুখ কঠিন কীলক বেরিয়ে এসেছে। (Webster).

ক্যাথেরিন চক্রের (Catherine Wheel) মত। এই চক্রের উজ্জ্বল কেন্দ্র থেকে তারকা দিয়ে গঠিত বহু সর্পিল বাহু বেরিয়ে (spiral arms) এসেছে।

তারকা দিয়ে গঠিত এইরকম একটি সর্পিল বাহুতে সূর্যের অবস্থান। ছায়াপথের চক্রকেন্দ্রের কেন্দ্র থেকে এর দূরত্ব বোধহয় ২৮,০০০ আলোক বৎসরের কাছাকাছি। ছায়াপথের মাপনীর অধিকাংশ মাপনের মত এই মাপনও গণনা করা শক্ত এবং ভবিষ্যতে এ মাপন সংশোধিত হতে পারে (ছায়াপথের মানদণ্ডে দূরত্ব প্রায়শই আলোকবর্ষে মাপা হয়। এক বৎসরে আলোক যে দূরত্ব অতিক্রম করে তাকে এক আলোকবর্ষ বলে। পৃষ্ঠা ২০-তে দেওয়া আলোকের বেগকে এক বছরে যে কটি সেকেণ্ড হয় সেই রাশি দিয়ে গুণ করে আপনি এই দূরত্ব গণনা করতে পারেন। এক বছরে সেকেণ্ডের সংখ্যা ৩১,৫৩৬,০০০। উত্তরটিকে মাইলে রূপান্তরিত করলে দাঁড়ায়—ছ' মিলিয়ন, মিলিয়ন মাইল)।

আকাশ পরিষ্কার থাকলে, একদিক থেকে অন্যদিক পর্যন্ত বিস্তৃত উজ্জ্বল তারার মালার মত ছায়াপথকে দেখতে পাওয়া যায়। আমরা সর্পিল বাহুতে আমাদের অবস্থান থেকে দেখি শুধুমাত্র বাকী ছায়াপথের কিনারার দৃশ্য।

ছায়াপথের সীমারেখাগুলি কিন্তু মোটেই স্পষ্ট নয়। মূল তারকা-পুঞ্জের একপাশ থেকে অন্যপাশের বিস্তার প্রায় ১২০,০০০ আলোক বৎসর। কিন্তু তারকা ছাড়াও ছায়াপথে প্রচুর পরিমাণ বায়বীয় পদার্থ রয়েছে। এর ভিতরে বেশীর ভাগই হাইড্রোজেন, তাছাড়া আছে ধূলি এবং আরও কিছু পদার্থ। কিন্তু সেগুলিকে শনাক্ত করা যায়নি। এই অজানিত পদার্থ একটি গোলকাকৃতি মেঘ সৃষ্টি করে বলে বৈজ্ঞানিকদের ধারণা। এই মেঘ দৃশ্যমান তারকাপুঞ্জ থেকেও দূরে বিস্তৃত। এই মেঘ প্রত্যক্ষ দেখা যায় না, তারকা এবং অন্যান্য পর্যবেক্ষণযোগ্য পদার্থের উপর এর মহাকর্ষীয় অভিক্রিয়া থেকে এর অস্তিত্ব অনুমিত হয়। এই মেঘের বিস্তার হয়ত পাঁচ লক্ষ থেকে ছয় লক্ষ আলোক বৎসর।

তারকা বায়বীয় পদার্থ, ধূলি এবং শনাক্ত না করা এই পদার্থের সঞ্চিত পুঞ্জ চক্রকেন্দ্রকে প্রদক্ষিণ করে ধারগতিতে আবর্তিত হয়। এই আবর্তনের চরিত্র থেকেই শনাক্ত না করা পদার্থের অস্তিত্ব অনুমান করা যায়। আবর্তনের বেগ চক্রকেন্দ্রের কেন্দ্র থেকে দূরত্ব অনুসারে এমনভাবে পরিবর্তিত হয় বলে

অনুমিত হয় যে ঐ পদার্থ ছাড়া সে আবর্তনকে ব্যাখ্যা করা যায় না।

চক্রকেন্দ্র সাপেক্ষ সূর্যের অনুমিত দ্রুতি সেকেণ্ডে প্রায় ২২০ কিলোমিটার। যদি দ্রুতি এবং কেন্দ্র থেকে দূরত্বের অনুমান সঠিক হয় তাহলে কেন্দ্রকে একবার প্রদক্ষিণ করতে সূর্যের প্রায় ২৪০ মিলিয়ন বৎসর লাগে।

পরিবেষ্টনীর মেঘের ভিতরকার ছায়াপথের পদার্থের ভর মনে হয় সূর্যের মিলিয়ন মিলিয়ন গুণ।

জানা যায় ছায়াপথের একদল অনুগামী (retinue of satellites) রয়েছে। সেগুলির ভিতরে ম্যাগেলানিক (Magellanic) মেঘই সবচাইতে পরিচিত এবং নিকটতম। এর অবস্থান চক্রকেন্দ্র থেকে দু লক্ষ আলোক বৎসর দূরে।

এই ছায়াপথ কিন্তু মহাবিশ্বে একেবারেই নিঃসঙ্গ নয়। যে অঞ্চল দূরবীক্ষণে দেখা যায় তার ভিতরে বহু মিলিয়ন এই ধরণের তন্ত্র ছড়িয়ে আছে। অন্য তন্ত্রগুলিকেও ছায়াপথ বলা হয় (কিংবা কখনো কখনো বলা হয় নীহারিকা—Nebulae)। কিছু কিছু ছায়াপথ চ্যাপ্টা—আমাদের ছায়াপথের মত তাদেরও সর্পিল বাহু রয়েছে। কতকগুলি ফুটবলের মত গোলকাকার আবার কতকগুলি রাগবী বলের মত ডিম্বাকৃতি আবার কতকগুলি আছে যারা গঠনে অসমাঙ্গ (irregular)।

ছায়াপথগুলির পুঞ্জীভূত (groups) হবার একটা স্পষ্ট প্রবণতা দেখা যায়। এই পুঞ্জগুলিকে বলা হয় গুচ্ছ (cluster)। একক একটি গুচ্ছের ভিতরে লক্ষ লক্ষ একক ছায়াপথ থাকতে পারে। তাদের প্রত্যেকটির ভিতরে আমাদেরটির মত বহু মিলিয়ন তারকা থাকেতে পারে। আমাদের ছায়াপথ একটি ক্ষুদ্র গুচ্ছের অংশ। তার নাম আঞ্চলিক পুঞ্জ (local groups)। এই আঞ্চলিক পুঞ্জের সদস্যের সংখ্যা নিশ্চিত নয়—তার কারণ সম্ভাব্য কয়েকটি সদস্য অতি অস্পষ্ট। কিন্তু মনে হয় এগুলির সংখ্যা কুড়িটির বেশী নয়। আঞ্চলিক পুঞ্জের ভিতরে সবচাইতে পরিচিত এবং সর্পিলের নিকটতম ছায়াপথের নাম এ্যাণ্ড্রোমিডা (Andromeda galaxy) ছায়াপথ। এর নাম হয়েছে যে গুচ্ছে একে দেখা যায় তার নাম থেকে। এটা প্রায় ২ মিলিয়ন আলোক বর্ষ দূরে। খালি চোখে একে অস্পষ্ট দেখা যায়। আঞ্চলিক পুঞ্জের বিস্তার প্রায় তিন মিলিয়ন আলোক বর্ষ হতে পারে।

দেখা যায় ছায়াপথের গুচ্ছগুলি আবার বৃহত্তর সত্বায় গোষ্ঠীভূত।

এগুলির নাম অতিগুচ্ছ (super cluster)। একটি অতিগুচ্ছের বিস্তার ত্রিশ মিলিয়ন থেকে একশ' মিলিয়ন আলোকবর্ষ পর্যন্ত হতে পারে এবং এর ভর হতে পারে পুরো ছায়াপথের দশ হাজার গুণ। আধুনিক বিশ্বাস অনুসারে অতিগুচ্ছই মহাবিশ্বে পদার্থের সনাক্ত করার মত বৃহত্তম সমাহার (aggregation)।

একক একটি গুচ্ছের অঙ্গীভূত ছায়াপথগুলি মহাকর্ষীয় বলের জন্যই পরস্পর সংযুক্ত থাকে এরকম চিন্তন থাকলেও অতিগুচ্ছগুলির ক্ষেত্রে এ তথ্য সত্য কিনা সেটা এখনো স্পষ্ট নয়। অতিগুচ্ছগুলির অস্তিত্ব এখন পর্যবেক্ষণের সাহায্যে মোটামুটি সুপ্রমাণিত কিন্তু তাদের বিকাশ সম্পর্কে কিছু জানা যায় না।

আধুনিক পর্যবেক্ষণে মনে হয় অতিগুচ্ছগুলির অন্তর্বর্তী স্থানে দৃশ্যমান কোনো পদার্থ নেই, থাকলেও রয়েছে অতি সামান্য। এই স্থান বোধহয় অতিগুচ্ছের চাইতেও বড়।

তারকার সমষ্টি ছায়াপথ, ছায়াপথের সমষ্টি গুচ্ছ, গুচ্ছের সমষ্টি অতি-গুচ্ছ কিন্তু এগুলি সত্ত্বেও অনুমান করা হয় যথেষ্ট বড় মাত্রায় বিচার করলে মহাবিশ্ব প্রায় সুষম (uniform) এবং বর্তমান যন্ত্রপাতির সাহায্যে যে অংশ পর্যবেক্ষণ করা সম্ভব সে অংশই হয়ত সমগ্র মহাবিশ্বের জাতিরূপ (typical)।

পর্যাপ্ত জ্যোতির্বিজ্ঞান ভিত্তিক সাক্ষ্য প্রমাণের আগেই এ কল্পন ছিল যে বিরাট মাত্রার (large scale) বিচারে মহাবিশ্ব সুষম। এ কল্পনই এখন মূলগত স্বীকার্যের মর্যাদা পেয়েছে। সাধারণত একে বলা হয় 'মহাজাগতিক তত্ত্বের সূত্র' (cosmological principle)। মহাজাগতিক তত্ত্বের সূত্র আসলে কোপার্নিকাসের চিন্তনের বিস্তার। সমস্ত বস্তুর কেন্দ্রে পৃথিবীর অবস্থান এই অহংবাদী ধারণা পরিত্যাগ করার সঙ্গে সঙ্গে আমরা বুঝতে পারব যে সূর্য একটি সাধারণ তারকামাত্র এবং মহাবিশ্বের বিবরণে একটি বিশেষ স্থানের দাবী পৃথিবীর চাইতে সূর্যের কোনোক্রমেই বেশী নয়। যখন আমরা দেখব যে আমাদের ছায়াপথ এবং যে গুচ্ছের অংশ আমাদের ছায়াপথ—এ সমস্তই জাতিরূপ নমুনা (typical specimens) তখন যৌক্তিক বিচারে এগুলিকেও অন্যান্য সমরূপ বস্তুর সঙ্গে সমস্তরে প্রতিষ্ঠা করতেই হবে। পদার্থবিদ্যার বিধি একটি ছায়াপথগুচ্ছ থেকে অপর

ছায়াপথগুচ্ছে নিয়মিতভাবে পরিবর্তিত হয় এ অনুমান করার কোনো পরীক্ষাভিত্তিক যুক্তি নেই।

এর নিহিতার্থ একটু অন্যভাবেও প্রকাশ করা যায়। ধরুন : আপনাকে একটি বাক্সে ভর্তি করা হয়েছে। বাক্সটির কোনো জানালা নেই। এই অবস্থায় আপনাকে মহাবিশ্বের সুদূর এক অংশে চালান করা হয়েছে। বাক্স থেকে ছাড়া পেলে আপনি নিশ্চয়ই পৃথিবী থেকে তারকা এবং ছায়াপথের যে বিশেষ বণ্টন দেখা যায় সে বণ্টন দেখতে পাবেন না—আপনার নূতন পরিবেশের ভৌগোলিক খুঁটিনাটিতে (details) পার্থক্য থাকবে—কিন্তু মহাবিশ্বতত্ত্বের সূত্র অনুসারে মহাবিশ্বের সর্বাঙ্গীন বাহ্যরূপ একই থাকবে। খুঁটিনাটিগুলি বাদ দিলে আপনি বলতে পারবেন না মহাবিশ্বের কোন অংশে আপনার অবস্থান।

আমাদের ছায়াপথের আঞ্চলিক গুচ্ছের মহাবিশ্বে একটা বিশেষ স্থান নিশ্চয়ই রয়েছে : এই অনুমানের পথিকৃৎ বোধহয় একটি লক্ষ্যণীয় পরিঘটনা। সে পরিঘটনা হল—দূরের ছায়াপথগুলির বর্ণালীর তথাকথিত 'লাল প্রান্তমুখী স্থানচ্যুতি' (red shift)। এবার আমরা বুঝতে পারব—এই পরিঘটনার জন্যই মহাবিশ্বকে প্রসারমান বলা হয়।

এখন আমরা যে অভিক্রিয়া নিয়ে আলোচনা করছি সে অভিক্রিয়া নবম অধ্যায়ে* ব্যাখ্যা করা হয়েছে। সে অধ্যায়ে অবশ্য আমরা প্রত্যক্ষভাবে এর সঙ্গে জড়িত ছিলাম না। শব্দের সঙ্গে যে সাদৃশ্য তখন উল্লেখ করা হয়েছিল সে সাদৃশ্য আপনার মনে পড়বে : একটি ট্রেন যখন আপনার অভিমুখে আসে তখনকার বাঁশীর স্বর ট্রেনের স্থির অবস্থার স্বরের তুলনায় তীক্ষ্ণতর হয়। কিন্তু ট্রেনটি যখন আপনার কাছ থেকে দূরে সরে যায় তখন তার বাঁশীর স্বরের তীক্ষ্ণতা কমে যায়। আলোর ক্ষেত্রে অভিক্রিয়া অতীব সমরূপ (very similar)। আলোকের উৎস যদি আপনার অভিমুখে চলমান হয় তাহলে আলোকের সম্পূর্ণ বর্ণালীটা বেগুনে রঙের দিকে স্থানচ্যুত হয়। আর উৎস আপনার কাছ থেকে দূরে অপসরণশীল হলে বর্ণালীর স্থানচ্যুতি হবে লালের দিকে বর্ণালীর এই স্থানচ্যুতি, ট্রেনের বাঁশীর স্বরের তীক্ষ্ণতার পরিবর্তনের অনুরূপ। স্থানচ্যুতির পরিমাণ

ফুটনোট : *পৃষ্ঠা ৮৪, ৮৫, ৮৬।

আপনি এবং আলোকের উৎসের মধ্যবর্তী দূরত্বের পরিবর্তনের হারের উপর নির্ভরশীল। (এর সঙ্গে আলোকের নিজস্ব দ্রুতির কোনো সম্পর্ক নেই। আমরা দেখেছি এই দ্রুতি উৎসের গতিনিরপেক্ষ) বর্ণালীর স্থানচ্যুতি তারকা এবং ছায়াপথগুলির দ্রুতি নির্ধারণের একটি উপায়। সেটা করা হয় তারকার থেকে নির্গত আলোকের বর্ণালীর সঙ্গে পৃথিবীর গবেষণাগারে উৎপন্ন সমরূপ বর্ণালীর তুলনা করে। এই ভাবে মাপলে দেখা যায় আঞ্চলিক পুঞ্জের (local group) ছায়াপথগুলির দ্রুতি সেকেণ্ডে তিনশ মাইল পর্যন্ত হতে পারে। দৈনন্দিন মাপকাঠিতে এ দ্রুতি খুবই বেশী। কিন্তু ছায়াপথগুলির অন্তর্বর্তী দূরত্ব অতি বিশাল হওয়ার দরুন তাদের অবস্থানের লক্ষ্যণীয় পরিবর্তন হতে বহুমিলিয়ন বৎসর লাগবে।

আঞ্চলিক পুঞ্জের কিছু কিছু ছায়াপথ চলমান আমাদের অভিমুখে আবার কিছু কিছু চলমান আমাদের বিপরীত মুখে। এই গতির ভিতরে বিরাট বৈশিষ্ট্য কিছু নেই। এর তুলনা করা চলে একটি ঝোঁকের মৌমাছির গতির সঙ্গে। মৌমাছিগুলি পরস্পর সাপেক্ষ চলমান, পুরো ঝাঁকটা কিন্তু এক সঙ্গে থাকে। আমাদের নিজেদের গুচ্ছের (cluster) বাইরে পরীক্ষা করলে দেখা যায় পরিস্থিতিটা অন্যরকম। এখানেও প্রতিটি গুচ্ছের ভিতরে অভ্যন্তরীণ গতি আছে কিন্তু দৃশ্যত অন্য প্রতিটি গুচ্ছই আমাদের গুচ্ছ থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। আমাদের কাছ থেকে তারা যত দূরে, তারা চলমান তত দ্রুত। এই লক্ষ্যনীয় পরিঘটনাই প্রসারমান মহাবিশ্বের ইঙ্গিত।

যেহেতু দৃশ্যত সমস্ত গুচ্ছই আমাদের কাছ দূরে সরে যাচ্ছে সেই জন্য আমাদের মনে হতে পারে আঞ্চলিক পুঞ্জের অবস্থান প্রসারমান মহাবিশ্বের কেন্দ্রে। এটা কিন্তু ভুল হবে, তার কারণ, এ চিন্তন গতির আপেক্ষিকতাকে অগ্রাহ্য করে। এ বইয়ে বারবার সে দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। মৌমাছির ঝাঁকের সঙ্গে তুলনাটা আবার বিচার করুন। ধরে নেওয়া যাক ঝাঁকগুলি সুশিক্ষিত। সেগুলি পশ্চিম থেকে পূব বরাবর রেখায় দশ গজ দূরে দূরে মাটির উপরে উড়ছে। আরও অনুমান করা যাক একটি ঝাঁক ভূমিসাপেক্ষ স্থিতিশীল, এর দশগজ পূর্বদিকের ঝাঁক মিনিটে একগজ করে পূর্বদিকে চলেছে। পূর্বদিকে কুড়িগজ দূরের ঝাঁক পূর্ব অভিমুখে মিনিটে দুগজ চলছে ··· ইত্যাদি। আবার পশ্চিমদিকে

ঝাঁকগুলি ঐ একই ভাবে পশ্চিম অভিমুখে চলেছে। তাহলে যে কোনো ঝাঁকের যে কোনো চলমান কিংবা স্থিতিশীল মৌমাছির মনে হবে অন্য ঝাঁকগুলি তাদের দূরত্বের অনুপাতে দূরে সরে যাচ্ছে। স্থিতির মাপকরূপে যদি ভূমি না পাওয়া যেত তাহলে কোনো একটি ঝাঁক বিশেষভাবে নির্বাচিত এ অনুমান করার কোনো যুক্তি থাকত না।

ছায়াপথের গুচ্ছগুলির আচরণ একেবারেই একরকম। আমাদের সুশিক্ষিত মৌমাছির ঝাঁকগুলির মত লাইন করে না থেকে তারা সর্বদিকে অনিয়মিত ভাবে ছড়িয়ে আছে, সন্দেহ নেই। কিন্তু ঝাঁকগুলির মত এ ক্ষেত্রেও যে কোনো একটি গুচ্ছের একজন পর্যবেক্ষকের মনে হবে অন্যগুলি তার কাছ থেকে দৃশ্যত সরে যাচ্ছে। মহাবিশ্বে স্থিতির কোনো পরম মানক (absolute standard) নেই, সুতরাং দৃশ্যত প্রসারণ সমস্ত গুচ্ছের ক্ষেত্রেই সমরূপ।

যে সমস্ত গুচ্ছ নিয়ে অনুসন্ধান করা হয়েছে তার ভিতরে যেটি দূরতম সেটির লাল অভিমুখী স্থানচ্যুতি, দূর অপসরণের যে গতির অনুরূপ সে গতি আলোকের বেগের প্রায় অর্ধেক। (এই বিরাট পরিমাণ লাল অভিমুখী স্থানচ্যুতির অনুরূপ দূর অপসরণের গতি গণনা করতে হলে অবশ্যই তার ভিত্তি হবে ষষ্ঠ অধ্যায়ে বিবৃত লোরেনৎজ্ রূপান্তর সঙ্কেত।)

জ্যোতির্বিজ্ঞানে এ পর্যন্ত সবচাইতে বেশী লাল অভিমুখী বিচ্যুতি যে ক্ষেত্রে দেখা গিয়েছে সেগুলি দূরের গুচ্ছ নয়—সেগুলি তথাকথিত কোয়াসার (quasistellar objects—তারকাকল্প বস্তু)। এগুলির লালমুখী বিচ্যুতি আলোকের বেগের নয় দশমাংশ বেগে অপসরণের অনুরূপ। এদের চরিত্র কিন্তু এখনো বোঝা যায়নি। সেইজন্য জ্যোতির্বিজ্ঞানের উপাত্ত (data) যখন তাত্ত্বিক প্রতিরূপ (model) গঠনের জন্য ব্যবহার করা হয় তখন এগুলিকে ঠিকভাবে গণনার ভিতরে আনা যায় না।

এইবার দেখা যাক মহাকর্ষ সম্পর্কীয় এই সংবাদগুলিকে কিভাবে ব্যাপক অপেক্ষবাদের সঙ্গে খাপ খাওয়ানো যায়। আমরা দেখেছি সূর্যের মহাকর্ষীয় ক্রিয়ার বিবরণ স্থান-কালে একটি পাহাড়ের বিবরণের মত দেওয়া যায়। একটি ছায়াপথ, একটি গুচ্ছ কিংবা একটি অতিগুচ্ছের প্রতিরূপও এইভাবে হতে পারে, তবে ভর অনেক বেশী হওয়ার দরুন পাহাড়টাকে অনেক বড় হতে হবে। এর সঙ্গে যদি আমরা প্রতিটি ছায়াপথের তারকা

এবং প্রতিটি গুচ্ছের ছায়াপথ যুক্ত করতে চাই তাহলে বহু পর্বত শৃঙ্গ আর উপত্যকা মিলিয়ে অত্যন্ত জটিল একটি পাহাড় হবে। সে ক্ষেত্রে আমরা চেষ্টা করতে পারি বিবরণ এমনভাবে দিতে যে, পুরো মহাবিশ্বের প্রতিরূপ হবে একটি স্থান-কাল। আর তার ভিতরে ছড়ানো পাহাড়-গুলি হবে গুচ্ছের প্রতিরূপ। এইরকম প্রতিরূপ গণিতের দিক থেকে হবে অত্যন্ত জটিল কারণ তার ভিতরে থাকবে নানারকম "ভৌগোলিক" খুঁটিনাটি। অথচ মহাবিশ্বের পূর্ণাঙ্গ রূপের বিবরণের জন্য সেগুলি আবশ্যিক নয়। বিবরণ সরল করার জন্য আমরা এমন প্রতিরূপ দিয়ে শুরু করব যে প্রতিরূপে দৃশ্যত মূলগত অবয়বগুলি রক্ষিত হবে অথচ ভৌগোলিক খুঁটিনাটি বাদ পড়বে। অবয়বের যে দিকগুলি আমরা রক্ষা করতে চাই সেগুলি হল : বিরাট মাত্রার বিচারে (large scale uniformity) সমরূপত্ব এবং সম্প্রসারণ (expension)। যেগুলি আমরা রাখতে চাইনা সেগুলি হল : সঠিক অবস্থান আকার (size), গঠন (composition), একক ছায়াপথ, গুচ্ছ এবং অতিগুচ্ছের।

সুতরাং আমরা মহাবিশ্বকে প্রায় (approximate) সমরূপ না ভেবে সম্পূর্ণ সমরূপ অনুমান করে প্রতিরূপ গঠনের (to represent) জন্য স্থান-কালের আদল (model) তৈরী করতে পারি। এইসমস্ত সরলীকৃত প্রতিরূপে পদার্থ জমে জমে পুঞ্জ পুঞ্জ হয়েছে এবং তাদের মাঝে মাঝে বিরাট বিরাট স্থান রয়েছে—এরকম না ভেবে আমরা কল্পনা করি পদার্থ মসৃণ হয়ে অবিচ্ছিন্নভাবে বণ্টিত।

ঠিক যেরকম সঞ্চিত পদার্থ পুঞ্জে পরিণত এই বিবরণ দেবার জন্য বলা যায়, স্থান-কালে একটা বড় পাহাড় আছে যেখানে পুঞ্জ দেখা যায় কিংবা বলা যায় স্থান-কাল সেই পুঞ্জের নিকটে বক্র ঠিক তেমনি মহা-বিশ্বের মসৃণ আদলে পদার্থের অবিচ্ছিন্ন বণ্টনের বর্ণনা দেওয়া যায় স্থান-কাল সমরূপে বক্র এই ঘোষণার সাহায্যে। বিভিন্ন গুচ্ছ গঠনকারী পদার্থকে মসৃণ করার ফল হবে অনুরূপ বক্রতাকে মসৃণ করে সামগ্রিক সামান্য বক্রতা সৃষ্টি করা। মহাবিশ্বের এই সামগ্রিক বক্রতা অনেকটা সাধারণ স্থানে একটি গোলোকের বক্রতার সদৃশ। কিন্তু স্থান-কালের সঙ্গে বক্রতার এই সাদৃশ্যকে আরও এগিয়ে নিয়ে স্থান-কালের সামগ্রিক বক্রতাকে পৃথিবীর বক্রতার সঙ্গে তুলনা করা সঠিক নয় তার কারণ এ পদ্ধতি

সহজেই আমাদের ভুলপথ নির্দেশ করবে এরকম আশঙ্কা রয়েছে।

অপেক্ষবাদের মহাকর্ষীয় বিধি এবং মসৃণ হওয়া অনুমান অর্থাৎ নির্ভুল সমরূপত্ব অনুমান এই দুইয়ের সহযোগে আমরা মহাবিশ্বের নানারকম প্রতিরূপ গঠনের অনুমোদন পেতে পারি। সেই প্রতিরূপগুলিতে সামগ্রিক বক্রতা নানারকম ভিন্ন ভিন্ন অবয়ব গ্রহণ করে। এই সামগ্রিক বক্রতার প্রধান ক্রিয়া : কোনো কোনো প্রতিরূপে আমরা এই ইঙ্গিত পাই, যে দূরস্থিত বস্তুর বর্ণালী লাল অভিমুখে স্থানচ্যুত হবে। এই লাল অভিমুখে স্থানচ্যুতির কারণ দূরাপসরণ গতি না স্থান-কালের বক্রতা সে নির্বাচন নেহাতই রুচির ব্যাপার। যে কোনো একটা বেশে এ অভিক্রিয়া দেখা দেবে। সেটা নির্ভর করবে মহাবিশ্বের বর্ণনায় কোন স্থানাঙ্কতন্ত্র ব্যবহার করা হয়েছে তার উপর। অপেক্ষবাদের ভবিষ্যদ্বাণী অবশ্য স্থানাঙ্ক তন্ত্র নির্বাচনের উপর নির্ভরশীল নয়।

মহাবিশ্বের যে প্রতিরূপ আমরা বিচার করছি তার সঙ্গে আমাদের মহাবিশ্বের পর্যবেক্ষণ করা সামগ্রিক ধর্মের কমবেশী মিল রয়েছে। নূতন বিধি এবং সমরূপত্ব অনুমানের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ একাধিক অন্য প্রতিরূপও রয়েছে। সে প্রতিরূপগুলিতে লাল অভিমুখী স্থানচ্যুতির স্থলে রয়েছে মহাবিশ্বের সঙ্কোচনের (contraction) অনুরূপ নীল অভিমুখী স্থানচ্যুতি। এইরূপ একাধিক প্রতিরূপের অস্তিত্ব কিন্তু নূতন তত্ত্বকে পরিত্যাগ করার সপক্ষে কোনো যুক্তি নয়। এর ইঙ্গিত : তত্ত্বটি সম্পূর্ণ নয়, প্রয়োজন বাড়তি আরও কিছু অনুমান—যার সাহায্যে অবাঞ্ছিত প্রতিরূপগুলিকে বহিষ্কার করা যায়। নানারকম অনুমানের ইঙ্গিত আসছে কিন্তু সম্পূর্ণ সন্তোষজনক কোনো অনুমান এ পর্যন্ত পাওয়া যায়নি।

সম্প্রসারণের আরও একটু দূরতর ফলশ্রুতি বিচার করা যাক। এ কাজে অবশ্য মনে রাখতে হবে যে, আমরা যা বলি প্রয়োজন হলে সব সময়েই সেটা স্থান-কাল বক্রতার বাগ্বিধিতে নূতন করে প্রকাশ করা যাবে। সব চাইতে সহজ প্রতীয়মান ফলশ্রুতি হল : ছায়াপথের স্তম্ভগুলি যদি দূরতর হতে থাকে তাহলে অতীতে তারা নিশ্চয়ই এখনকার তুলনায় নিকটতর ছিল। ধরে নেওয়া যাক, সম্প্রসারণের সম্পূর্ণ ইতিহাস নথিভুক্ত করার জন্য সম্প্রসারণশীল মহাবিশ্বের বহু মিলিয়ন বৎসরব্যাপী একটি চলচ্চিত্র তোলা হয়েছে। এই

রকম একটি চলচ্চিত্র যদি অতীত অভিমুখে চালানো হয় তাহলে সে চিত্র মহাবিশ্বের ইতিহাস উল্টোভাবে দেখাবে। দেখা যাবে ছায়াপথের সমস্ত গুচ্ছ পরস্পর থেকে দূরে অপসরণ না করে তারা পরস্পরের অভিমুখে ধাবমান। চলচ্চিত্রটি যত বেশী অতীতে যাবে এগুলি ততই নিকটতর হতে থাকবে। শেষ পর্যন্ত তারা এত কাছাকাছি হবে যে তাদের ভিতরে আর কোনো ব্যবধান থাকবে না। আমরা অনুমান করতে পারি আরও অতীতে তারাগুলির অন্তর্বর্তী স্থানও পূরিত হবে। প্রাপ্তিযোগ্য সমস্ত স্থান অত্যন্ত ঘনীভূত তপ্ত বায়বীয় পদার্থে পূর্ণ থাকবে। এই বায়বীয় পদার্থ থেকেই তারকাগুলি বিবর্তিত হয়ে থাকতে পারে।

জ্যোতির্বিজ্ঞানের ইদানীংকার হ্রস্বতরঙ্গ পর্যবেক্ষণের ফল—এই অতীব ঘনীভূত অবস্থার অস্তিত্ব প্রমাণ করেছে। পৃথিবীতে অবস্থিত গ্রাহকযন্ত্রে (receiver) যে বেতার শক্তি উপনীত হয় তাঁর একটি অংশ আন্তঃতারকা বায়বীয় পদার্থ কিংবা তারকা থেকে নির্গত নয় বরং আদিম যুগে সমগ্র মহাবিশ্ব যখন অতীব ঘনীকৃত অবস্থায় ছিল তখনকার বিকিরণের যতটুকু এখনো দৃশ্যমান বলে আশা করা যেত তার সঙ্গে এ অংশের মিল রয়েছে এ তথ্যই যুক্তিযুক্ত।

তাত্বিক প্রতিরূপের ঘনীকৃত অবস্থা সম্পর্কীয় ভবিষ্যদবাণী কিন্তু খুব বেশী বিশ্বাস করা যায় না। পদার্থের কোয়াণ্টাম ধর্ম সম্পর্কে যতটা জানা যায় তা থেকে মনে হয় যথেষ্ট আদিম কালে এই ধর্মগুলির গুরুত্বপূর্ণ অভিক্রিয়া থাকবার কথা। কখন এটা হবার কথা ছিল সে সম্পর্কে কোনো সাধারণ মতৈক্য নেই তবে কোনো ক্ষেত্রেই অপেক্ষবাদের একার পক্ষে এই ধরণের অভিক্রিয়ার বিবরণ দানের ক্ষমতা নেই। একটি সন্তোষজনক বিবরণ দানের জন্য অপেক্ষবাদ এবং কোয়াণ্টাম তত্ত্বের বিকাশের ভিত্তিতে ইদানীং বিরাট প্রচেণ্টা চলেছে। কিন্তু বিকাশগুলির কোনোটির কোনো স্থায়ী গুরুত্ব থাকবে কিনা সেটা এখনো স্পণ্ট নয়।

এ সমস্তই দূর কল্পনা। খুব সম্ভব অতীব ঘনীকৃত অবস্থা থেকে মহাবিশ্ব বিবর্তিত হয়েছে এবং আরও বেশী সম্ভব—যে কাল সম্পর্কে কখনো কোনো বৈজ্ঞানিক সংবাদ পাওয়া যাবে তার ভিতরে আদিমতম কালের প্রতিরূপ এই অতীব ঘনীকৃত অবস্থা। এরকম অবস্থা সত্যই ঘটেছিল কিনা তা নিয়ে এখন কোনো দ্বন্দ্ব নেই। এই অতীব ঘনীকৃত

অবস্থাই 'মহাবিশ্বের শুরু' কিংবা 'মহাবিশ্ব সৃষ্টির লগ্ন' কিংবা এইরকম কিছু মতবাদের দিকে অনেকে ঝুঁকছেন। এটা দুর্ভাগ্য। এ মতগুলির অর্থ : "এই হোল আদিমতম কাল যার সম্পর্কে কখনো কোনো বৈজ্ঞানিক তথ্য পাওয়া সম্ভব"—এর বেশী কোনো অর্থ এ সমস্ত শব্দগুচ্ছের নেই। সেগুলিকে এড়িয়ে যাওয়াই ভালো। কারণ এ থেকে হতে পারে অবাঞ্ছিত আধিবিদ্যক ফলশ্রুতি (metaphysical implications)।

এখনকার অবস্থানুসারে, অপেক্ষবাদ থেকে আহরিত মহাবিশ্বের কিছু প্রতিরূপ এবং অতীব ঘনীকৃত অবস্থা থেকে সম্প্রসারণকে জ্যোতির্বিজ্ঞানের উপাত্তের সঙ্গে সহজেই মানিয়ে নেওয়া যায়। এগুলির প্রতিটিরই দোষ রয়েছে, তার ভিতরে সবচাইতে স্পষ্ট প্রতীয়মান দোষ : এগুলি প্রকাশ করে মসৃণীকৃত চিত্র। সে চিত্র থেকে ছায়াপথ এবং গুচ্ছের আকার এবং গঠন সম্পর্কে কোনো কারণ পাওয়া যায় না।

সম্পূর্ণ সন্তোষজনক প্রতিরূপ গঠন নির্ভর করে কতগুলি গুরুত্বপূর্ণ গাণিতিক সমস্যা সমাধানের উপর। একটি বিশেষ সময়ে প্রাপ্তিসাধ্য প্রতিরূপগুলির ভিতর কোনটি পছন্দ হবে সেটা অবশ্যই নির্ভর করবে গাণিতিক উপাত্তের উপর।

দ্বাদশ অধ্যায়

প্রচলিত রীতি এবং প্রাকৃতিক বিধি

যে কোনো বিতর্কে শব্দ (word) বিষয়ক দ্বন্দ্ব এবং বাস্তব ঘটনা (facts) বিষয়ক দ্বন্দ্ব পৃথক করা কঠিনতম বিষয়গুলির ভিতর একটি। কঠিন হওয়া উচিৎ না হলেও কার্যক্ষেত্রে ব্যাপারটা কঠিন। এ তথ্য অন্যান্য বিষয় সম্পর্কে যেমন সত্য তেমনি সত্য পদার্থবিদ্যা সম্পর্কে। সপ্তদশ শতাব্দীতে প্রচণ্ড বিতর্ক হয়েছিল : 'বল' (force) কাকে বলে তাই নিয়ে। এখন আমাদের কাছে এটা স্বতঃপ্রতীয়মান যে তর্কটা ছিল বল (force) শব্দটা কি করে সংজ্ঞিত (defined) হবে তাই নিয়ে। কিন্তু সে কালের চিন্তন ছিল : বিতর্কের বিষয়টা এর চাইতে অনেক বড়। অপেক্ষবাদের গণিতে টেন্সর (Tensor) পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়। টেন্সর পদ্ধতি ব্যবহারের একটি উদ্দেশ্য ছিল ভৌতবিধি (physical laws) থেকে শুদ্ধ শাব্দিক (purely verbal)-কে (বিস্তৃত অর্থে) বিযুক্ত করা। এটা অবশ্য স্বতঃপ্রতীয়মান যে স্থানাঙ্ক নির্বাচনের উপর যা নির্ভর করে সংশিলষ্ট অর্থে সেটা শাব্দিক (verbal)। একটি লোক লগি ঠেলে নৌকো বরাবর হাঁটছে কিন্তু লগিটা না তোলা পর্যন্ত সে নদীতল সাপেক্ষ তার অবস্থান অপরিবর্তিত রাখছে। যে লোকটা লগি ঠেলছে সে হাঁটছে না স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে এনিয়ে একজন লিলিপুট সীমাহীন তর্ক করতে পারে। তর্কটা হবে শব্দ বিষয়ে বাস্তব ঘটনা বিষয়ে নয়। আমরা যদি নৌকো সাপেক্ষ স্থির স্থানাঙ্ক নির্বাচন করি তাহলে লগি ঠেলা লোকটা হাঁটছে আর যদি নদীতল সাপেক্ষ স্থির স্থানাঙ্ক নির্বাচন করি : তাহলে লগি ঠেলা লোকটি স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে আছে। ভৌতবিধি আমরা এমনভাবে প্রকাশ করতে চাই যাতে দুটি বিভিন্ন স্থানাঙ্কতন্ত্রে আরোপ করলেও আমরা এই বিধি প্রকাশ করছি এটা স্বতঃপ্রতীয়মান হবে। তাহলে যখন আমরা একটিমাত্র বিধি ভিন্ন বাগ্বিধিতে প্রকাশ করছি তখন ভুলক্রমেও অনুমান করব না যে আমাদের ভিন্ন ভিন্ন বিধি রয়েছে। এ কাজ করা যায় টেন্সর পদ্ধতিতে। কতগুলি বিধি একটি ভাষায় সম্ভাব্য মনে হলেও অন্য ভাষায় অনুবাদ করা যায় না। প্রাকৃতিক বিধিরূপে এগুলি গ্রহণ করা সম্ভব নয়। যে বিধিগুলি যে কোনো স্থানাঙ্কের বাগ্বিধিতে অনুবাদ করা সম্ভব সে বিধিগুলির কয়েকটি বৈশিষ্ট্য আছে।

অপেক্ষবাদ যেগুলিকে সম্ভাব্য মনে করে, প্রাকৃতিক বিধিগুলির ভিতর থেকে সেগুলি খুঁজতে হলে এই বৈশিষ্ট্যগুলি প্রচুর সাহায্য করে। সম্ভাব্য বিধিগুলির ভিতরে যেগুলি বস্তুপিণ্ডের সত্যকার গতি সম্পর্কে নির্ভুল ভবিষ্যদ্বাণী করে সেগুলির ভিতরে সরলতম বিধিই আমরা নির্বাচন করি। এই নির্বাচনের যুক্তি এবং অভিজ্ঞতা সমপরিমাণে সাহায্য করে।

কিন্তু সত্যকারের প্রাকৃতিক বিধি প্রাপ্তির সমস্যা শুধু মাত্র টেনসর পদ্ধতির দ্বারাই সমাধান করা যাবে না। তার সঙ্গে প্রয়োজন প্রচুর পরিমাণ সতর্ক চিন্তন। এর ভিতরে খানিকটা করা হয়েছে কিন্তু অনেকটাই বাকী আছে।

একটি সরল উদাহরণ : অনুমান করা যাক একটি অভিমুখের দৈর্ঘ্য অন্য অভিমুখের দৈর্ঘ্যের তুলনায় কম অর্থাৎ লোরেন্‌জ সঙ্কোচনের প্রকল্পে যে রকম আছে সেইরকম। ধরে নেওয়া যাক উত্তর অভিমুখী একটি ফুটরুলের দৈর্ঘ্য পূর্বমুখী একই ফুটরুলের দৈর্ঘ্যের অর্ধেক এবং এ তথ্য সমস্ত বস্তুপিণ্ড সাপেক্ষই সত্য। এইরকম প্রকল্প কি অর্থবহ? আপনার একটি মাছধরার ছিপ পশ্চিমমুখী ঘোরালেও তার দৈর্ঘ্য যদি পনের ফুট হয়, সেটা উত্তরমুখে ঘোরালেও তার দৈর্ঘ্য পনের ফুটই থাকবে। তার কারণ মাপন দণ্ডটিও হ্রস্ব হয়ে যাবে। এটা হ্রস্বতর দেখাবে না কারণ আপনার চক্ষুও প্রভাবিত হবে একই ভাবে। পরিবর্তনটা যদি খুঁজে বার করতে চান তাহলে সাধারণ মাপনে চলবে না। এর জন্য চাই মিচেলসন মর্লি পরীক্ষার ধরণের কোনো পদ্ধতি। মিচেলসন মর্লি পরীক্ষায় আলোকের বেগকে দৈর্ঘ্য মাপার জন্য ব্যবহার করা হয়। তারপরও দৈর্ঘ্যের পরিবর্তন অনুমান করা সহজতর, না আলোকের বেগের পরিরর্তন অনুমান করা সহজতর, এ বিষয়ে আপনাকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে। পরীক্ষামূলক তথ্য হবে : আপনার ফুটরুল যে দূরত্ব নির্দেশ করে সে দূরত্ব অতিক্রম করতে এক অভিমুখের চাইতে অন্য অভিমুখে আলোকের বেশী সময় লাগছে কিংবা মিচেলসন মর্লি পরীক্ষার মত : বেশী সময় লাগা উচিৎ কিন্তু লাগছে না। এই রকম তথ্যের সঙ্গে আপনার মাপনকে আপনি নানা ভাবে মানিয়ে নিতে পারেন। যে পদ্ধতিই আপনি গ্রহণ করুন না কেন চলতি রীতির খানিকটা তার ভিতরে থাকবে। মাপন সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে

আপনার বিধিগুলি গঠনের পরও এই চিরাচরিত রীতির খানিকটা থেকে যায়। অনেক সময়ই এ অস্তিত্বের রূপ সূক্ষ্ম এবং কপট (elusive)। চিরাচরিত রীতিকে বিযুক্ত করা আসলে অসাধারণ কঠিন ব্যাপার। ব্যাপারটা যত বিবেচনা করা যায় কাঠিন্য ততই বেশী মনে হয়।

ইলেক্ট্রনের আকারের প্রশ্ন আরও গুরুত্বপূর্ণ একটি উদাহরণ। পরীক্ষায় দেখা যায় সমস্ত ইলেক্ট্রনের একই আকার, এর কতটা পরীক্ষালব্ধ অকৃত্রিম বাস্তব সত্য এবং কতটা মাপনের চিরাচরিত রীতির ফলশ্রুতি, এ ক্ষেত্রে আমাদের ভিন্ন ভিন্ন দুটি তুলনা করতে হয়: (১) বিভিন্ন কালে একটি ইলেক্ট্রন বিষয়ে, (২) একই কালে দুটি ইলেক্ট্রন বিষয়ে। তারপর আমরা প্রথমটির সঙ্গে দ্বিতীয়টিকে সংযুক্ত করে বিভিন্ন কালে দুটি ইলেক্ট্রনের তুলনায় করতে পারি। সমস্ত ইলেক্ট্রনকে একই ভাবে প্রভাবিত করবে এরকম প্রকল্প আমরা পরিত্যাগ করতে পারি। উদাহরণ: একটি স্থান-কাল অঞ্চলের সমস্ত ইলেক্ট্রন অন্য একটি স্থান-কাল অঞ্চলের সমস্ত ইলেক্ট্রনের চাইতে বড় এইরকম কোনো প্রকল্প। এই রকম কোনো পরিবর্তন আমাদের মাপন যন্ত্র এবং মাপিত বস্তুকে সমানভাবে প্রভাবিত করবে সুতরাং আবিষ্কারযোগ্য কোনো পরিঘটনা এর ফলে পাওয়া যাবে না। এ কথা বলা এবং কোনো পরিবর্তন হবে না বলা সমার্থক। কিন্তু উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়: দুটি ইলেক্ট্রনের একই ভর এই বাস্তব ঘটনাকে শুদ্ধ রীতিগত বলা যায় না। যথেষ্ট সূক্ষ্মতা এবং নির্ভুলতা থাকলে, তৃতীয় একটি ইলেক্ট্রনের উপর দুটি ইলেক্ট্রনের ক্রিয়ার তুলনা আমরা করতে পারি। সমরূপ পরিবেশে যদি তারা অভিন্ন হয় তাহলে আমরা সিদ্ধান্ত করতে পারি অভিন্নতা শুধুমাত্র শুদ্ধ রীতিগত নয়।

অপেক্ষবাদের উচ্চতর পর্যায়ের (advanced portions) সঙ্গে সংশ্লিষ্ট পদ্ধতিকে এডিংটন "বিশ্বগঠন" (World Buildings) আখ্যা দিয়েছিলেন। যে অবয়ব গঠন করতে হবে সেটা হোল আমাদের জানা ভৌত বিশ্ব। হিসাবী স্থপতি চেষ্টা করেন সম্ভাব্য স্বল্পতম সামগ্রীর সাহায্যে গঠন করতে। এটা যুক্তি আর গণিতের প্রশ্ন। এই দুই বিষয়ের প্রযুক্তিতে আমাদের দক্ষতা যত বেশী হবে অবয়বের গঠনও হবে তত বেশী বাস্তব এবং শুধুমাত্র পাথরের স্তুপে আমাদের সন্তুষ্টি তত কমবে। কিন্তু প্রকৃতি আমাদের যে পাথরগুলি দিয়েছেন অবয়ব গঠনের আগে সেগুলিকে

সঠিক আকারে কাটতে হবে। এ সমস্তই গঠনক্রিয়ার অংশ। এ কাজ সম্ভব হতে হলে কাঁচা মালেরও গঠন থাকা প্রয়োজন (একে আমরা কাঠের জমিনের [grain] সদৃশরূপে কল্পনা করতে পারি)। কাজ কিন্তু প্রায় যে কোনো গঠনেই চলবে। পারস্পরিক গাণিতিক পরিমার্জনার সাহায্যে আমাদের প্রাথমিক প্রয়োজনকে ছাঁটকাট করে কমাতে থাকি। শেষপর্যন্ত তার পরিমাণ থাকে অতি অল্প। প্রয়োজনীয় সর্বনিম্ন এই গঠন (grain) কাঁচামালে থাকলে আমরা দেখতে পাই—তা থেকে আমরা এমন একটি গাণিতিক অভিব্যক্তি গঠন করতে পারি, যে অভিব্যক্তির আমাদের অনুভূত বিশ্বের বিবরণ দেওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় গুণ থাকবে। বিশেষ করে থাকবে নিত্যতা ধর্মের বিবরণ দেওয়ার মত গুণ। এই ধর্মই ভরবেগ এবং শক্তির (কিংবা ভরের) বৈশিষ্ট্য। শুধুমাত্র ঘটনাগুলি ছিল আমাদের কাঁচামাল। কিন্তু যখন দেখতে পাই এর সাহায্যে আমরা এমন কিছু গঠন করতে পারি যা কখনো সৃষ্টি হয়েছে কিংবা ধ্বংস হয়েছে বলে প্রতিভাত হয় না তখন আমরা "বস্তুপিণ্ডে" বিশ্বাস করতে শুরু করি—এতে বিস্ময়ের কিছু নেই। এগুলি আসলে ঘটনা থেকে তৈরী গাণিতিক গঠন, কিন্তু স্থায়িত্বের (permanence) দরুন সেগুলির ব্যবহারিক মূল্য রয়েছে। আমাদের বোধেন্দ্রিয়গুলি, (হয়ত জৈব প্রয়োজনই সেগুলির বিকাশের কারণ) তাত্ত্বিক দিক দিয়ে অধিক মূলগত কিন্তু অমার্জিত (crude) অবিচ্ছিন্ন ঘটনাবলীর স্থলে সেগুলি লক্ষ্য করার জন্য অভিযোজিত (adopted)। তবে তাত্ত্বিক দিক থেকে অমার্জিত অবিচ্ছিন্ন ঘটনাবলীই বেশী মূলগত। এই দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে, ভৌত বিজ্ঞান বাস্তব বিশ্বের কত সামান্য অংশ যে প্রকাশ করতে পারে সেটা বিস্ময়কর: শুধুমাত্র প্রথাগত উপাদানের দ্বারাই নয়, বোধেন্দ্রিয়ের নির্বাচনীবৃত্তির দ্বারাও (selectiveness) আমাদের জ্ঞান সীমিত।

বোধেন্দ্রিয়ের নির্বাচনী বৃত্তির ফলে উদ্ভূত আমাদের সীমিত জ্ঞানের একটি উদাহরণ: শক্তির অবিনশ্বরতা। এ তথ্য পরীক্ষার সাহায্যে ক্রমান্বয়ে আবিষ্কৃত হয়েছে। মনে হয়েছিল এটা দৃঢ়ভিত্তিক পরীক্ষালব্ধ প্রাকৃতিক বিধি। এখন দেখা যাচ্ছে আমাদের প্রাথমিক স্থান-কাল সাংতত্যক (continuum) থেকে আমরা এমন একটি গাণিতিক অভিব্যক্তি গঠন করতে

পারি যার গুণে এটা হবে দৃশ্যত অবিনশ্বর। তাহলে শক্তি অবিনশ্বর এই প্রস্তাব পদার্থবিদ্যার প্রতিজ্ঞারূপে (proposition) আর থাকে না—হয়ে দাঁড়ায় ভাষাতত্ত্ব আর মনস্তত্ত্বের প্রতিজ্ঞা। ভাষাতত্ত্বের প্রস্তাব অনুসারে: শক্তি আলোচ্য গাণিতিক অভিব্যক্তির নাম। মনস্তত্ত্বের প্রস্তাবরূপে: আমাদের বোধেন্দ্রিয় এমন যে আমরা আলোচ্য গাণিতিক অভিব্যক্তিটি মোটামুটি লক্ষ্য করি এবং আমাদের অমার্জিত বোধকে বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণ দ্বারা সংস্কার করতে করতে ক্রমশ ঐ গাণিতিক অভিব্যক্তির নিকটতর হই। পদার্থবিদরা শক্তি বিষয়ে নিজেদের জ্ঞান সম্পর্কে যা মনে করতেন এটা তার চাইতে অনেক কম।

পাঠক বলতে পারেন: পদার্থবিদ্যার তাহলে বাকি রইল কি? পদার্থময় জগৎ (world of matter) সম্পর্কে আসলে আমরা কি জানি? এক্ষেত্রে আমরা পদার্থবিদ্যার তিনটি বিভাগকে পৃথক করতে পারি। প্রথমত, সম্ভাব্য বিস্তৃততম সাধারণীকৃত অপেক্ষবাদের অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলি, দ্বিতীয়ত, যে বিষয়গুলিকে অপেক্ষবাদের অন্তর্ভুক্ত করা যায় না। তৃতীয়ত রয়েছে সেইগুলি, যেগুলিকে ভূগোল বলা চলে। এগুলিকে পরপর বিচার করা যাক।

প্রচলিত রীতি বাদ দিলে, অপেক্ষবাদ আমাদের বলে মহাবিশ্বের ঘটনাগুলির একটি চারমাত্রিক ক্রম (order) আছে এবং এই ক্রমে পরস্পর নিকটবর্তী হলে যে কোনো দুটি ঘটনার ভিতরে একটি সম্পর্ক রয়েছে, তার নাম 'অন্তর' (interval)। উপযুক্ত সাবধানতা অবলম্বন করলে এই অন্তর মাপা সম্ভব। অপেক্ষবাদ আরও বলে 'পরমগতি' (absolute motion), 'পরমস্থান' (absolute space) এবং 'পরম কালের' (absolute time) কোনো ভৌত গুরুত্ব থাকতে পারে না। এই সমস্ত কল্পনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট পদার্থবিদ্যার বিধিগুলি গ্রহণযোগ্য নয়। এগুলি স্বতঃত ঠিক কোনো ভৌত বিধি নয় বরং এগুলি কিছু প্রস্তাবিত ভৌত বিধিকে সন্তোষজনক নয় এই কারণে পরিত্যাগ করার সামর্থ্য আমাদের দান করার জন্য একটি প্রয়োজনীয় নিয়ম।

ভৌতবিধিরূপে পরিচিত হবার মত এছাড়া যা অপেক্ষবাদে রয়েছে তা অতি সামান্য। তাছাড়া গণিত রয়েছে প্রচুর। তাতে দেখানো হয়েছে গাণিতিকভাবে গঠিত কিছু রাশিকে অবশ্যই আমাদের অনুভূত বস্তুর

মত আচরণ করতে হবে। এবং রয়েছে পদার্থবিদ্যা এবং মনস্তত্ত্বের ভিতরে একটি সেতুর ইঙ্গিত। সে ইঙ্গিত হল : আমাদের জ্ঞানেন্দ্রিয় যা বোধ করবার জন্য অভিযোজিত সেগুলি এবং গাণিতিকভাবে গঠিত এই রাশিগুলি অভিন্ন। কিন্তু কঠোরভাবে বিচার করলে এর কোনোটিই পদার্থবিদ্যা নয়।

পদার্থবিদ্যার যে অংশ বর্তমানে অপেক্ষবাদের আওতায় আনা যায় না সে অংশ বৃহৎ এবং গুরুত্বপূর্ণ। অপেক্ষবাদে এমন কিছু নেই যা দেখাতে পারে কেন ইলেক্ট্রন আর প্রোটন থাকবে। পদার্থের কেন ক্ষুদ্র পিণ্ডরূপ অস্তিত্ব থাকবে সে সম্পর্কেও কোনো যুক্তি অপেক্ষবাদ দেখতে পারে না। এ অঞ্চল কোয়াণ্টাম তত্ত্বের অধিকারে, এ তত্ত্ব ক্ষুদ্র অবস্থাগত পদার্থের বহুধর্মের কারণ দেখাতে পারে। কোয়ান্টাম তত্ত্বের সঙ্গে বিশিষ্ট অপেক্ষবাদের সামঞ্জস্য বিধান করা হয়েছে কিন্তু ব্যর্থ হয়েছে কোয়াণ্টাম তত্ত্বের সঙ্গে ব্যাপক অপেক্ষবাদের সংশ্লেষণের (synthesis) সমস্ত চেষ্টা। পদার্থবিদ্যার এই অংশকে ব্যাপক অপেক্ষবাদের কাঠামোর ভিতরে নিয়ে আসার ব্যাপারে অত্যন্ত কঠিন কিছু সমস্যা রয়েছে। কোয়ান্টাম তত্ত্বের নিজের ভিতরেও রয়েছে একই রকম কঠিন সমস্যা এবং অনেক পদার্থবিদের ধারণা কোয়ান্টাম তত্ত্ব এবং ব্যাপক অপেক্ষবাদের সংশ্লেষণ (synthesis) হয়ত এই সমস্যাগুলির ভিতরে কয়েকটির সমাধান করতে পারবে। আমরা দেখেছি এখনকার পরিস্থিতি হল : অতি বৃহৎ মানে (matter on a very large scale) পদার্থের ধর্ম সম্পর্কে ব্যাপক অপেক্ষবাদ বেশ সন্তোষজনক বিবরণ (accounts-? কারণ) দান করে আর কোয়াণ্টাম তত্ত্ব দান করে অতি ক্ষুদ্র মানের পদার্থের ধর্ম সম্পর্কে বেশ সন্তোষজনক বিবরণ। দুটি তত্ত্বের ভিত্তিতে কিছু ঐক্য রয়েছে কিন্তু এদুটিকে ঐক্যবদ্ধ করার জন্য যে গবেষণা করা হয়েছে এখনো সেগুলিকে দূর কল্পনাভিত্তিক (speculative) রূপেই বিচার করা উচিৎ। অনেকে মনে করেন ব্যাপক অপেক্ষবাদকে এমনভাবে বিস্তৃত করা সম্ভব যে কোয়ান্টাম তত্ত্ব যে সমস্ত ফল (result) ব্যাখ্যা করে সেগুলিও ব্যাখ্যাত হবে এবং সে ব্যাখ্যা হবে বর্তমান কোয়ান্টাম তত্ত্বের ব্যাখ্যার চাইতে অনেক বেশী সন্তোষজনক। এই চিন্তাধারা যাঁদের ছিল মৃত্যুর আগে আইনস্টাইনও ছিলেন তাঁদের একজন। বর্তমানের বহু পদার্থবিদ্যাবিদই কিন্তু ভাবেন এ দৃষ্টিভঙ্গি ভ্রান্ত।

ব্যাপক অপেক্ষবাদ পারস্পরিক (next-to-next) পদ্ধতির চরম উদাহরণ। মহাকর্ষের কারণ গ্রহের উপর সূর্যের ক্রিয়া, একথা ভাববার আর প্রয়োজন নেই, বরং ভাবা যায় গ্রহটি যে অঞ্চলে রয়েছে মহাকর্ষ সেখানকার আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যের অভিব্যক্তি। অনুমান করা হয় স্থান-কালের এক অংশ থেকে অন্য অংশে যাওয়ার সময় এই বৈশিষ্ট্যগুলির পরিবর্তন হয় অল্পে অল্পে, ক্রমান্বয়ে (gradually), অবিচ্ছিন্নভাবে, সহসা উল্লম্ফনের (sudden jumps) সাহায্যে নয়। বিদ্যুৎ চুম্বকত্বের ক্ষেত্রে ক্রিয়াগুলিকেও এইভাবে বিচার করা যায় কিন্তু বিদ্যুৎ চুম্বকত্বের সঙ্গে যখনই কোয়াণ্টাম তত্ত্বের সামঞ্জস্য বিধান করা যায় তখনই হয় এর চরিত্রের আমূল পরিবর্তন। অবিচ্ছিন্ন অবয়ব (continuous aspect) অদৃশ্য হয় এবং তার স্থলে প্রতিস্থাপিত হয় বিচ্ছিন্ন আচরণ (discontinuous behaviour)। আগেই আমরা দেখেছি এটাই কোয়াণ্টাম তত্ত্বের জাতিরূপ (typical)। কিন্তু কোয়াণ্টাম তত্ত্বের এই ধারণাগুলিকে যদি আমরা মহাকর্ষের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে চাই তাহলে আমরা দেখতে পাব এ দুটি ঠিক মত খাপ খায় না এবং দুটি তত্ত্বের যে কোনো একটির কিংবা দুটি তত্ত্বেরই যথেষ্ট পরিবর্তন প্রয়োজন। কি পরিবর্তন প্রয়োজন সেটা এখনো জানা যায়নি।

এ সঙ্কটকে একটু অন্যভাবে ব্যাখ্যা করা যায়। একজন জ্যোতির্বিজ্ঞানী যখন সূর্যকে পর্যবেক্ষণ করেন পর্যবেক্ষণ সাপেক্ষ সূর্যের ঔদাসীন্য তখন রাজকীয়। কিন্তু একজন পদার্থবিজ্ঞানী যখন অনুসন্ধান করতে চেণ্টা করেন একটা পরমাণুতে কি ঘটছে তখনকার ব্যবহৃত যন্ত্রটি যা পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে তার চাইতে অনেক ছোট না হয়ে বরং অনেক বড়। সুতরাং যন্ত্রটির পরমাণুর উপর ক্রিয়া থাকার সম্ভাবনা। দেখা গিয়েছে একটি পরমাণুর অবস্থান নির্ণয়ের জন্য যে ধরণের যন্ত্র সবচাইতে উপযুক্ত সে যন্ত্র পরমাণুর বেগকে প্রভাবিত করতে বাধ্য। এবং বেগ নির্ণয়ের জন্য যে যন্ত্র সবচাইতে উপযুক্ত সে যন্ত্র পরমাণুর অবস্থান প্রভাবিত করতে বাধ্য। পারমাণবিক কোয়াণ্টাম তত্ব এবং বিশিষ্ট অপেক্ষবাদের সমন্বয় করলে এ অসুবিধাগুলি হয় না। কারণ তখন মহাকর্ষকে অগ্রাহ্য করা হয় এবং কাছাকাছি পরমাণু থাকুক কিংবা না থাকুক স্থান-কালকে ভাবা হয় সমতল (flat)। কিন্তু আমরা যখন কোয়ান্টাম তত্ব এবং ব্যাপক অপেক্ষবাদের সমন্বয় সাধন করতে চেণ্টা করি মহাকর্ষকে তখন অগ্রাহ্য করা হয় না সুতরাং স্থান-কালের

বক্রতা নির্ভর করবে পরমাণুর অবস্থিতির উপর। এইমাত্র কিন্তু আমরা দেখেছি কোয়ান্টাম তত্ত্ব স্পষ্টভাবে বলে পরমাণুর অবস্থান কোথায় সেটা আমরা সব সময় জানতে পারি না। সঙ্কটের একটা উৎস এখানে।

শেষে আমরা আসি ভূগোলের প্রসঙ্গে। এর ভিতরে আমরা ইতিহাসকেও অন্তর্ভুক্ত করেছি। ইতিহাসের সঙ্গে ভূগোলের বিচ্ছিন্নতার ভিত্তি, স্থানের সঙ্গে কালের বিচ্ছিন্নতা। যখন আমরা স্থান-কালে এই দুটিকে একত্রিত করি তখন আমাদের প্রয়োজন হয় ইতিহাস ভূগোলের সমন্বয়ের জন্যও একটি শব্দ। সারল্যের খাতিরে, বিস্তৃত অর্থে আমি একটি শব্দ ভূগোলই ব্যবহার করব।

স্থানকালের এক অংশ থেকে অন্য অংশের পার্থক্য নির্ণয় করে এরকম অসংস্কৃত বাস্তব তথ্য যত কিছু আছে, এ অর্থে তার সবটাই ভূগোলের অন্তর্ভুক্ত। এক অংশে সূর্যের অধিকারে, এক অংশ পৃথিবীর, মধ্যবর্তী অঞ্চলে রয়েছে আলোকতরঙ্গ, কিন্তু কোনো পদার্থ নেই (এখানে ওখানে সামান্য পরিমাণ ছাড়া)। বিভিন্ন বাস্তব ভৌগোলিক ঘটনার ভিতরে কিছু পরিমাণ তাত্ত্বিক সম্পর্ক রয়েছে। ভৌত বিধির উদ্দেশ্য এ সম্পর্ককে প্রতিষ্ঠিত করা।

এখনই আমরা সৌরতন্ত্রের অতীতে আর ভবিষ্যতে ব্যাপ্ত বিশাল কালের বৃহৎ ঘটনাগুলি গণনা করতে সক্ষম। কিন্তু এই জাতীয় সমস্ত গণনার জন্য আমাদের অসংস্কৃত বাস্তব ঘটনার ভিত্তি প্রয়োজন। বাস্তব ঘটনাগুলি পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত, কিন্তু বাস্তব ঘটনাগুলির অনুমিতি (inference) একমাত্র অন্য বাস্তব ঘটনা থেকেই সম্ভব, শুধু সাধারণ বিধি থেকে নয়। সুতরাং পদার্থবিদ্যায় ভৌগোলিক বাস্তব ঘটনাবলীর একটি অন্য নিরপেক্ষ স্থান রয়েছে; যদি আমাদের অনুমিতির জন্য প্রয়োজনীয় উপাত্ত হিসাবে অন্য বাস্তব ঘটনা আমরা না জানি তাহলে ভৌত বিধি যতই থাকুক না কেন ভৌত ঘটনা অনুমানের সামর্থ্য আমাদের হবে না। এ ক্ষেত্রে যখন আমি বাস্তব ঘটনাবলীর কথা বলছি তখন আমি ভাবছি ভূগোলের কয়েকটি বিশিষ্ট বাস্তব ঘটনার কথা। ভূগোল শব্দ আমি যে বিস্তৃত অর্থে ব্যবহার করছি এখানে সেই অর্থেই শব্দটি ব্যবহৃত হল।

অপেক্ষবাদে আমাদের বিচার্য অবয়ব (structure) কিন্তু যে পদার্থ

দিয়ে অবয়ব গঠিত সেটা বিচার্য নয়। অন্যদিকে ভূগোলে ঐ পদার্থ প্রাসঙ্গিক। একটি স্থানের (place) সঙ্গে অন্য একটি স্থানের যদি পার্থক্য থাকতে হয় তাহলে হয় একটি স্থানের পদার্থের সঙ্গে অন্য স্থানের পদার্থের পার্থক্য থাকবে কিংবা কোনো স্থানে পদার্থ থাকবে এবং কোনো স্থানে থাকবে না। এই দুটি বিকল্পের ভিতরে প্রথমটিকেই বেশী সন্তোষজনক মনে হয়। আমরা বলতে চেষ্টা করতে পারি : ইলেকট্রন, প্রোটন এবং অন্যান্য উনপারমাণবিক কণা (subatomic particles) রয়েছে—বাকিটা শূন্য। কিন্তু শূন্য অঞ্চলে আলোকতরঙ্গ রয়েছে সুতরাং সেখানে কিছু নেই একথা আমরা বলতে পারি না। কোয়াণ্টাম তত্ত্ব অনুসারে এমন কি বস্তুগুলি কোথায় আছে সে কথাও আমরা নির্ভুলভাবে বলতে পারি না। শুধুমাত্র বলতে পারি—একটি স্থানের তুলনায় অন্য একটি স্থানে ইলেকট্রন পাওয়ার সম্ভাবনা বেশী। কারও কারও মতে আলোকতরঙ্গ এবং কণিকাগুলি ইথারের বিক্ষোভমাত্র, অন্যরা শুধুমাত্র বিক্ষোভ বলেই খুশী। কিন্তু সে যাই হোক যেখানেই আলোকতরঙ্গ কিংবা কণিকা থাকবার সম্ভাবনা রয়েছে, সেখানেই ঘটনা ঘটছে। যেখানেই কোনো রূপে শক্তি থাকার সম্ভাবনা সে স্থান সম্পর্কে আমাদের বলার ক্ষমতা এই পর্যন্ত, তার কারণ শক্তি এখন একাধিক ঘটনার ভিত্তিতে গঠিত গাণিতিক গঠনের রূপ নিয়েছে। সুতরাং আমরা বলতে পারি স্থান-কালের সর্বত্র ঘটনা রয়েছে কিন্তু যে অঞ্চল নিয়ে আমরা বিচার করছি সে অঞ্চলে একটি ইলেকট্রন কিংবা প্রোটন থাকবার খুব বেশী সম্ভাবনা আছে না সে অঞ্চল সাধারণত আমরা যাকে শূন্যস্থান বলি সেরকম ঘটনাগুলির পার্থক্য হবে সেই অনুসারে। কিন্তু শুধুমাত্র যে ঘটনাগুলি নিজেদের জীবনকালের ভিতর সংঘটিত হয় সেই ঘটনাগুলি ছাড়া অন্যগুলির স্বকীয় চরিত্র (intrinsic nature) আমরা কিছুই জানতে পারি না। যে অসংস্কৃত ঘটনাগুলিকে পদার্থবিদ্যা একটি ছকে সাজায় আমাদের অনুভূতি এবং বোধ নিশ্চয়ই তার একটি অংশ কিংবা বলা যেতে পারে পদার্থবিদ্যা সেগুলিকে একটি ছকে সাজানো অবস্থায় আবিষ্কার করে। যে ঘটনাগুলি আমাদের জীবনের অংশ নয়, সেগুলির ছক পদার্থবিদ্যা আমাদের কাছে প্রকাশ করে কিন্তু ঘটনাগুলি স্বতঃত (in themselves) কি রকম সে কথা প্রকাশ করতে পদার্থবিদ্যা একেবারেই অক্ষম। অন্য কোনো পদ্ধতিতে এগুলি আবিষ্কৃত হওয়ার সম্ভাবনাও দেখা যাচ্ছে না।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

'বল' (force)-এর অবলুপ্তি

নিউটনীয় তন্ত্র অনুসারে কোনো বলের ক্রিয়াধীন না হলে বস্তুপিণ্ড ঋজুরেখায় সমরূপ বেগে চলমান থাকে। বস্তুপিণ্ড এভাবে না চললে তাদের গতির পরিবর্তনের কারণ আরোপ করা হয় একটি 'বলের' (force) উপর। কিছু কিছু বল আমাদের কল্পনায় বোধগম্য মনে হয় : দড়ি কিংবা তারের প্রয়োগ করা বল, একাধিক বস্তুপিণ্ডের সংঘর্ষ কিংবা যে কোনো রকম স্বতঃপ্রতীয়মান ঠেলা (push) অথবা টানা (pull)। পূর্বতন একটি অধ্যায়ে বলা হয়েছে আমাদের এই সমস্ত পদ্ধতির আপাতদৃষ্ট কাল্পনিক উপলব্ধি দোষদুষ্ট (fallacious-হেত্বাভাসমূলক)। আসলে এর একমাত্র অর্থ : গাণিতিক হিসাব ছাড়াই কি হতে যাচ্ছে সেটা অতীত অভিজ্ঞতার সাহায্যে আগে থেকেই আমরা কম বেশী আঁচ করতে পারি। কিন্তু মহাকর্ষের সঙ্গে জড়িত 'বল' কিংবা স্বল্প পরিচিত বৈদ্যুতিক ক্রিয়া আমাদের কল্পনার কাছে এরকম স্বাভাবিক মনে হয় না। পৃথিবীটা শূন্যে ভাসতে পারে এটা এক অদ্ভূত ব্যাপার, স্বাভাবিক অনুমান হওয়া উচিৎ পৃথিবীটা নিশ্চয়ই পড়ে যাবে। সেইজন্য প্রাচীনকালে যাঁরা দূর-কল্পনা করেছেন তাঁদের মতে পৃথিবীকে রাখতে হয়েছে একটা হাতীর উপর, হাতীটাকে রাখতে হয়েছে একটা কচ্ছপের উপর। সুদূরে ক্রিয়া (action at a distance) ছাড়াও নিউটনীয় তত্ত্ব দুটি কল্পনা শক্তিপূর্ণ নূতনত্ব উপস্থাপন করেছিল। প্রথম, মহাকর্ষ সবসময় মূলত নিম্নমুখী অর্থাৎ পৃথিবীর কেন্দ্রমুখী নয়। দ্বিতীয় : "সমরূপে চলমান" এই শব্দ-সমষ্টি কোনো বলাধীন নয় এরকম বস্তুপিণ্ডের গতি সম্পর্কে যে অর্থে প্রয়োগ করা হয় সে অর্থে সমরূপ বেগে বারম্বার বৃত্তাকারে চলমান একটি বস্তুপিণ্ড সমরূপে চলমান নয়। বস্তুপিণ্ডটি ঋজুরেখা থেকে অবিরত বৃত্তের কেন্দ্রমুখে বিচ্যুত হচ্ছে। এইজন্য প্রয়োজন সেই অভিমুখে আকর্ষণকারী একটি বল। সুতরাং নিউটন এই সিদ্ধান্তে এলেন যে গ্রহগুলি একটি বলের দ্বারা সূর্যের দিকে আকর্ষিত হচ্ছে। এই বলের নাম মহাকর্ষ।

আমরা দেখেছি—অপেক্ষবাদ এই দৃষ্টিভঙ্গির সম্পূর্ণটাই বাতিল করেছে।

প্রাচীন জ্যামিতিক অর্থে ঋজু রেখার অস্তিত্ব আর নেই। রয়েছে "সর্বাপেক্ষা ঋজুরেখা" কিংবা ধরাকৃতি (geodesic)। কিন্তু এগুলির সঙ্গে স্থান এবং কাল দুটোই জড়িত। ধূমকেতু সৌরতন্ত্রে যে রকম কক্ষ রচনা করে সৌরতন্ত্রের ভিতর দিয়ে চলমান একটি আলোকরশ্মি জ্যামিতিক অর্থে সেই রকম কক্ষ রচনা করে না। ও দুটোই কিন্তু চলে ধরাকৃতিতে। ঐ কল্পনের মানসচিত্র সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হয়েছে। একজন কবি বলতে পারেন, জল নিম্নমুখী তার কারণ জলের আকর্ষণ সমুদ্রের দিকে। কিন্তু একজন পদার্থ বিজ্ঞানী কিংবা একজন নশ্বর মানুষ বলবে প্রতিটি বিন্দুতেই জল যেমন যাওয়ার তেমনি যায়। এর কারণ ঐ বিন্দুতে জমির চরিত্র। সামনে কি আছে জল তা গ্রাহ্য করে না। ঠিক যেমন জলের সমুদ্রের অভিমুখে আসার কারণ সমুদ্র নয় তেমনি গ্রহগুলির সূর্যকে চক্রাকারে প্রদক্ষিণ করার কারণও সূর্য নয়। গ্রহগুলি সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে তার কারণ সেটাই সহজতম কাজ। প্রায়োগিক অর্থে (technical sense) এটাই 'সর্বনিম্ন ক্রিয়া" (least action)। যে অঞ্চলে তাদের অবস্থান সে অঞ্চলের চরিত্রের জন্য এটাই সহজতম কাজ। সূর্য থেকে নির্গত কোনো প্রভাব এর কারণ নয়।

মহাকর্ষের কারণ সূর্যের প্রতি গ্রহগুলিকে আকর্ষণকারী একটি 'বল' এ অনুমানের প্রয়োজনের উদ্ভব যে কোনো মূল্যে ইউক্লিডীয় জ্যামিতিকে রক্ষা করার দৃঢ়সঙ্কল্প থেকে। আমাদের স্থান আসলে ইউক্লিডীয় নয়, তা সত্ত্বেও যদি আমরা অনুমান করি আমাদের স্থান ইউক্লিডীয় তাহলে জ্যামিতির ভুল সংশোধনের জন্য আমাদের পদার্থবিদ্যাকে ডাকতে হবে। আমরা দেখতে পাই বস্তুপিণ্ডগুলি যে রেখায় চলে সে গুলি ঋজুরেখা নয় অথচ আমরা সেগুলিকে ঋজুরেখা ভাবার জন্য জিদ করি তখন আমরা এই আচরণের একটি কারণ দাবি করি। এডিংটন এ ব্যাপারটা প্রশংসা করার মত স্পষ্টভাবে বলেছেন। পরবর্তী ব্যাখ্যার ভিত্তি তাঁরই দেওয়া একটা ব্যাখ্যা। ধরুন আপনি বিশিষ্ট অপেক্ষবাদে ব্যবহৃত অন্তর (interval) সম্পর্কীয় সঙ্কেত গ্রহণ করেছেন। আপনার স্থান ইউক্লিডীয় —এই নীরব স্বীকৃতি সে সঙ্কেতে রয়েছে। পরীক্ষামূলক পদ্ধতিতে অন্তরগুলিকে তুলনা সম্ভব। আপনি অচিরে আবিষ্কার করবেন আপনার সঙ্কেতের সঙ্গে পরীক্ষা ফলের সঙ্গতি রক্ষা করা যায় না। তখন আপনি নিজের

ভুল বুঝতে পারবেন। এ সত্ত্বেও যদি আপনি ইউক্লিডীয় সঙ্কেতের সঙ্গে যুক্ত থাকবার জন্য জিদ ধরেন তাহলে সঙ্কেত এবং পর্যবেক্ষণের ভিতরে অসঙ্গতির দায় এমন কোনো প্রভাবের উপর আপনার আরোপ করতে হবে যার অস্তিত্ব বর্তমান এবং যে প্রভাব পরীক্ষার্থ পিণ্ডগুলির (test bodies) আচরণ প্রভাবিত করে। আপনি বাড়তি আর একটি নিমিত্ত উপস্থিত করবেন এবং তার উপর আপনার ভুলের ফলের দায়িত্ব আরোপ করবেন। বলের নিউটনীয় সংজ্ঞা অনুসারে ঋজুরেখায় সমরূপ গতিতে যে নিমিত্ত (agency) বিচ্যুতি সৃষ্টি করে তার নাম 'বল'। সুতরাং অন্তর সম্পর্কীয় ইউক্লিডীয় সঙ্কেতের সপক্ষে আপনার জিদের জন্য যে নিমিত্তকে আপনি ডেকে এনেছেন তাকে বলা হয় 'বলের ক্ষেত্র' (field of force)।

'বল' সম্পর্কীয় প্রাচীন ধারণা পরিত্যাগ করে মানুষ যদি নূতন ধারায় বিশ্বকে উপলব্ধি করতে শেখে তাহলে শুধু তার ভৌত কল্পন পরিবর্তিত হবে তাই নয় হয়ত পরিবর্তন হবে তাদের নীতি এবং রাজনীতিরও। শেষের অভিক্রিয়াটি বেশ অযৌক্তিক কিন্তু সে জন্য তার সম্ভাবনা কম নয়। সৌরতন্ত্র সাপেক্ষ নিউটনীয় তত্ত্ব অনুসারে সূর্যের আচরণ রাজার মত —গ্রহগুলি তার আজ্ঞা পালন করতে বাধ্য। নিউটনীয় বিশ্বের তুলনায় আইনস্টাইনের বিশ্বে ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য বেশী এবং শাসন কম (less govermnet)। সে বিশ্বে কর্মব্যস্ততাও কম ; আমরা দেখেছি আইনস্টাই-নের মহাবিশ্বে মূলগত বিধি আলস্য। সংবাদপত্রের ভাষায় "গতিময়" (dynamic) শব্দের অর্থ করা হয়েছে "সক্রিয় এবং শক্তিমান" (energetic & forceful) কিন্তু এর অর্থ যদি হত "গতিবিদ্যার নীতিগুলির দৃষ্টান্ত" তাহলে এ শব্দমালা প্রয়োগ করা উচিৎ ছিল এমন লোক সম্পর্কে যে মুখের ভিতরে ফল পড়ার আশায় গাছতলায় বসে থাকে। আমার আশা : ভবিষ্যতে সাংবাদিকরা যখন গতিশীল সক্রিয় ব্যক্তিত্বের (dynamic personality) কথা বলবেন তখন বোঝাতে চাইবেন এমন ব্যক্তিকে যিনি সেই মুহূর্তে সব চাইতে কম কাজ করেন এবং ভবিষ্যতে কি হবে তা ভাবেন না। এই ফলপ্রাপ্তিতে যদি আমি সাহায্য করতে পারি তাহলে বুঝব আমার লেখা ব্যর্থ হয় নি।

মনে হয় 'বলের' অবলুপ্তির সঙ্গে সংযুক্ত রয়েছে ভৌতকল্পনের উৎস

রূপে স্পর্শের স্থলে দৃষ্টিকে প্রতিস্থাপন করা। প্রথম অধ্যায়ে এর ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। আয়নাতে যখন একটি প্রতিবিম্বকে নড়তে দেখি তখন সেটাকে কেউ ঠেলেছে বলে আমরা ভাবি না। মুখোমুখি দুটো বড় আয়না থাকলে আপনি হয়ত একই বস্তুর অসংখ্য প্রতিবিম্ব দেখতে পাবেন। আয়না দুটোর মাঝখানে কেউ যদি টুপী মাথায় দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে তাহলে আপনি প্রতিবিম্বে কুড়ি ত্রিশটি টুপী দেখতে পাবেন। কেউ যদি এসে ডান্ডা মেরে টুপীটাকে ফেলে দেয় তাহলে একই মুহূর্তে ঐ কুড়ি ত্রিশটি টুপি দেখতে পারেন। কেউ যদি এসে ডান্ডা মেরে টুপীটাকে ফেলে দেয় তাহলে একই মুহূর্তে ঐ কুড়ি ত্রিশটা টুপী নীচে পড়বে। আমরা ভাবি আসল টুপীটা ফেলে দিতে একটা বল প্রয়োজন কিন্তু ভাবি বাকি কুড়ি ত্রিশটা টুপী নিজে নিজে পড়ে যায় কিংবা হয়ত পড়ে যায় শুধুমাত্র নকল করার একটা আবেগের দরুন। ব্যাপারটা একটু বেশী গুরুত্বের সঙ্গে ভাবা যাক।

আয়নায় যখন ছায়া নড়ে তখন কিছু একটা ঘটে এ তথ্য স্বতঃ-প্রতীয়মান। দৃষ্টির দিক থেকে ব্যাপারটা এত বাস্তব মনে হয় যেন ঘটনাটা আয়নায় ঘটেইনি। কিন্তু স্পর্শ কিংবা শ্রুতির দৃষ্টিভঙ্গি থেকে কিছুই ঘটেনি। আসল টুপিটা পড়ার সময় একটা শব্দ হয় কিন্তু কুড়ি ত্রিশটি প্রতিবিম্ব পড়ে নিঃশব্দে। টুপীটা আপনার পায়ে পড়লে আপনি অনুভব করেন কিন্তু আমরা বিশ্বাস করি আয়নায় যে কুড়ি ত্রিশজন লোক রয়েছে টুপীটা তাদের পায়ে পড়লেও তারা অনুভব করে না। জ্যোতির্বিজ্ঞানের জগৎ সম্পর্কেও কিন্তু এ তথ্য সমভাবে সত্য। কোনো শব্দ হয় না কারণ শূন্য স্থান দিয়ে শব্দ যেতে পারে না। আমরা যতদূর জানি জ্যোতির্বিজ্ঞানের ঘটনা কোনো "বোধ" সৃষ্টি করে না কারণ 'বোধ' করার মত কেউ সেখানে নেই। জ্যোতির্বিজ্ঞানের জগৎও তাহলে আয়নার জগতের চাইতে এমন কিছু 'বাস্তব' কিংবা 'ঘন' (solid) নয় এবং সে জগৎকে চালনার জন্য বলের প্রয়োজনও একইরকম অল্প।

পাঠক মনে করতে পারেন আমি অলস কুতর্ক করছি। তিনি বলতে পারেন "আয়নার ছায়া একটি কঠিন বস্তুর প্রতিবিম্ব। আয়নার টুপীটা পড়ার কারণ আসল টুপীটার উপর প্রয়োগ করা বল। আয়নার টুপী

নিজের খুশীমত আচরণ করতে পারে না, ওর নকল করতে হবে আসল টুপীটাকে। এতেই বোঝা যায় আয়নার প্রতিবিম্বের সঙ্গে সূর্য আর গ্রহের কতটা পার্থক্য। চিরকাল তারা একটি আদিরূপকে (prototype) নকল করতে বাধ্য নয়। সুতরাং একটি প্রতিবিম্ব এবং অন্তরীক্ষের একটি বস্তু-পিণ্ড (heavenly bodies) একই রকম বাস্তব এ ভড়ং আপনি ছাড়ুন।"

এতে খানিকটা সত্য নিশ্চয়ই আছে। বিচার্য বিষয় হল : ঠিক কি সত্য? প্রথমত প্রতিবিম্ব 'কাল্পনিক' নয়। আপনি প্রতিবিম্ব দেখবার সময় নিঃসন্দেহে কিছু বাস্তব আলোকতরঙ্গ আপনার চোখে পোঁছোয়। আয়নার উপর একটা কাপড় ঝুলিয়ে দিলে এই আলোক তরঙ্গগুলির আর অস্তিত্ব থাকে না। প্রতিবিম্ব এবং বাস্তবের ভিতরে একটা শুদ্ধ আলোকীয় পার্থক্য কিন্তু রয়েছে। আলোকীয় পার্থক্য জড়িত এই অনুকরণের প্রশ্নের সঙ্গে। আয়নায় যখন আপনি কাপড় ঝোলান তখন 'বাস্তব' পদার্থটিতে কোনো পরিবর্তন হয় না কিন্তু বাস্তব পদার্থটি সরিয়ে নিলে প্রতিবিম্বটিও মিলিয়ে যায়। এর ফলে আমরা বলতে পারি : যে আলোকতরঙ্গগুলি প্রতিবিম্ব গঠন করে, সেগুলি আয়নার উপরিতল থেকে প্রতিফলিত এবং সেগুলি আসলে পশ্চাতের কোনো বিন্দু থেকে আসে না ; আসে 'বাস্তব' পদার্থটি থেকে। এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি সাধারণ নীতির উদাহরণ। বিশ্বের অধিকাংশ ঘটনাই কোনো বিচ্ছিন্ন ব্যাপার নয়। তারা অনেকগুলি সমরূপ ঘটনাগোষ্ঠীর সদস্য। সেগুলি এমন যে প্রতিটি গোষ্ঠীই আরোপযোগ্যরূপে বিশেষ একটি ক্ষুদ্র স্থান -কাল অঞ্চলের সঙ্গে জড়িত। ঐ আলোকতরঙ্গ গুলির ক্ষেত্রেও ব্যাপারটা এই। এই আলোক তরঙ্গের জন্যই আমরা বস্তু এবং আয়নায় তার প্রতিবিম্ব দেখতে পাই। কিন্তু তাদের প্রত্যেকেরই উৎসকেন্দ্র ঐ বস্তুটি। আপনি যদি ঐ বস্তুটিকে ঘিরে একটি বিশেষ দূরত্বে একটি অস্বচ্ছ (opaque) গোলোক রাখেন তাহলে গোলোকের বাইরে কোনো বিন্দুথেকেই আর ঐ বস্তুটি দৃশ্য হয় না। আমরা দেখেছি মহাকর্ষকে যদিও এখন আর দূরে সংঘটিত ক্রিয়ারূপে বিচার করা হয় না তবুও মহাকর্ষ একটি কেন্দ্রের সঙ্গে যুক্ত। এই কেন্দ্রের শিখরের চারপাশে যেন প্রতিসমরূপে (symmetreically) সজ্জিত একটি পাহাড় রয়েছে। আলোচ্য মহাকর্ষীয় ক্ষেত্রের সঙ্গে সংযুক্ত যে সম্ভাব্য বস্তুপিণ্ড আমরা কল্পনা করি

তার অবস্থান ঐ শিখরে। সারল্যের জন্য, সাধারণ বুদ্ধিতে ঐ অর্থে এক গোষ্ঠীর সমস্ত ঘটনাই একত্রে পিন্ডীকৃত হয় (lump together)। দুজন লোক যখন একই বস্তু দেখে, তখন দুটি ভিন্ন ভিন্ন ঘটনা ঘটে কিন্তু তারা একই গোষ্ঠীর ঘটনা এবং একই কেন্দ্রের সঙ্গে সংযুক্ত। দুটি লোক (আমরা যে রকম বলি) যখন একই গোলমাল শোনে তখনও একই কথা প্রযোজ্য। সুতরাং এমন কি আলোকীয় দৃষ্টিভঙ্গি থেকেও প্রতিবিম্বিত বস্তুটির তুলনায় প্রতিবিম্বটির বাস্তবতা স্বল্পতর। তার কারণ প্রতিবিম্বটি যেখানে রয়েছে বলে মনে হয় সেখান থেকে সমস্ত দিকে আলোক বিস্তৃত হয় না। বিস্তৃত হয় শুধুমাত্র দর্পণের সম্মুখে এবং যতক্ষণ পর্যন্ত প্রতিবিম্বিত বস্তুটি স্বস্থানে থাকে প্রতিবিম্বিত হয় শুধুমাত্র ততক্ষণ পর্যন্ত। এতক্ষণ আমরা যে রকম বলছিলাম, সেইভাবে একটি কেন্দ্রের চারপাশে সংযুক্ত ঘটনাগুলিকে গোষ্ঠীভুক্ত করার সুবিধার এটা একটা উদাহরণ।

ঐরকম এক গোষ্ঠী বস্তুর ভিতরে পরিবর্তন পরীক্ষা করলে আমরা দেখতে পাই পরিবর্তন দু'রকম: কতগুলি পরিবর্তন ঐ গোষ্ঠীর কয়েকটি মাত্র সদস্যকে প্রভাবিত করে আর কতগুলি পরিবর্তন আসে সংযুক্তভাবে গোষ্ঠীর সমস্ত সদস্যের ভিতরে। একটি আয়নার সামনে একটি মোমবাতি রেখে যদি আপনি আয়নার উপর একটি কালো কাপড় ঝুলিয়ে দেন তাহলে আপনি শুধু মোমবাতির নানা জায়গা থেকে দৃশ্যমান প্রতিফলনের পরিবর্তন করবেন। আপনি যদি চোখ বন্ধ করেন তাহলে নিজ সাপেক্ষ এর দৃষ্টিগোচরতার পরিবর্তন করছেন কিন্তু অন্য কোনো স্থান সাপেক্ষ মোমবাতির দৃষ্টিগোচরতার কোনো পরিবর্তন করছেন না। আপনি যদি এক ফুট দূরত্বে একে বেষ্টন করে একটি লাল গোলক স্থাপন করেন তাহলে এক ফুটের বেশী দূরত্বে যে কোনো জায়গাতে এর রূপের পরিবর্তন করবেন কিন্তু এক ফুটের কম দূরত্বে কোনো পরিবর্তন করবেন না। এই সমস্ত ক্ষেত্রে মোমবাতির স্বতঃত কোনো পরিবর্তন হয়েছে বলে আপনি মনে করেন না, আসলে আপনি প্রতিটি ক্ষেত্রেই দেখতে পান একটি ভিন্ন কেন্দ্র কিংবা একাধিক ভিন্ন ভিন্ন কেন্দ্রের সঙ্গে সংযুক্ত কতগুলি পরিবর্তনের গোষ্ঠী রয়েছে। দৃষ্টান্ত: আপনি যখন চোখ বন্ধ করেন তখন অন্য পর্যবেক্ষকের দৃষ্টিতে আপনার চোখই অন্যরকম দেখায়, মোমবাতিটি নয়। যে পরিবর্তনগুলি ঘটছে তার কেন্দ্র রয়েছে আপনার

চোখে। কিন্তু মোমবাতিটা আপনি নিভিয়ে দিলে তার চেহারার পরিবর্তন হয় সর্বত্র। এক্ষেত্রে আপনি বলেন পরিবর্তনটা হয়েছে মোমবাতিতে। একটি বস্তুকে কেন্দ্র করে যে ঘটনাগোষ্ঠী থাকে তার সবগুলিকে যে পরিবর্তন প্রভাবিত করে সেটাই ঐ বস্তুতে সংঘটিত পরিবর্তন। এ সমস্তই সাধারণ বুদ্ধির ব্যাখ্যা এবং আয়নার ভিতরকার মোমবাতির প্রতিবিম্ব মোমবাতিটার চাইতে কম বাস্তব এ কথা বলার অর্থ ব্যাখ্যা করার প্রচেষ্টা। ঐ জায়গার চতুর্দিকে সংশ্লিষ্ট এমন কোনো ঘটনাগোষ্ঠী নেই যেখানে ঐ প্রতিবিম্ব আছে বলে মনে হয়। প্রতিবিম্বের পরিবর্তনগুলির কেন্দ্র আসলে মোমবাতি, আয়নার পিছনের কোনো বিন্দু সে কেন্দ্র নয়। এ থেকে, "প্রতিবিম্বটি প্রতিফলন মাত্র" এই বিবৃতির নিখুঁত প্রমাণযোগ্য অর্থ পাওয়া যায়। অন্তরীক্ষের বস্তুপিণ্ডগুলি যদিও আমরা স্পর্শ করতে পারি না, শুধুমাত্র দেখতে পারি তবুও একই সঙ্গে আমরা সেগুলিকে আয়নায় দেখা প্রতিবিম্বের চাইতে বেশী বাস্তব মনে করার সামর্থ্য লাভ করি।

এখন আমরা একটি বস্তুপিণ্ডের উপর অন্য একটি বস্তুপিণ্ডের ক্রিয়া সম্পর্কে সাধারণ বুদ্ধিজাত ধারণার ব্যাখ্যা শুরু করতে পারি। বলের অবলুপ্তি কথার অর্থ যদি আমরা সত্যিই বুঝতে চাই তাহলে এ ব্যাখ্যা আমাদের অবশ্য প্রয়োজন। ধরুন আপনি একটি অন্ধকার ঘরে প্রবেশ করে ইলেকট্রিক আলোর সুইচ টিপেছেন : ঘরের সব জিনিষপত্রের চেহারা বদলে গিয়েছে। ঘরের প্রতিটি জিনিষ দেখা যাচ্ছে—তার কারণ সেগুলি থেকে বিদ্যুতের আলো প্রতিফলিত হচ্ছে। এ ব্যাপারটার সঙ্গে আয়নার প্রতিবিম্বের বাস্তব সাদৃশ্য রয়েছে। উদ্ভূত সমস্ত পরিবর্তনের কেন্দ্র বিদ্যুতের আলো। এ ক্ষেত্রে আমরা আগে যা বলেছি তাই দিয়েই 'ক্রিয়া' ব্যাখ্যা করা যায়। ক্রিয়া একটি গতি হলে ব্যাপারটা আরও গুরুত্বপূর্ণ। ধরুন ব্যাঙ্কের ছুটির দিনের ভীড়ের মাঝে আপনি একটা বাঘ ছেড়ে দিয়েছেন। ভীড়ের সবাই ছোটাছুটি করবে। আর তাদের নানারকম গতির কেন্দ্র হবে ঐ বাঘটা। কেউ যদি লোকজন দেখতে পায়, কিন্তু বাঘটা দেখতে না পায় তাহলে সে ভাববে ওখানে বিকর্ষণ করার মত কিছু রয়েছে। এখানে আমরা বলি বাঘটার লোকগুলির উপর একটা ক্রিয়া আছে আর লোকগুলির উপর বাঘের ক্রিয়াকে আমরা বলতে পারি বিকর্ষণকারী চরিত্রের ক্রিয়া। আমরা কিন্তু জানি, লোকগুলি পালাচ্ছে তার কারণ তাদের প্রতি কিছু

একটা ঘটছে, শুধু বাঘ পড়েছে বলে তারা পালাচ্ছে তা নয়। তারা পালায় তার কারণ তারা বাঘটাকে দেখতে পায় এবং বাঘের আওয়াজ শুনতে পায়। এর কারণ কতগুলি তরঙ্গ তাদের চোখে আর কানে পেঁছানো। বাঘ না থাকলেও যদি ঐ তরঙ্গগুলিকে তাদের কাছে পেঁছানো যেত তাহলেও তারা একই রকম বেগে পালাতো। তার কারণ পরিবেশ তাদের কাছে একই রকম অসন্তোষজনক মনে হতো।

এবার একই বিবেচনা প্রয়োগ করা যাক সূর্যের মহাকর্ষের ব্যাপারে। সূর্য যে বল প্রয়োগ করে তার সঙ্গে বাঘের প্রযুক্ত বলের পার্থক্য শুধু-মাত্র এই যে বাঘের বল বিকর্ষণ করে আর সূর্যের বল আকর্ষণ করে। সূর্য আলোকতরঙ্গ কিংবা শব্দ তরঙ্গের মাধ্যমে কাজ করে না। সূর্যকে বেষ্টন করে যে স্থান-কাল, তার পরিবর্তনগুলির জন্যই সূর্য তার আপাত-দৃষ্ট ক্ষমতা লাভ করে। বাঘের গর্জনের মতই সেগুলি উৎসের কাছে বেশী তীব্র। আমরা যত দূরে যাই এগুলিও তত কমতে থাকে। স্থান-কালের এই সমস্ত পরিবর্তনের কারণ সূর্য একথা বললে আমাদের কিছু জ্ঞানবৃদ্ধি হয় না। আমরা জানি এই পরিবর্তনগুলি একটা নিয়ম মেনে চলে এবং তারা প্রতিসমরূপে (symmetrically) সূর্যকে কেন্দ্র করে সর্বদিকে গোষ্ঠীভুক্ত (grouped)। কার্যকারণের বাগ্‌বিধি শুধুমাত্র কিছু অবান্তর কল্পনা যোগ করে—ইচ্ছা, মাংসপেশীর টান এই জাতীয় তত্ত্বের সঙ্গে এগুলি যুক্ত। মহাকর্ষ সৃষ্টিকারী পদার্থের উপস্থিতিতে যে সঙ্কেত অনুসারে স্থান-কালের পরিবর্তন হয় সেই সঙ্কেত নির্ণয় করার সামর্থ্য আমাদের মোটামুটি রয়েছে। আরও নির্ভুলভাবে বলা যায় : আমরা নির্ণয় করতে পারি মহাকর্ষ সৃষ্টিকারী পদার্থের উপস্থিতি কি রকম স্থান-কাল। যখন বিশেষ একটি অঞ্চলে স্থান-কাল নির্ভুল ইউক্লিডীয় নয় বরং তার একটি অনিউক্লিডীয় চরিত্র রয়েছে এবং একটি বিশেষ কেন্দ্রের যত নিকটতর হওয়া যায় তত সেই অনিউক্লিডীয় চরিত্র বৃদ্ধি পায় এবং যখন ইউক্লিড থেকে বিচ্যুতি একটি বিশেষ বিধি পালন করে তখন এই অবস্থার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিতে হলে আমরা বলি : কেন্দ্রে মহাকর্ষ সৃষ্টিকারী পদার্থ রয়েছে। কিন্তু এটা শুধু আমরা যা জানি তার একটি সংক্ষিপ্তসার। মহাকর্ষ সৃষ্টিকারী পদার্থ যে সমস্ত জায়গায় নেই সেই সমস্ত জায়গা সম্পর্কে আমরা জানি। যে সমস্ত জায়গায় রয়েছে সে সমস্ত জায়গা সম্পর্কে জানি

না। কার্যকারণের বাগ্‌বিধি ('বল' সে বাগ্‌বিধির একটি বিশেষ ক্ষেত্র মাত্র) বিশেষ বিশেষ উদ্দেশ্যের জন্য ব্যবহৃত সুবিধাজনক সংক্ষিপ্ত দ্রুতলিখন-পদ্ধতি (short hand) মাত্র। ভৌত বিশ্বে সত্যই যা পাওয়া যায় তার কোনো প্রতিরূপ এ বাগ্‌বিধি নয়।

আর, পদার্থটা কি ব্যাপার? পদার্থও কি সুবিধাজনক দ্রুতলিখন পদ্ধতি ছাড়া আর কিছু নয়? এ প্রশ্নটা খুব বড়। তার জন্য প্রয়োজন একটি স্বতন্ত্র অধ্যায়।

চতুর্দশ অধ্যায়

পদার্থ কি ?

"পদার্থ কি ?" এ জাতীয় প্রশ্ন সাধারণত অধিবিদ্যাবিদরাই (meta-physicians) করে থাকেন। এর উত্তর থাকে অবিশ্বাস্য রকম দুর্বোধ্য বিরাট বিরাট গ্রন্থে। আমি কিন্তু এ প্রশ্ন অধিবিদ্যাবিদ হিসাবে করছি না। যে খুঁজে বার করতে চায় আধুনিক পদার্থবিদ্যার নীতিবাক্য কি এবং বিশেষ করে জানতে চায় অপেক্ষবাদের নীতিবাক্য কি ; এ প্রশ্ন আমি জিজ্ঞাসা করছি তার পক্ষ থেকে। পদার্থ সম্পর্কে আগে যে কল্পন ছিল ঠিক সে কল্পন এখন আর গ্রহণযোগ্য নয়। অপেক্ষবাদ আমরা যতটুকু জেনেছি তা থেকে এ তথ্য স্বতঃপ্রতীয়মান। আমার মনে হয় নূতন কল্পনকে কি হতেই হবে সে সম্পর্কে আমরা এখন কিছু কিছু বলতে পারি।

পদার্থ সম্পর্কে প্রাচীন ঐতিহ্যগত দুটি কল্পন ছিল : যখন থেকে বৈজ্ঞানিক দূরকল্পন শুরু হয়েছে তখন থেকেই এই দুটি মতের সমর্থক রয়েছে। একদল ছিলেন পরমাণুবাদী। তাঁরা ভাবতেন পদার্থ এমন কতকগুলি ক্ষুদ্র পিণ্ড দিয়ে গঠিত যেগুলি আর ভাগ করা সম্ভব নয়। অনুমান করা হোত, এগুলি নানাভাবে পরস্পরকে আঘাত কোরে নানাদিকে ছিটকে যায়। নিউটনের পর থেকে, তারা পরস্পরের সত্যিকারের সংস্পর্শে আসে একথা আর ভাবা হোত না। ভাবা হোত তারা পরস্পরকে আকর্ষণ এবং বিকর্ষণ করে এবং তারা পরস্পরকে বেষ্টন করে কক্ষপথে চলমান। আর এক দল ছিলেন—তাঁরা ভাবতেন কোনো না কোনো প্রকারের পদার্থ সর্বত্রই আছে এবং সত্যকার শূন্যস্থান অসম্ভব। দেকার্তেরও এই মত ছিল। তিনি ভাবতেন গ্রহগুলির গতির কারণ ইথারের ভিতরকার ঘূর্ণি। মহাকর্ষ সম্পর্কে নিউটনীয় তত্ত্ব আবিষ্কারের পর, পদার্থের অস্তিত্ব সর্বত্র রয়েছে এই মতবাদে বিশ্বাস কমে যায়। আরও কমে এইজন্য যে নিউটন এবং তাঁর উত্তরাধিকারীরা ভাবতেন আলোকের কারণ উৎস থেকে বাস্তব কণার গতি। কিন্তু এই মত যখন অপ্রমাণিত হল এবং দেখা গেল আলোক তরঙ্গ দিয়ে গঠিত, তখন ঢেউ খেলবার জন্য একটা কিছু প্রয়োজন এই কারণে ইথারকে আবার বাঁচিয়ে তোলা হল। যখন দেখা গেল বিদ্যুৎচুম্বকীয় পরিঘটনাতেও ইথার একই ভূমিকা পালন করে তখন ইথারের ইজ্জত আরো বাড়ল। এমন কি এ আশাও

করা গিয়েছিল যে হয়ত দেখা যাবে পরমাণু আসলে ইথারের এক রকম গতি। পদার্থ সম্পর্কীয় পারমাণবিক দৃষ্টিভঙ্গির অবস্থা এই সময়ে সবচাইতে কাহিল হয়ে পড়ে।

অপেক্ষবাদের কথা আপাতত বন্ধ থাক। আধুনিক পদার্থবিদ্যা সাধারণ পদার্থের আণবিক গঠন প্রমাণ করেছে। অথচ ইথারের স্বপক্ষে যুক্তিগুলি অপ্রমাণ করেনি। ইথারের কিন্তু ঐরকম কোনো গঠন আছে বলে মনে করা হয় না। এর ফল ছিল দুটি দৃষ্টিভঙ্গির ভিতরে এক ধরণের আপোষ। একটি ভঙ্গি ছিল স্থূল পদার্থের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য অন্যটি প্রাযোজ্য ছিল ইথারের ক্ষেত্রে। ইলেক্ট্রন এবং প্রোটন সম্পর্কে কোনো সন্দেহ থাকতে পারে না। আমরা কিন্তু অচিরে দেখতে পাব পরমাণু সম্পর্কে য়ে প্রথাগত কল্পন (conceived traditionally) ইলেক্ট্রন প্রোটনকে সেভাবে কল্পনা করার কোনো প্রয়োজন নেই। আমার মনে হয় অপেক্ষবাদের দাবী আসলে পদার্থ সম্পর্কীয় প্রাচীন কল্পন পরিত্যাগ করা। বস্তুর (substance) সঙ্গে জড়িত অধিবিদ্যা দ্বারা এ কল্পন সংক্রমিত। তাছাড়া এটা এমন একটা মতের প্রতিনিধি যে মতের পরিঘটনা বিচারে কোনো প্রয়োজন নেই। এটাই এবার আমরা অনুসন্ধান করব।

প্রাচীন মত অনুসারে, এক টুকরো পদার্থ ছিল চিরস্থায়ী এবং একই কালে তার অবস্থান একাধিক জায়গায় হতে পারত না। এ ধরণের দৃষ্টি ভঙ্গি যে আগেকার লোকের বিশ্বাসের সঙ্গে জড়িত, এ তথ্য স্বতঃপ্রতীয়মান, তাঁরা বিশ্বাস করতেন স্থান ও কাল সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন। স্থান এবং কালের স্থলে স্থান-কাল প্রতিস্থাপন করলে আমরা স্বাভাবিক ভাবেই আশা করব ভৌত জগৎকে যে সমস্ত উপাদান থেকে আহরণ করা হবে সেগুলি স্থানেও যেমন সীমিত, কালেও তেমনি সীমিত। এই উপাদানগুলিরই আমরা নাম দিয়েছি 'ঘটনা' (events)। একটি ঘটনা ঐতিহ্যগত পদার্থের টুকরোর মত স্থায়ী কিংবা চলমান হয় না। ঘটনার অস্তিত্ব শুধুমাত্র তার ক্ষুদ্র মুহূর্তের জন্য। তার পরই তার সমাপ্তি। সুতরাং একটি পদার্থের টুকরো পরিণত হবে একটি ঘটনামালায়। ঠিক যেমন প্রাচীন দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে বিস্তৃত একটি বস্তুপিন্ড বহু বস্তু কণা দিয়ে গঠিত ছিল এখন তেমনি মনে করতে হবে প্রতিটি বস্তুকণা একাধিক 'ঘটনা-বস্তুকণা' দিয়ে গঠিত। তার কারণ বস্তুকণা কালে প্রসারিত। বস্তুকণার ইতিহাস

সম্পূর্ণ এই ঘটনা মালা দিয়ে গঠিত। বস্তুকণাকে আমরা এর ঐতিহাসিক সত্তা রূপ (being) মনে করি। আমরা মনে করি না যে বস্তুকণা একটি অধিবিদ্যাক সত্তা (metaphysical entity) যার উপর ঘটনাগুলি ঘটছে। এই দৃষ্টিভঙ্গির প্রয়োজন হয়েছে তার কারণ অপেক্ষবাদ আমাদের বাধ্য করেছে স্থান ও কালকে প্রাচীন পদার্থবিদ্যার তুলনায় সমতর স্তরে (more on a level) স্থাপন করতে।

এই বিমূর্ত প্রয়োজনকে অবশ্যই ভৌতজগতের জানিত ঘটনাবলীর সঙ্গে সম্পর্কিত করতে হবে। জানিত ঘটনাগুলি কি? ধরে নেওয়া যাক আলোক তরঙ্গ দিয়ে গঠিত এবং গৃহীত বেগে চলে; এ তথ্য মেনে নেওয়া হয়েছে। আমরা তাহলে স্থান-কালের যে অংশগুলিতে কোনো পদার্থ নেই সেখানে কি ঘটছে সে সম্পর্কে অনেক কিছুই জানি। অর্থাৎ আমরা জানি সেখানে পর্যাবৃত্ত ঘটনা (periodic occurrences) রয়েছে (light waves—আলোকতরঙ্গ)। সে ঘটনাগুলি বিশেষ কয়েকটি বিধি মেনে চলে। এই আলোক তরঙ্গগুলির শুরু পরমাণু থেকে। কি পরিস্থিতিতে সেগুলি শুরু হয় এবং তাদের তরঙ্গদৈর্ঘ্য নির্দ্ধারিত হওয়ার কারণ কি এগুলি জানার সামর্থ্য আমরা পাই পরমাণুর গঠন সম্পর্কে আধুনিক তত্ত্ব থেকে। একটি আলোক তরঙ্গ কিভাবে ভ্রমণ করে শুধু সেটাই আমরা বার করতে পারি তাই না, আমরা সাপেক্ষ সেই আলোক তরঙ্গের উৎস কি করে চলমান বার করতে পারি সেটাও। কিন্তু একথা বলার সময় আমি অনুমান করছি—সামান্য পৃথক দুটি কালে একটি আলোকের উৎসকে অভিন্ন বলে আমরা চিনতে পারব। এটাই কিন্তু আসল জিনিষ—যে সম্পর্কে অনুসন্ধান করার প্রয়োজন ছিল।

আগের অধ্যায়ে আমরা দেখেছি, একটি বিধি অনুসারে (by a law) পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত স্থান-কালের একটি কেন্দ্রের সর্বদিকে বিন্যস্ত, একটি সংযুক্ত ঘটনাগোষ্ঠী কি করে গঠন করতে হয়। একটি ক্ষণস্থায়ী আলোর ঝলক থেকে নির্গত আলোক তরঙ্গের বিভিন্ন স্থানে পৌঁছানো হবে সেইরকম একটি ঘটনাগোষ্ঠী। কেন্দ্রে বিশেষ কিছু ঘটছে এরকম অনুমান করার কোনো প্রয়োজন আমাদের নেই। সেখানে কি ঘটছে সেটা আমরা জানি এ অনুমান করার কোনো প্রয়োজনই নেই। যা আমরা জানি তা হল: আলোচ্য ঘটনাগোষ্ঠী একটি কেন্দ্রের সর্বদিকে জ্যামিতির রীতিতে

বিন্যস্ত—মাছি একটা পুকুর ছুঁলে যেরকম প্রসারমান ঢেউ হয়—সেই রকম। কেন্দ্রে কি হয়ে থাকতে পারে সে সম্পর্কে অনুমানাত্মক একটি ঘটনা আবিষ্কার করতে পারি এবং পরবর্তী অস্থিরতা কি করে প্রেরিত হয় সে সম্পর্কে বিধিও গঠন করতে পারি। সাধারণ বুদ্ধিতে তখন মনে হবে এই অনুমানাত্মক ঘটনাই অস্থিরতার কারণ। যে বস্তুকণা ঐ অস্থিরতার কেন্দ্রের অধিকারী বলে অনুমান করা হয়েছিল সেই বস্তুকণার জীবনীর একটি ঘটনা বলেও ওটা গণিত হবে।

আমরা দেখছি একটি কেন্দ্র থেকে একটি বিশেষ বিধি অনুসারে শুধুমাত্র একটি আলোক তরঙ্গই বহির্মুখী গমন করে না বরং সাধারণত খুব ঘনিষ্ঠভাবে সমরূপ একাধিক আলোক তরঙ্গ তাকে অনুসরণ করে। উদাহরণ : ঝড়ের হাওয়ায় সামনে দিয়ে একটা মেঘ উড়ে গেলেও সূর্য সহসা তার রূপ পরিবর্তন করে না, পরিবর্তন দ্রুত হলেও ক্রমান্বয়িক। এইভাবে স্থান-কালের একটি বিন্দুতে অবস্থিত একটি কেন্দ্রের সঙ্গে সংযুক্ত একটি ঘটনা-গোষ্ঠীর স্থান-কালের নিকটস্থ বিন্দুকেন্দ্রিক অত্যন্ত সমরূপ অন্য ঘটনাগোষ্ঠীর সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপিত হয়। অন্য গোষ্ঠীগুলির প্রতিটির কেন্দ্র দখল করে রয়েছে সমরূপ অনুমানাত্মক ঘটনা : এ আবিষ্কার হয় সাধারণ বুদ্ধিতে। সাধারণ বুদ্ধি আরও বলে : এই সমস্ত অনুমানাত্মক ঘটনাবলী একই ইতিহাসের অংশ। অর্থাৎ সাধারণ বুদ্ধি একটি অনুমানাত্মক বস্তুকণা আবিষ্কার করে এবং ভাবে ঐ অনুমানাত্মক ঘটনাগুলি ঘটেছে ঐ বস্তুপিণ্ডে। অর্থাৎ পুরানো অর্থে যাকে পদার্থ বলা যায় তার কাছাকাছি কোথাও পৌঁছুতে গেলে সম্পূর্ণ অপ্রয়োজনীয় দুটি অনুমান (hypothesis) ব্যবহার করতে হয়।

অপ্রয়োজনীয় অনুমান এড়াতে হলে আমরা বলব : একটি নির্দিষ্ট মুহূর্তে পরমাণু হল—পরিবেষ্টনকারী মাধ্যমের নানা অস্থিরতা (disturbances)। সাধারণ ভাষায় হলে বলা হোত এই অস্থিরতার 'কারণ' ঐ পরমাণু। কিন্তু আমাদের ক্ষেত্রে যা আলোচ্য মুহূর্ত সেই সময়কার এই অস্থিরতাগুলি আমরা ধরব না তার কারণ তাহলে আমাদের পর্যবেক্ষকের উপর নির্ভর করতে হবে। তার পরিবর্তে আমরা আলোকের গতিতে পরমাণু থেকে বহির্মুখে গমন করব এবং প্রতিটি জায়গায় পৌঁছে যা যা অস্থিরতা দেখতে পাব সেগুলিই আমরা ধরব। যেগুলির অস্তিত্ব সামান্য

আগে কিংবা পরে পাওয়া যায় সেরকম প্রায় এককেন্দ্রিক ঘনিষ্ঠভাবে সমরূপ অস্থিরতার ঝাঁক (set of disturbances) সামান্য অগ্রবর্তী কিংবা পরবর্তী মুহূর্তের পরমাণুরূপে সংজ্ঞিত হবে। এইভাবে আমরা অপ্রয়োজনীয় প্রকল্প কিংবা অনুমিত সত্ত্বা (inferred entity) ছাড়াই পদার্থবিদ্যার সমস্ত বিধিকেই রক্ষা করি এবং মিতব্যয়ের যে নীতি অপেক্ষবাদকে অপ্রয়োজনীয় জঞ্জাল পরিষ্কার করার সামর্থ্য দান করেছে সেই মিতব্যয়িতার সঙ্গে আমরা সামঞ্জস্য রক্ষা করি।

সাধারণ বুদ্ধি কল্পনা করে : যখন সে একটা টেবিল দেখতে পায় তখন সে একটা টেবিলই দেখে। এটা একটা স্থূল (gross) বিভ্রম (delusion)। যখন কিছু আলোক তরঙ্গ তার চোখে পেঁছায় তখন সাধারণ বুদ্ধি একটা টেবিল দেখতে পায়। সেই আলোক তরঙ্গগুলি এমন যে অতীত অভিজ্ঞতায় সেগুলির সঙ্গে বিশেষ এক ধরনের স্পর্শবোধের সম্পর্ক ছিল। তাছাড়া ছিল অন্য লোকের সাক্ষ্য : তারাও টেবিলটা দেখেছিল। কিন্তু এর কোনোটিই কখনো আমাদের টেবিলের সত্ত্বার (table itself) কাছে নিয়ে যায়নি। আলোক তরঙ্গ আমাদের চোখে একাধিক ঘটনা ঘটিয়েছে। এ ঘটনাগুলি নেত্রক স্নায়ুতে (optic nerve) কয়েকটি ঘটনা ঘটিয়েছে। এই ঘটনাগুলি আবার কতকগুলি ঘটনা ঘটিয়েছে মস্তিষ্কে। প্রচলিত প্রাথমিক প্রক্রিয়া ছাড়া এর যে কোনো একটি ঘটলেই আমাদের ভিতরে "টেবিলটি দেখার" বোধ নিয়ে আসত। এমনকি কোনো টেবিল যদি না থাকত তাহলেও। (অবশ্য সাধারণভাবে বস্তুর ব্যাখ্যা যদি হয় কতগুলি ঘটনাগোষ্ঠী তাহলে চক্ষু, নেত্রক স্নায়ু এবং মস্তিষ্ক সম্পর্কেও এ ব্যাখ্যা প্রযোজ্য)। আমরা যখন আঙুল দিয়ে টেবিলে চাপ দিই তখন যে স্পর্শবোধ হয় সেটা আসলে আমাদের আঙুলের প্রান্তের ইলেকট্রন এবং প্রোটনের বৈদ্যুতিক অস্থিরতা। আধুনিক পদার্থবিদ্যা অনুসারে এর কারণ টেবিলের ইলেকট্রন আর প্রোটনের সান্নিধ্য। অন্য কোনো ভাবে যদি আমাদের আঙুলের প্রান্তে একই অস্থিরতা হোত তাহলে কোনো টেবিল না থাকলেও একই বোধ হোত। অপরের সাক্ষ্য স্পষ্টতঃ পরের কাছ থেকে শেখা। আদালতে কোনো সাক্ষীকে যদি জিজ্ঞাসা করা হয় যে সে একটা ঘটনা দেখেছে কিনা তাহলে এরকম উত্তর তাকে দিতে দেওয়া হবে না যে : সে নিজে দেখেছে বলেই তার মনে হয় তার কারণ ঐ দেখা বিষয়ে একাধিক অন্য লোকের সাক্ষ্য

রয়েছে। সে যাই হোক—কতকগুলি শব্দতরঙ্গ দিয়ে সাক্ষ্য গঠিত। তার মনস্তাত্ত্বিক এবং ভৌত ব্যাখ্যা প্রয়োজন। সুতরাং বস্তুর সঙ্গে এর সম্পর্ক খুবই পরোক্ষ। এইসব কারণের জন্য আমরা যখন বলি একটি লোক একটি টেবিল দেখছে তখন আমরা জটিল এবং কঠিন অনুমিতি (Inferrness) গোপন করে অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত একটি অভিব্যক্তি ব্যবহার করি। এ অনুমানগুলির সত্যতা প্রশ্নাতীত নয়।

কিন্তু আমাদের মনস্তাত্ত্বিক প্রশ্নে জড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা রয়েছে। সম্ভব হলে এগুলি আমাদের এড়িয়ে চলা উচিৎ। সুতরাং শুদ্ধ ভৌতদৃষ্টিভঙ্গিতে ফিরে আসা যাক।

যে ইঙ্গিত আমি করতে চাই সেটা নিম্নলিখিতরূপে বলা যায়। পরমাণুর অস্তিত্বের দরুণ অন্য স্থানে যা কিছু ঘটে অন্তত তত্ত্বের দিক দিয়ে সে সমস্তই পরীক্ষার সাহায্যে পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে অনুসন্ধান করা যায়—অবশ্য সেগুলি যদি বিশেষ গোপন কোনো পদ্ধতিতে না ঘটে। পরমাণুকে জানা যায় তার অভিক্রিয়ার সাহায্যে। কিন্তু 'অভিক্রিয়া' শব্দটি কার্যকারণ তত্ত্বের যে দৃষ্টিভঙ্গির অংশ তার সঙ্গে আধুনিক পদার্থবিদ্যার সঙ্গতি নেই, বিশেষ করে সঙ্গতি নেই অপেক্ষবাদের সঙ্গে। যা আমাদের বলার অধিকার আছে সেটা শুধুমাত্র এই : কিছু ঘটনাগোষ্ঠী একত্র ঘটে অর্থাৎ স্থান-কালের সন্নিকট অংশে ঘটে। একজন পর্যবেক্ষক একটি ঘটনাগোষ্ঠীর একটি অপর ঘটনার পূর্বে ঘটেছে ভাববেন কিন্তু অন্য পর্যবেক্ষক কাল-ক্রম ভিন্নভাবে বিচার করবেন। এমন কি যখন সমস্ত পর্যবেক্ষক সাপেক্ষই কালের ক্রম অভিন্ন তখনও আমরা শুধু বলতে পারি দুটি ঘটনার ভিতরে সম্পর্ক রয়েছে। সে সম্পর্ক অগ্রবর্তী এবং পশ্চাদবর্তী দুরকমই হতে পারে। অতীত ভবিষ্যৎকে নিয়ন্ত্রণ করে-একথা কোনো অর্থে ভবিষ্যৎ অতীতকে নিয়ন্ত্রণ করে এই কথার চাইতে পৃথক : এ তথ্য সত্য নয়। আপাতদৃষ্ট পার্থক্য শুধু আমাদের অজ্ঞতার জন্য। সে অজ্ঞতার কারণ অতীতের চাইতে ভবিষ্যতের জ্ঞান আমাদের অল্প। ব্যাপারটা কিন্তু নেহাৎই আকস্মিক : এমন জীবও থাকতে পারত যারা ভবিষ্যৎ মনে রাখতে পারে এবং অতীত যাদের অনুমান করতে হয়। এই সমস্ত ব্যাপারে ঐ জীবদের মনোভাব হোত আমাদের ঠিক বিপরীত—তা বলে সে মনোভাব ভ্রমাত্মক হোত না।

স্পষ্ট বোঝা যায়, পদার্থ কয়েকটি ঘটনা গোষ্ঠী ছাড়া অন্য কিছু এ অনুমান না করেও পদার্থবিদ্যার তথ্য এবং তত্ত্ব ব্যাখ্যা করা সম্ভব। প্রতিটি ঘটনাই এমন যে সেগুলির কারণ আলোচ্য পদার্থ—একথা আমাদের পক্ষে ভাবা স্বাভাবিক। এর জন্য পদার্থবিদ্যার কোনো প্রতীক (symbol) কিংবা সঙ্কেত (formula) পরিবর্তনের প্রয়োজন হয় না : প্রশ্নটা শুধুমাত্র প্রতীক ব্যাখ্যার।

ব্যাখ্যার এই স্বাধীনতা গাণিতিক পদার্থবিদ্যার বৈশিষ্ট্য। কতকগুলি অত্যন্ত বিমূর্ত যৌক্তিক সম্পর্ক আমরা জানি। সে সম্পর্ক আমরা প্রকাশ করি গাণিতিক সঙ্কেতের মাধ্যমে। আমরা জানি কয়েকটি ক্ষেত্রে এমন ফল পাওয়া যায়, বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার সাহায্যে যার সত্যাসত্য নির্ণয় সম্ভব। উদাহরণ : জ্যোতির্বিজ্ঞানের সেই সমস্ত পর্যবেক্ষণ যেগুলির সাহায্যে আলোকের আচরণ সম্পর্কে অপেক্ষবাদের সত্যতা প্রমাণিত হয়েছে। যে সমস্ত সঙ্কেতের সত্যাসত্য প্রমাণের প্রয়োজন ছিল সেগুলি আন্তঃ-গ্রহ স্থানে আলোকের গতিপথ বিষয়ে। যদিও সঙ্কেতগুলির যে অংশ থেকে পর্যবেক্ষণ করা ফল পাওয়া যায় সে অংশের ব্যাখ্যা সব সময় একভাবেই করতে হবে তবুও অন্য অংশের কিন্তু নানারকম ব্যাখ্যা সম্ভব। যে সঙ্কেতগুলির সাহায্যে গ্রহের গতি আহরণ করা যায় সেগুলি আইন-স্টাইনের তত্ত্বে এবং নিউটনীয় তত্ত্বে প্রায় সম্পূর্ণ অভিন্ন, কিন্তু সে সঙ্কেতগুলির অর্থ সম্পূর্ণ ভিন্ন। সাধারণত গাণিতিক বিচারে আমরা আমাদের সঙ্কেতগুলির আসন্ন নির্ভুলতা (approximately correct) বিষয়ে অনেক বেশী নিশ্চিত হতে পারি কিন্তু সেগুলির বিভিন্ন ব্যাখ্যার নির্ভুলতা সম্পর্কে অতটা নিশ্চিত হতে পারি না। সেই জন্য এ অধ্যায়ে আমাদের আলোচ্য ক্ষেত্রে, ইলেক্ট্রন এবং প্রোটনের চরিত্র কি সে প্রশ্নের উত্তর কোনো ক্রমেই পাওয়া যায় না। এমন কি এদের গতির বিধি সম্পর্কে আর পরিবেশের এবং এদের পারস্পরিক ক্রিয়া সম্পর্কে গাণিতিক পদার্থবিদ্যার যা বক্তব্য তার সমস্তটা আমাদের জানা থাকলেও সে প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায় না। আমাদের প্রশ্নের নির্দিষ্ট নিশ্চিত এবং সিদ্ধান্তমূলক উত্তর সম্ভব নয়। তার কারণ শুধু এই : অনেক রকম উত্তরই গাণিতিক পদার্থবিদ্যার সত্যের সঙ্গে সুসঙ্গত। তবুও কতগুলি উত্তর অন্যগুলির চাইতে ভাল লাগে তার কারণ, কতগুলির সম্ভাব্যতা অন্যগুলির চাইতে বেশী। এই

অধ্যায়ে আমরা চেষ্টা করেছি পদার্থের সংজ্ঞা দিতে। সে সংজ্ঞা এমন হবে যে পদার্থবিদ্যার সঙ্কেতগুলি যদি সত্য হয় তাহলে সেই সংজ্ঞার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ একটা জিনিষ থাকতেই হবে। আমাদের সংজ্ঞা যদি হোত এমন যে লোকে যা ভাবে পদার্থের একটি কণা তাই হোত অর্থাৎ হো:ত, প্রকৃত বাস্তব (substantial) কঠিন (hard), নির্দিষ্ট নিশ্চিত পিণ্ড তাহলে আমরা সেরকম একটা জিনিষের অস্তিত্ব সম্পর্কে নিশ্চিত হতাম না। সেই জন্যই যৌক্তিক মিতব্যয়িতা এবং বৈজ্ঞানিক সাবধানতার দৃষ্টিভঙ্গি থেকে আমাদের সংজ্ঞা জটিল মনে হলেও অধিকতর গ্রহণীয়।

পঞ্চদশ অধ্যায়

দার্শনিক ফলশ্রুতি

অনেক সময় যেরকম ভাবা হয়, অপেক্ষবাদের দার্শনিক ফলশ্রুতি সেরকম বিরাটও নয় কিংবা সেরকম চমকপ্রদও নয়। বাস্তববাদ এবং ভাববাদে দ্বন্দ্বের মত চিরায়ত মর্যাদা যে দ্বন্দ্বগুলির রয়েছে সেগুলির উপর অপেক্ষবাদ সামান্যই আলোকপাত করে। কাণ্টের ধারণা ছিল স্থান এবং কাল ব্যক্তিনিষ্ঠ (subjective) এবং একাধিকরূপে স্বজ্ঞা (forms of intuition)। অনেকে ভাবেন অপেক্ষবাদ এ বিষয়ে কাণ্টের সমর্থক। আমার ধারণা অপেক্ষবাদ সম্পর্কে লেখকরা যেভাবে পর্যবেক্ষকের কথা বলেন তার জন্যই লোকে বিপথগামী হয়েছে। পর্যবেক্ষক একজন মানুষ—অন্ততপক্ষে একটি মন—একথা ভাবা স্বাভাবিক কিন্তু একটি ফটোগ্রাফের প্লেট কিংবা একটি ঘড়িরও পর্যবেক্ষক হওয়ার সম্ভাবনা একই রকম, অর্থাৎ একটি দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে অন্য একটি দৃষ্টি-ভঙ্গির দ্বন্দ্বের জন্য যে বিষম ফল হয় সে ফল জড়িত দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে। ব্যাপারটা অনুভূতি সম্পন্ন মানুষের ক্ষেত্রে যতটা প্রযোজ্য, ততটাই প্রযোজ্য ভৌত যন্ত্রপাতির ক্ষেত্রে। অপেক্ষবাদের সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিনিষ্ঠতা আসলে ভৌত ব্যক্তিনিষ্ঠতা। বিশ্বে যদি মন কিংবা বোধ নাও থাকত তাহলেও এ ব্যক্তিনিষ্ঠতা থাকত।

তাছাড়া, এ ব্যক্তিনিষ্ঠতা কঠোরভাবে সীমিত। সবকিছু আপেক্ষিক এরকম ঘোষণা এ তত্ত্ব করে না। বরং উল্টো। কোনটা আপেক্ষিক এবং কোনটা নিজস্ব অধিকারে ভৌত ঘটনার অংশ সেটা নির্ণয়ের কৌশল পাওয়া যায় অপেক্ষবাদ থেকে। আমরা যদি বলতে যাই স্থান ও কাল বিষয়ে এ তত্ত্ব কাণ্টকে সমর্থন করে তাহলে আমরা বলতে বাধ্য যে স্থান-কাল বিষয়ে এ তত্ত্ব কাণ্টকে খণ্ডন করে। আমার মতে এগুলির কোনোটিই সঠিক নয়। এই সমস্ত বিষয়ে দার্শনিকরা কেন পূর্বেকার মতে স্থির থাকবেন না তার কোনো কারণ আমি খুঁজে পাইনা। কোনো পক্ষেই প্রামাণ্য কোনো যুক্তি এর আগে উপস্থিত করা হয়নি। এখনো কোনো যুক্তি নেই। সুতরাং কোনো একটি মতকে আঁকড়ে থাকা বৈজ্ঞানিক মেজাজের লক্ষণ নয়, লক্ষণ মতান্ধতার।

তবুও, অপেক্ষবাদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট চিন্তাধারা যখন সুপরিচিত হবে তখন আমাদের চিন্তার অভ্যাসে কতগুলি পরিবর্তন হওয়ার সম্ভাবনা

রয়েছে। স্কুলে যখন অপেক্ষবাদ পড়ানো হবে তখন এ তত্ত্বের পরিচিতি বাড়বে, ভবিষ্যতে এর গুরুত্ব হবে বিরাট।

একটি তথ্য প্রকাশিত হয়েছে : আমরা যা ভাবতাম, ভৌত জগৎ সম্পর্কে পদার্থবিদ্যা আমাদের তার চাইতে অনেক কম সংবাদ দিতে পারে। চিরায়ত পদার্থবিদ্যার মহান নীতিগুলির বেশীরভাগই হয়ে দাঁড়ায় সেই মহান বিধির মত "এক গজে তিন ফুট সবসময়ই হয়"। তাছাড়া দেখা যায় অন্যগুলি সর্বৈব মিথ্যা। একটি বিধির যে এই দুরকম দুর্ভাগ্যেরই আশঙ্কা রয়েছে তার একটি উদাহরণ ভরের নিত্যতা বিধি (conservation of mass)। আগে ভরের সংজ্ঞা ছিল "পদার্থের পরিমাণ"। পরীক্ষা করে দেখা গিয়েছিল এর কোনো হ্রাস-বৃদ্ধি হয় না। কিন্তু আধুনিক মাপনের নির্ভুলতা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে অদ্ভুত সব ব্যাপার ঘটতে দেখা গেল। প্রথমত লক্ষ্য করা গেল মাপিত ভর বেগের সঙ্গে বৃদ্ধি পায়। এবং আবিষ্কৃত হল এই ধরণের ভর এবং শক্তি আসলে অভিন্ন। একটি বস্তুপিণ্ড সাপেক্ষ এই ধরণের ভর নিত্য নয়। এই বিধিকে কিন্তু স্বতঃত একটি স্বয়ংসিদ্ধ সত্য (truism) রূপে বিচার করা উচিৎ, অনেকটা এক গজে তিন ফুট হয় এইরকম বিধির মত। আসলে এটা আমাদের মাপন পদ্ধতির ফলশ্রুতি। পদার্থের সত্যধর্ম এ থেকে প্রকাশ পায় না, বস্তুপিণ্ডের সঙ্গে চলমান পর্যবেক্ষক যে ভর দেখতে পান সে ভর অন্য ধরনের কিন্তু সেটাই সঠিক ভর (proper mass)। এটা হল সাধারণ পার্থিব ক্ষেত্র। এ ক্ষেত্রে যে বস্তুপিণ্ড আমরা ওজন করছি সেটা হাওয়ার ভিতর দিয়ে উড়ছে না। একটি বস্তুপিণ্ডের সঠিক ভর প্রায় নিত্য কিন্তু সম্পূর্ণ নিত্য নয়। লোকে ভাবে, আপনার যদি চারটে এক পাউণ্ডের বাটখারা থাকে আর আপনি যদি সব কটাকে ওজন কলে চাপান তাহলে সেগুলির মোট ওজন হবে চার পাউণ্ড। এটা একটা পছন্দসই ভ্রম। ওজনটা কমই হবে, কিন্তু কমের মাত্রা এমন বেশী নয় যে সবচাইতে সতর্ক মাপনে ধরা পড়বে। তবে যেখানে চারটে হাইড্রোজেন পরমাণুকে একত্র করে একটি হিলিয়াম পরমাণু বানানো হয় সেখানে দোষটা লক্ষ্য করা যায়। একটি হিলিয়াম পরমাণুর ওজন চারটি হাইড্রোজেন পরমাণুর চাইতে কম—এই হ্রাসপ্রাপ্তি মেপে বার করা সম্ভব।

শ্লাভ (slave) যা কল্পনা করতে পারে সেইরকম দ্রুত চলেছে মন্দ থেকে মন্দতরতে। সুতরাং আশাবাদ কিংবা নৈরাশ্যবাদ সত্যও নয় মিথ্যাও নয়। তারা শুধু ঘড়ির নির্বাচননির্ভর।

কতকগুলি ভাবাবেগের উপর এর ক্রিয়া সম্পূর্ণ ধ্বংসাত্মক। কবি যে সম্পর্কে বলেন :—

একটি দূরতর ভাগবৎ ঘটনা
যার অভিমুখে চলেছে মহাসৃষ্টি

কিন্তু ঘটনাটি যদি যথেষ্ট দূরবর্তী হয় এবং সৃষ্টি যদি যথেষ্ট দ্রুতগামী হয় যাহলে কোনো অংশ ভাববে ঘটনাটি আগেই ঘটেছে আবার কোনো কোনো অংশ ভাববে ঘটনাটি এখনো ভবিষ্যতের গর্ভে। ফলে সম্পূর্ণ কবিতাটাই নষ্ট হয়। দ্বিতীয় লাইন হওয়া উচিৎ।

যার অভিমুখে সৃষ্টির কোনো কোনো অংশ চলমান আর কোনো অংশ চলমান তার বিপরীত মুখে।

কিন্তু এতে চলবে না। যে ভাবাবেগ সামান্য গণিতের চাপে ধ্বংস হতে পারে আমার মতে সে ভাবাবেগ খাঁটিও নয়, মূল্যবানও নয়। কিন্তু এই জাতীয় যুক্তি আমাদের ভিকটোরীয় যুগের সমালোচনার পথে নিয়ে যাবে। সেটা কিন্তু আমার বিষয়বস্তুর বাইরে।

আমি আবার বলছি : ভৌত জগৎ সম্পর্কে আমরা যা জানি সেটা আগে যা ভাবা হোত তার চাইতে অনেক বেশী বিমূর্ত। বস্তুপিন্ড-গুলির মধ্যবর্তী রয়েছে ঘটনা, যেমন আলোকতরঙ্গ। এগুলির বিধি সম্পর্কে আমরা কিছুটা জানি। গাণিতিক সঙ্কেতে যতটা জানা যায় এ বিষয়ে ততটাই আমাদের জ্ঞান কিন্তু তাদের চরিত্র সম্পর্কে আমরা কিছুই জানি না। আগের অধ্যায়ে আমরা দেখেছি বস্তুপিন্ডগুলি স্বতঃত কি সে সম্পর্কে আমরা এত কম জানি যে কিছু আছে কি না সে সম্পর্কেও আমরা নিশ্চিত হতে পারি না : হয়ত তারা অন্য জায়গায় সংঘটিত ঘটনাগোষ্ঠী মাত্র। সেই ঘটনাগুলিকে আমরা স্বভাবতই তাদের ক্রিয়া বলে ভাবব। স্বভাবতই আমরা বিশ্বকে ব্যাখ্যা করি চিত্রের মত। আমরা কল্পনা করি আমরা যা দেখি ব্যাপারটা প্রায় সেই রকমই ঘটে। আসলে কিন্তু সাদৃশ্য শুধুমাত্র কিছু রীতিগত যৌক্তিক ধর্ম পর্যন্ত বিস্তৃত হতে পারে। তারা প্রকাশ করে অবয়ব—যার ফলে আমরা

এর পরিবর্তনের কিছু সাধারণ বৈশিষ্ট্য মাত্র জানতে পারি। একটা দৃষ্টান্ত বোধ হয় ব্যাপারটাকে সহজ করতে পারে। একটা ঐকতান বাদন এবং সেই একই ঐকতানের স্বরলিপির ভিতরে একটা বিশেষ সাদৃশ্য রয়েছে। তাকে বলা যেতে পারে অবয়বের সাদৃশ্য। সাদৃশ্য এমন যে নিয়মটা জানা থাকলে স্বরলিপি থেকে সুরটা বোঝা যায়—আবার সুর থেকে স্বরলিপি বোঝা যায়। কিন্তু অনুমান করুন আপনি জন্ম থেকে সম্পূর্ণ বধির কিন্তু থেকেছেন গাইয়ে বাজিয়েদের সঙ্গে। কথা বলা এবং অপরের ঠোঁট নাড়া দেখে তার কথা বোঝা (lip reading) শিখে থাকলে আপনি বুঝতে পারতেন স্বরলিপিগুলি এমন একটি জিনিষের প্রতিরূপ যা স্বতঃত তাদের চাইতে পৃথক অথচ তাদের অবয়ব* একই রকম। সুরের মূল্যবোধ আপনার কাছে অকল্পনীয় হোত কিন্তু তার গাণিতিক বৈশিষ্ট্য আপনি সবটাই বুঝতে পারতেন। তার কারণ স্বরলিপির সঙ্গে তার পূর্ণ ঐক্য রয়েছে। প্রকৃতি সম্পর্কে আমাদের জ্ঞানও অনেকটা এই রকম। স্বরলিপি আমরা পড়তে পারি। আমাদের সম্পূর্ণ বধির লোকটি সুর যতটা অনুমান করতে পেরেছিল প্রকৃতি সম্পর্কে আমরা ততটাই অনুমান করতে পারি। কিন্তু গাইয়ে বাজিয়েদের সঙ্গে সাহচর্যের ফলে ঐ লোকটির যে সুবিধা ছিল আমাদের সে সুবিধা নেই। আমরা জানতে পারি না স্বরলিপিটা যে সুরের প্রতিরূপ সে সুর বীভৎস না সুন্দর। হয়ত শেষ পর্যন্ত বিশ্লেষণ করে আমরা নিশ্চিত হতে পারব না স্বরলিপিটা তার নিজস্ব রূপ না আর কিছু। কিন্তু একজন পদার্থবিদ্যাবিদ তাঁর ব্যবসায়িক পদাধিকারে এ সন্দেহ পোষণ করতে পারেন না।

পদার্থবিদ্যার সপক্ষে যদি সবচাইতে বেশী দাবীও করা যায় তাহলেও এ কথা বলা যায় না যে পদার্থবিদ্যা বলতে পারে যেটা পরিবর্তিত হচ্ছে সেটা কি, কিংবা কি এর বিভিন্ন অবস্থা। পদার্থবিদ্যা শুধুমাত্র বলতে পারে একাধিক পরিবর্তন পরস্পরকে পর্যাবৃত্তিক্রমে (periodically) অনুসরণ করে কিংবা একটি বিশেষ দ্রুতিতে বিস্তার লাভ করে। শুদ্ধ বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের মর্মস্থলে পৌঁছুতে হলে শুদ্ধ কল্পনার আবরণ সম্পূর্ণ খুলে

*ফুটনোট : অবয়বের সংজ্ঞার জন্য এই লেখকের "গাণিতিক দর্শনের ভূমিকা" দেখুন।

ফেলতে হয়। সে কাজ এখনো বোধ হয় আমরা শেষ করতে পারি নি। এ ব্যাপারে অপেক্ষবাদ অতি বিরাট কর্ম সম্পাদন করেছে। এই কাজ করতে গিয়ে অপেক্ষবাদ ক্রমশই আমাদের নগ্ন কাঠামোর (bare structure) নিকটতর করেছে। এটাই গণিতবেত্তার (Mathematician) লক্ষ্য। তার কারণ এ নয় যে মানুষ হিসাবে এটাই তার একমাত্র আকর্ষণ। আসলে তার কারণ হল: গাণিতিক সঙ্কেতে সে এই একটি জিনিষই প্রকাশ করতে পারে। বিমূর্তনের (abstraction) দিকে আমরা অনেকটা এগিয়েছি সন্দেহ নেই কিন্তু হয়ত আমাদের অগ্রসর হতে হবে আরও।

আগের অধ্যায়ে আমি পদার্থের সর্বনিম্ন সংজ্ঞা যাকে বলা যেতে পারে তার একটা আভাষ দিয়েছিলাম। অর্থাৎ বলতে গেলে সে সংজ্ঞায় সর্বনিম্ন বস্তু থাকবে কিন্তু সে বস্তুতে (substance) শুধুমাত্র তাই থাকবে যা পদার্থবিদ্যার সত্যের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এই সংজ্ঞা গ্রহণ করা আসলে আমাদের নিরাপত্তার প্রচেষ্টা। যদি আরও স্থূল কিছুর অস্তিত্ব থাকে তবুও আমাদের সূক্ষ্ম পদার্থের অস্তিত্ব থাকবে। আমাদের পদার্থের সংজ্ঞাকে আমরা জেন অষ্টেনের (Jane Austen) ইসাবেলার জাউভাতের (Isabella's gruel) মত করতে চেষ্টা করেছি—'পাতলা, কিন্তু খুব পাতলা নয়'। আমরা যদি সজোরে সুস্পষ্ট ঘোষণা করি 'পদার্থ এর চাইতে বেশী কিছু নয়' তাহলে কিন্তু আমরা ভুল করব। লাইবনিজ (Leibnitz) ভাবতেন একটুকরো পদার্থ আসলে কতকগুলি আত্মার উপনিবেশ (colon y of souls)। তিনি ভুল করেছিলেন একথা প্রমাণ করার মত কিছু নেই। তবে তিনি সঠিক বলেছিলেন একথা প্রমাণ করার মতও কিন্তু কিছু নেই। আমরা মঙ্গলগ্রহের জীবজন্তু গাছপালা সম্পর্কে যা জানি তার চাইতে বেশী কিছু আমরা এ বিষয়ের কোনো পক্ষেই জানিনা।

অগাণিতিক মন হলে আমাদের ভৌতজ্ঞানের বিমূর্ত চরিত্র সন্তোষজনক মনে না হতে পারে। শিল্প কিংবা কল্পনার দৃষ্টিভঙ্গি থেকে ব্যাপারটা হয়ত দুঃখের কিন্তু ব্যবহারিক দিক থেকে এতে কিছু এসে যায় না। বিমূর্তন কঠিন হতে পারে কিন্তু বিমূর্তনই ব্যবহারিক ক্ষমতার উৎস। একজন মূলধন বিনিয়োগকারী ধনপতির (financier) পৃথিবীর সঙ্গে লেনদেন একজন 'কর্মদক্ষ' (practical) লোকের চাইতে বেশী বিমূর্ত হতে পারে কিন্তু কর্মদক্ষ ব্যক্তিটির তুলনায় ধনপতির ক্ষমতা

অনেক বেশী। ধনপতি গম কিংবা তুলোর ব্যবসা করতে পারেন কিন্তু সেজন্য তাঁর কখনোই কোনোটা দেখার প্রয়োজন হয় না। তাঁর শুধু জানার প্রয়োজন দামটা বাড়বে না কমবে। কৃষকের জ্ঞানের সঙ্গে তুলনায় একে বলা হয় বিমূর্ত গাণিতিক জ্ঞান। সেইরকম, একজন পদার্থবিদ্যাবিদের হয়তো গতির কয়েকটি বিধি ছাড়া পদার্থ সম্পর্কে কোনো জ্ঞানই না থাকতে পারে কিন্তু পদার্থকে স্বকার্যে পরিচালনা করার মত পর্যাপ্ত জ্ঞান তার থাকে। পদার্থবিদ্যাবিদ সমীকরণের একটি পূর্ণ মালিকা নিয়ে পরিশ্রম করেন। সে সমীকরণের প্রতীকগুলি যার প্রতিরূপ তার স্বকীয় চরিত্র আমরা কখনোই জানতে পারবনা। তিনি শেষ পর্যন্ত যে ফলে এসে পেঁছোন সে ফল আমাদের দৈনন্দিন অনুভূতির বাগ্বিধিতে প্রকাশ করা সম্ভব এবং তার দ্বারা সম্ভব আমাদের নিজেদের জীবনে আকাঙ্খিত ক্রিয়া আনয়ন। পদার্থ সম্পর্কে আমরা যা জানি তা বিমূর্ত এবং ছককাটা (schematic) হতে পারে, কিন্তু আমাদের ভিতরে তারা কি নিয়ম অনুসারে অনুভূতি ও বেদনা (feeling) উৎপাদন করে সেটুকু জানার পক্ষে নীতিগতভাবে সে জ্ঞান যথেষ্ট। এই নিয়মগুলির উপরই পদার্থবিদ্যার ব্যবহারিক প্রয়োগ নির্ভরশীল।

শেষ সিদ্ধান্ত : আমরা এত কম জানি, অথচ আশ্চর্যের ব্যাপার আমরা এত বেশী জানি, আরও আশ্চর্যের ব্যাপার এত অল্প জ্ঞান এত বেশী ক্ষমতা দান করতে পারে।

বর্ণানুক্রমিক সূচী

বার্ট্রাণ্ড রাসেলের সংক্ষিপ্ত জীবনী

১৮৭২ সালের ১৮ই মে ইংল্যাণ্ডের ট্রেলেকের কাছে মনমাউথসায়ারের রেভেনক্রোফটে বার্ট্রাণ্ড রাসেলের জন্ম।

১৮৭৪, বার্ট্রাণ্ড রাসেলের মাতা লেডী এম্বারলীর মৃত্যু।

১৮৭৬ সালের জানুয়ারীতে বার্ট্রাণ্ড রাসেলের পিতা লর্ড এম্বারলীর মৃত্যু। পিতার মৃত্যুর পর উইল নিয়ে মামলা। নাবালকের অভিভাবকের ফ্রি থিংকার হওয়া আবশ্যক—উইলের এ কথাটি আদালত কর্তৃক বাতিল। প্রেমব্রোক লজে পিতামহী লেডী রাসেল এবং রোলা রাসেল কর্তৃক অভিভাবকত্ব গ্রহণ।

১৮৮৩, ভাই ফ্রাঙ্কের কাছে ইউক্লীড বিষয়ে প্রথম পাঠ গ্রহণ। এবং গৃহ-শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে অধ্যয়ন।

১৮৮৩, দর্শন জিজ্ঞাসার সূত্রপাত। বিশেষ করে, ধর্মীয় সমস্যা নিয়ে। গোপনে একটি পত্রিকায় নিজের চিন্তাভাবনা প্রকাশ।

১৮৯০, কেমব্রিজে ট্রিনিটি কলেজে প্রবেশ।

১৮৯৪, নীতিবিজ্ঞানে ট্রাইপোজ। জ্যামিতির ভিত্তি বিষয়ক গবেষণামূলক প্রবন্ধের জন্য ফেলোশিপ। ফ্রান্সে সম্মানজনক ব্রিটিশ অ্যাটাসের পদ গ্রহণ। অ্যালিস স্মিথকে বিবাহ।

১৮৯৫, জার্মানী গমন। বার্লিন ইউনিভারসিটিতে অধ্যয়ন। লণ্ডন স্কুল অব ইকনমিকস এবং পলিটিক্যাল সায়েন্স বিভাগে 'জার্মান সোস্যাল ডেমোক্রাসি' বিষয়ে বক্তৃতা। ট্রিনিটি কলেজের ফেলো নির্বাচিত।

১৮৯৬, স্ত্রী অ্যালিস রাসেলসহ আমেরিকা যাত্রা। জন হফকিনস এবং ব্রাইন মরে বক্তৃতা।

১৮৯৮, লাইবনিৎস-এর উপর কেমব্রিজে ভাষণ। জি. ই. মুরের সঙ্গে একত্রে কাণ্ট এবং হেগেলের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ।

১৯০০, প্যারিসে আন্তর্জাতিক দর্শন কংগ্রেসে যোগদান।

১৯০৫, বিবরণতত্ত্বে (Theory of Description) প্রথম সাফল্য।

১৯০৭, পার্লামেণ্ট নির্বাচনে অসাফল্য।

১৯০৮, রয়াল সোসাইটির ফেলো নির্বাচিত।

১৯১০, এ. এন. হোয়াইটহেডের সঙ্গে যুক্তভাবে প্রিন্সিপিয়া ম্যাথম্যাটিকা

রচনার জন্য সম্পূর্ণ দশক আত্মনিয়োগ। এবছর প্রথম খণ্ড প্রকাশ। অজ্ঞেয়বাদীর দৃষ্টিভঙ্গির জন্য (agnostic view) পার্লামেণ্ট নির্বাচনে লিবারাল পার্টির হয়ে মনোনয়নপত্র দাখিলে অকৃতকার্য। কেমব্রিজের ট্রিনিটি কলেজে গাণিতিক যুক্তি (Mathematical Logic) বিষয়ে লেকচারার নির্বাচিত।

১৯১১, অ্যারিষ্টোটেলিয়ান সোসাইটির সভাপতির আসন গ্রহণ। অ্যালিস রাসেলের সঙ্গে বিচ্ছেদ।

১৯১৩, 'Ecole des Hautes Sociales'-এতে গাণিতিক যুক্তির দর্শনগত গুরুত্ব নিয়ে (The Philosophical Importance of Mathematical Logic) বক্তৃতা দান। ট্রিনিটি কলেজে হেরেটিকস্‌দের সামনে বের্গসোঁ-এর দর্শন (Philosophy of Bergson) নিয়ে আলোচনা।

১৯১৪, দর্শনের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি (Scientific Method in Philosophy) বিষয়ে অক্সফোর্ডে হার্বার্ট পেন্সার বক্তৃতা। 'বহির্বিশ্ব বিষয়ে আমাদের জ্ঞান' (Our Knowledge of External World) বিষয়ে বোস্টনে লোওয়েল বক্তৃতা (Lowell Lecture)। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের বিরুদ্ধে জনসমক্ষে বক্তৃতা এবং পুস্তিকা প্রকাশ।

১৯১৫, পদার্থের অন্তিম গঠন (The Ultimate Constituent of Matter) নিয়ে ম্যানচেষ্টারের ফিলোজফিক্যাল সোসাইটিতে বক্তৃতা।

১৯১৬, এভারেণ্ট মামলায় জনৈক বিবেক-বুদ্ধিসম্পন্ন প্রতিবাদীর দু-বৎসর কারাদণ্ডের বিরুদ্ধে সমালোচনামূলক পুস্তিকা প্রকাশের জন্য একশ' পাউণ্ড জরিমানা। জরিমানা না দেওয়ায় রাসেলের পাঠাগার বিক্রয়। রাসেলের বন্ধু কর্তৃক পাঠাগারটি ক্রয়। ট্রিনিটি কলেজ থেকে লেকচারের পদ খারিজ।

১৯১৮, 'যৌক্তিক পরমাণুবাদ' (Logical Atomism) বিষয়ে লণ্ডনে আটটি ধারাবাহিক বক্তৃতা। যে বক্তৃতার মধ্যে বিগত চার বছরে উইটগেনস্টেনের প্রভাবের কথা স্বীকার করেন। ব্রিকস্‌টন জেলে ছ'মাস কারাদণ্ড। কারণ, একটি প্রবন্ধ রচনা। সে প্রবন্ধে তিনি ধর্মঘটীদের উপর আমেরিকান সৈন্য লেলিয়ে দেবার বিষয়টি কংগ্রেসের অনুসন্ধান (Congressional Investigation) থেকে উদ্ধৃতি দেন। দ্বিতীয় শ্রেণীর বন্দী থেকে প্রথম শ্রেণীর বন্দী হন। জেলে বসে রচনা করেন—গাণিতিক দর্শনের ভূমিকা (Introduction to Mathematical Philosophy)।

১৯২০, রাশিয়া ভ্রমণ।

১৯২১, অ্যালিস রাসেলের সঙ্গে বিচ্ছেদ। ডোরা ব্ল্যাকের সঙ্গে বিবাহ। চীন এবং জাপান ভ্রমণ। লণ্ডন এবং পিকিং (বর্তমান বেজিং)-এ 'মনের বিশ্লেষণ' (The Analysis of Mind) নিয়ে বক্তৃতা। জন লর্ড এম্বারলীর জন্ম।

১৯২২, পার্লামেণ্টে লেবার পার্টির প্রার্থী। 'মুক্ত চিন্তা এবং সরকারী প্রচার' (Free thought and official propaganda) বিষয়ে মনকিওর ডি. কনওয়ে স্মারক বক্তৃতা।

১৯২৩, পার্লামেণ্টে লেবার পার্টির প্রার্থী। কেটের জন্ম।

১৯২৪, বক্তৃতা দানের জন্য যুক্তরাষ্ট্র ভ্রমণ। 'বলশেভিকবাদ ও পশ্চিম' (Bolshevism and the West) বিষয়ে লীগ ফর পাবলিক ডিসকাসন-এর সামনে স্কট নীয়ারীং-এর সঙ্গে বিতর্ক। 'কিভাবে মুক্ত এবং সুখী হওয়া যায়'—বিষয়টি নিয়ে নিউইয়র্কের কুপার ইউনিয়নে মুক্ত তরুণদের (Free Youth) ভাষণ।

১৯২৫, ট্রিনিটি কলেজে 'পদার্থের বিশ্লেষণ' (The Analysis of Matter) বিষয়ক টার্ণার বক্তৃতা।

১৯২৭, বক্তৃতা দানের জন্য যুক্তরাষ্ট্র ভ্রমণ। পিটার্সফিল্ডের কাছে বীকন হিলে একটি বিদ্যালয় স্থাপন। প্রধান শিক্ষকের পদ গ্রহণ। ডোরা রাসেল প্রধান শিক্ষিকা। ন্যাশানাল সেক্যুলর সোসাইটির সাউথ লণ্ডন ব্রাঞ্চে 'কেন আমি খ্রীষ্টান নই'—এর উপর বক্তৃতা। বক্তৃতার স্থান বেটার সী টাউন হল।

১৯২৯, বক্তৃতাদানের জন্য যুক্তরাষ্ট্র ভ্রমণ। ইলিনোয়াঁর এভানস্টোনের নর্থওয়েষ্টার্ণ ইউনিভারসিটিতে সমকালীন চিন্তার (Contemporary thought) ক্লাসে বক্তৃতা দান। বিষয় : 'জগতে তিনটি পথ' (Three ways to the world)।

১৯৩০, 'আধুনিক বিবাহ কি ব্যর্থ ?' বিষয়টি নিয়ে জন কাউপার পাউইজের সঙ্গে নিউইয়র্ক শহরে বিতর্ক।

১৯৩১, যুক্তরাষ্ট্রে বক্তৃতার জন্য ভ্রমণ। 'পরিবার কি অন্তর্হিত হবে ?' বিষয়টি নিয়ে শারউড এ্যাণ্ডারসনের সঙ্গে বিতর্ক। ভাই ফ্রাঙ্কের মৃত্যুতে তৃতীয় আর্ল রাসেল হন।

১৯৩৫, ডোরা রাসেলের সঙ্গে বিবাহ বিচ্ছেদ। স্কুল পরিত্যাগ।

১৯৩৬, টাইনের উপর নিউ কাস্‌লসের আর্মষ্ট্রঙ্গ কলেজে আর্ল গ্রে স্মারক

বক্তৃতা : 'পদার্থবিদ্যা ও নিমিত্তবাদ' (Determinism and Physics) বিষয়ে। হেলেন প্যাট্রিসিয়া স্পেনসকে বিবাহ।

১৯৩৭, কনরাডের জন্ম।

১৯৩৮, 'ভাষা ও ঘটনা' নিয়ে (Language and fact) অক্সফোর্ডে বক্তৃতা। যুক্তরাষ্ট্র যাত্রা। সেখানে ১৯৪৪ সাল পর্যন্ত অবস্থান। টি. ভি. স্মিথ এবং পল ডগলাসের সঙ্গে 'অর্থনৈতিক ক্ষমতা দমন' (Taming Economic Power) নিয়ে বেতারে আলোচনা। শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে ভিজিটিং প্রফেসর-এর পদ গ্রহণ ১৯৩৯ পূর্ব পর্যন্ত।

১৯৩৯, 'নিরাপত্তা কি বাড়ছে?' এ নিয়ে শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের গোল-টেবিল বৈঠকে আলোচনা। আলোচনাটির বেতার প্রচার। শিকাগো বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সমাজ বিজ্ঞানের ক্লাবে 'বর্তমান দুনিয়ায় বুদ্ধিজীবীদের ভূমিকা' নিয়ে আলোচনা। ১৯৪০-এর পূর্ব পর্যন্ত লস্ এঞ্জেলসের ক্যালিফোর্ণিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা দান।

১৯৪০, হার্ভার্ডে উইলিয়াম জেমস্ বক্তৃতা। বিষয় : অর্থ ও সত্য বিষয়ে একটি অনুসন্ধান (An Enquiry into Meaning and Truth)। বার্ট্রাণ্ড রাসেলের মামলা—এ মামলায় তিনি নিউইয়র্ক কলেজে যোগদানের অধিকার হারান।

১৯৪১, পেনসিলভেনিয়ার মেরিয়নের বার্নস ফাউণ্ডেশানে 'দর্শনের ইতিহাস' বিষয়ে বক্তৃতা। সি-বি-এস-এর শিক্ষামূলক অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত হয়ে হানটিংটন কেয়ারনস্, অ্যালেন টেট ও মার্ক ভ্যান ডোরেনের সঙ্গে হেগেলের দর্শনের ইতিহাস বিষয়ে আলোচনা। রেক্স স্টাউটের সঙ্গে বেতার আলোচনা। বিষয় : স্বাধীনতা বিষয়ে বক্তব্য।

১৯৪২, সি-বি-এস শিক্ষামূলক অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত হয়ে জ্যাকস্ বারজুনের সঙ্গে দেকার্তের 'পদ্ধতি বিষয়ক' (Descarte's Discourse on Method) এবং স্কট বুচান্যান ও মার্ক ভ্যান ডোরেনের সঙ্গে স্পিনোজার নীতিবিদ্যা (Spinoza's Ethics) নিয়ে আলোচনা। পরবর্তী সময়ে ক্যাথরিন এ্যানে পোর্টারের সঙ্গে ক্যারোলের 'এ্যালিস ইন ওয়াণ্ডার ল্যাণ্ড' নিয়ে আলোচনা। আমেরিকান ফোরাম অব এয়ার-এ ভারত বিষয়ে আলোচনা।

১৯৪৩, বার্নেস চুক্তি খারিজ। পাঁচ বছরের চুক্তি মামলায় সাফল্য।

১৯৪৪, নিউইয়র্ক র‍্যাণ্ড স্কুলে 'রাশিয়ার সঙ্গে সহযোগিতা' বিষয়ে ভাষণ।

ভাষণটি WEVD বেতারে প্রচারিত হয়। ইংল্যাণ্ডে প্রত্যাবর্তন। দ্বিতীয়-বারের জন্য কেম্‌ব্রিজের ট্রিনিটি কলেজের ফেলো নির্বাচিত। তাঁর সারা বছরে পড়ানর বিষয় : 'Non-Demonstrative Inference'।

১৯৪৭, ফ্রেণ্ডস্‌ হাউজের ন্যাশানাল বুক লীগে 'দর্শন ও রাজনীতি' নিয়ে বক্তৃতা।

১৯৪৮, নরওয়ে যাত্রাপথে ট্রোন্‌ড্‌হেইমে বিমান দুর্ঘটনা। নরওয়ে যাবার উদ্দেশ্য—যুদ্ধ প্রতিরোধ বিষয়ে বক্তৃতা দান। দশ মিনিট একটা বড় ওভার-কোটের সাহায্যে সাঁতার কেটে আত্মরক্ষা। বি-বি-সিতে 'কর্তৃত্ব ও ব্যক্তি' বিষয়ে প্রথম রিৎস বক্তৃতা।

১৯৪৯, 'অর্ডার অব মেরিট' পুরস্কার প্রাপ্তি। ওয়েস্ট মিনিস্টার স্কুলে পারমাণবিক শক্তি ও ইউরোপের সমস্যা বিষয়ে বক্তৃতা দান।

১৯৫০, মানবিকতা ও চিন্তার স্বাধীনতার সপক্ষে সদাসর্বদা সংগ্রামরত বহু-মুখী রচনার জন্য সাহিত্যে নোবেল প্রাইজ প্রাপ্তি। অস্ট্রেলিয়া যাত্রা।

১৯৫১, নিউইয়র্কের কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে ম্যাচেটি ফাউণ্ডেশানে বক্তৃতা। বিষয় : 'সমাজের উপর বিজ্ঞানের প্রভাব' (Impact of Science on Society)। (আমেরিকার) রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক প্রভাব, প্রকৃতি ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির উদ্ভব এবং নাস্তিক্যবাদ ও সহনশীলতা—বিষয়গুলি নিয়ে বি-বি-সির থার্ড প্রোগ্রামে কথোপকথন। অ্যালিস রাসেলের মৃত্যু।

১৯৫২, প্যাট্রিসিয়া রাসেলের সঙ্গে বিবাহ বিচ্ছেদ। এডিথ ফিন্‌চকে বিবাহ। এ সালের পর থেকেই পাশ্চাত্য-দেশগুলিতে কমতে থাকে রাসেলের সম্ভ্রম। কিন্তু সমগ্র পৃথিবীতে যুবক এবং বামপন্থীদের ভিতরে বাড়তে থাকে তার জনপ্রিয়তা। ষাট দশকের শেষে তিনি এক হাজারেরও বেশী শুভেচ্ছাপত্র পেতেন। এদের বেশীর ভাগই ছিল দূরপ্রাচ্য থেকে।

১৯৫৪, বি-বি-সি থেকে তাঁর বিখ্যাত বক্তৃতা 'মানুষের সঙ্কট (Man's Peril)'। এ বক্তৃতায় তিনি বিকিনি-হাইড্রোজেন বোমা পরীক্ষাকে নিন্দা করেন।

১৯৫৫, বিশ্ব শান্তির সপক্ষে সংগ্রাম করার জন্য রৌপ্য ভাল্লুক পদক প্রাপ্তি।

১৯৫৭, পাগওয়াস বৈজ্ঞানিক সম্মেলনে 'রাসেল-আইনস্টাইন' বিবৃতি পাঠ। এ সম্মেলনে বহু নোবেল পুরস্কার বিজয়ী বৈজ্ঞানিকের যোগদান। প্রথম সম্মেলনে সভাপতি নির্বাচিত।

১৯৬০,-এ সংগঠন থেকে পদত্যাগ। একশ'জনকে নিয়ে 'শতজনের কমিটি' গঠন। আইন অমান্য আন্দোলনের শুরু।

১৯৬১, স্ত্রী (লেডী রাসেল) সহ গণঅবস্থানে অংশগ্রহণ। দু'মাসের কারাদণ্ড ভোগ।

১৯৬২, সালে 'কিউবান সংকট' ও ভারত-চীন সীমান্ত সংঘর্ষের সময় রাষ্ট্র সংঘের সাধারণ সম্পাদক উ থাণ্ট সহ অন্যান্য দেশের রাষ্ট্রপ্রধানদের সঙ্গে একত্রে সংকট সমাধানের জন্য উদ্যোগ ও নিরলস প্রচেষ্টা। সে সময় তাঁর বয়স নব্বুই বৎসর। ওয়ারেণ্ট রিপোর্ট প্রকাশের পর 'কেনেডিকে কে হত্যা করেছে কমিটি'র (Who Kill Kenedy Committee) সভাপতির পদগ্রহণ।

১৯৬৩, বিশ্ব শান্তি আন্দোলন আরো সুষ্ঠভাবে পরিচালনার জন্য বার্ট্রাণ্ড রাসেল পিস ফাউণ্ডেশান এবং আটলাণ্টিক ট্রাষ্ট গঠন। এই দশকের শেষ দিকটায় আমেরিকা কর্তৃক ভিয়েৎনাম আক্রমণের প্রবল বিরোধিতা। জাঁ পল সার্ত্র, ভ্লাদিমি দেদিয়ার, আইজ্যাক ডয়সার প্রমুখ ব্যক্তিদের সঙ্গে যৌথভাবে ভিয়েৎনামের যুদ্ধ অপরাধীদের বিচারের জন্য আন্তর্জাতিক আদালত (ট্রাইব্যুন্যাল) গঠন।

১৯৭০, সালের ২রা ফেব্রুয়ারী মৃত্যু।

অপেক্ষবাদ পদার্থবিদ্যার দুটি মূল স্তম্ভের একটি। কিন্তু আধুনিক পদার্থবিদ্যা অর্থাৎ অপেক্ষবাদ ও কোয়ান্টামতত্ত্ব দুর্ভেদ্য গাণিতিক বর্মে আবৃত। সেজন্য যাঁরা গণিতবিদ নন, তাঁদের পক্ষে অপেক্ষবাদের মূলতত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করা কঠিন। তাঁদের জন্য এই দুরূহ তত্ত্বের সরল বিবরণ দিয়েছেন প্রিন্সিপিয়া ম্যাথামেটিকা গ্রন্থের লেখক বার্ট্রাণ্ড রাসেল। হীরক কাটতে হলে কঠিন ধাতু প্রয়োগ করতে হয়। তেমনি আইনস্টাইনকে বুঝতে হলে রাসেলের শানিত বুদ্ধি প্রয়োজন। অপেক্ষবাদের অ-আ-ক-খ সেই প্রযুক্তির নিদর্শন।

শক্রজিৎ দাশগুপ্তের অনুবাদ এর আগের দুটি (আইনস্টাইন ও ইনফেল্ডের 'পদার্থবিদ্যার বিবর্তন' এবং আইনষ্টানের 'অপেক্ষবাদ') অনুবাদের মত সরল এবং সহজ বোধ্য।